আকাশের গল্প

(প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তিপ্রাপ্ত পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্. এ, মহোদয়ের লিখিত ভূমিকা সহিত।)

শ্রীযতীন্দ্রনাথ মজুমদার বি. এল্

প্রণীত।

১৩২০।

প্রকাশক

শ্রীহেমেন্দ্রনাথ দত্ত

সাধনা লাইব্রেরী, উয়ারী, ঢাকা।

মূল্য ১।০ পাঁচ সিকা।

ভূমিকা।

অতি বাল্যকালে খগোলবিবরণ নামে একখানি বাঙ্গালায় লেখা জ্যোতিষের বহি পড়িয়াছিলাম ; ঐ পুস্তকে চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, উপগ্রহ-সকলের বিবরণ পড়িয়া বালকের মনে কত আনন্দের উদয় হইত, কত কৌতূহল জাগিয়া উঠিত ! ঐ পুস্তকখানির প্রণেতার নাম মনে হইতেছে নবীনচন্দ্র দত্ত। তৎপরে বাঙ্গালায় আর জ্যোতিষের গ্রন্থ রচিত হইয়াছে কিনা আমার জানা নাই।

বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস আমি ভাল জানি না ; তবে সাহিত্য পরিষদের সম্পর্কে আসিয়া পুরাতন বাঙ্গালা পুস্তক দুই একখানি মাঝে মাঝে হাতে পড়ে ; তাহাতে আমার ধারণা জন্মিয়াছে যে চল্লিশ পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গালায় বিবিধ বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থ যাহা রচিত হইত, এখন আর যেন তাহা হয় না। অথচ সেকালের চেয়ে একালে বাঙ্গালা লেখকের সংখ্যা, পাঠকের সংখ্যা, ছাপাখানার সংখ্যা কত বাড়িয়াছে। ছাপিবার খরচও সম্ভবতঃ বিস্তর কমিয়াছে।

কিছু দিন পূর্ব্বেও পাঠশালার ছেলেদের জন্য দুই চারিখানা পদার্থ বিদ্যা, রসায়ণ-বিদ্যা, উদ্ভিদ্-বিদ্যা লিখিত হইত, এখন গবর্ণমেণ্টের নির্দ্ধারিত বাট্‌খারার মাপে বহি না লিখিলে পাঠশালাতে চলে না। কাজেই স্কুল-পাঠ্যরূপেও বৈজ্ঞানিক গ্রন্থের প্রচার দেখিতে পাই না।

পাঠশালার বাহিরে জনসাধারণের মধ্যে বৈজ্ঞানিক গ্রন্থের সমাদর একবারে নাই কি ? পঞ্চাশ বৎসর আগে যে আদরটুকু ছিল, এখন তাহাও নাই কি ? কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, অক্ষয়কুমার দত্ত প্রভৃতি মনস্বীরা যাহার বীজ রোপণ করিয়া গিয়াছেন তাহা এমন নিষ্ফল হইল কেন ?

হঠাৎ যখন এই 'আকাশের গল্প' নামক পুস্তকের পাণ্ডুলিপি গ্রন্থকার কর্ত্তৃক আমার নিকট স্থাপিত হইল, তখন আমার মনে ঐরূপ

প্রশ্নের উদয় হইয়াছিল। প্রশ্নের উত্তর স্থির করিতে পারি নাই। তবে গ্রন্থকর্ত্তা যে বাঙ্গালা সাহিত্যের একটা অভাব দূর করিতে উপস্থিত হইয়াছেন, তজ্জন্য গ্রন্থকারের প্রতি পরম শ্রদ্ধার উদয় হইয়াছিল।

এই গ্রন্থ সাধারণ পাঠকের জন্য লিখিত হইয়াছে। মুখ্যতঃ আকাশ-স্থিত জ্যোতিষ্কগুলির বিবরণ ইহাতে সঙ্কলিত হইয়াছে। জ্যোতিষের কোন দুরূহ বা নিগূঢ়তত্ত্ব বুঝাইবার প্রয়াস হয় নাই। এই শ্রেণীর পুস্তকে সেরূপ প্রয়াস সম্ভবতঃ নিষ্ফল হইত। গ্রন্থের ভাষা যেরূপ প্রাঞ্জল হইয়াছে. তাহাতে তাহার তাৎপর্য্য বুঝিতে বিশেষ কষ্ট হইবে না।

দূরবীণের সাহায্যে পর্য্যবেক্ষণ করিলে জ্যোতিষ্কগুলিকে কেমন দেখায়, কেবল বিবরণ পড়িয়া তাহা হৃদগত করা সহজ নহে। বিলাতি বহিতে ভাল ভাল চিত্র দিয়া তাহা কতকটা বুঝাইবার চেষ্টা করা হয়। সেরূপ চিত্র দেওয়া এদেশে অসম্ভব। উৎকৃষ্ট চিত্রের ব্যয়ভার বহনও বাঙ্গালা গ্রন্থ প্রণেতার পক্ষে সুসাধ্য নহে। এই সকল মনে করিয়া পুস্তকখানির বিচার করিতে হইবে।

আমার বিবেচনায় গ্রন্থকার যথাসাধ্য ও যথাশক্তি চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার উদ্যম ও অধ্যবসায় প্রশংসার্হ। তাঁহার পরিশ্রমের ফল তিনি পাইবেন না ইহা বলিতে বিশেষ দুঃসাহসের আবশ্যক নহে। তাঁহার উদ্যমের জন্য ও পরিশ্রমের জন্য বাঙ্গালা সাহিত্যের সমালোচক-বর্গের নিকট কতটুকু প্রশংসা পাইবেন, তাহাও নিতান্ত সংশয়ের বিষয়। নিঃস্বার্থ সাহিত্যসেবার প্রবৃত্তি ভিন্ন আর কোন প্রণোদনা তাঁহার আছে, মনে করিবার হেতু দেখি না।

এই স্বার্থহীন সাহিত্যসেবায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন বলিয়াই আমি গ্রন্থকারকে ধন্যবাদ দিতেছি। বাঙ্গালা সাহিত্যের এখন যে অবস্থা তাহাতে এই ক্ষুদ্র গ্রন্থকেও আমি বহুমূল্য বলিয়া বিবেচনা করি।

কলিকাতা। শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী।

নিবেদন।

'সাহিত্য', 'ভারত-মহিলা' এবং আমার সম্পাদিত ভূতপূর্ব্ব 'আরতি' প্রভৃতি মাসিক পত্রিকায় জ্যোতিষ সম্বন্ধে আমি যে সকল প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম, ঐ সকল প্রবন্ধ এখন পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত আকারে "আকাশের গল্প" নামে প্রকাশিত হইল।

পাশ্চাত্য দেশসমূহে এক এক ভাষায় বিভিন্ন প্রকারের বহুসংখ্যক শিশুপাঠ্য বিজ্ঞানের পুস্তক আছে। তথাকার বালক বালিকাগণ সরল ও সুখপাঠ্য গ্রন্থের সাহায্যে শৈশবেই অত্যাশ্চর্য্য বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব-সমূহের মোটামুটি জ্ঞান লাভ করে এবং অজ্ঞাতসারে তাহাদের কোমল হৃদয়ে বিজ্ঞান পাঠের বলবতী স্পৃহা উদ্দীপ্ত হয়। এই জন্যই পাশ্চাত্য দেশে এত লোক বিজ্ঞান-চর্চ্চায় নিরত এবং বিজ্ঞানেরও এত উন্নতি।

দুর্ভাগ্যের বিষয়, আজ পর্য্যন্ত আমাদের দেশের বিদ্যালয়সমূহে বিজ্ঞান শিক্ষার কোনই ব্যবস্থা হয় নাই। যে দেশের পণ্ডিতগণ দ্বাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত জ্যোতিষশাস্ত্রে জগতের শীর্ষ স্থান অধিকার করিয়াছিলেন, এখন সেই দেশের উচ্চ উপাধিপ্রাপ্ত ব্যক্তিদিগের মধ্যেও শত করা সত্তর জন লোক "গ্রহ" ও "নক্ষত্রে" কি পার্থক্য তাহা অবগত নহেন!

বৈজ্ঞানিক পুস্তক লেখা কঠিন কার্য্য; তাই আমি অতিশয় সশঙ্ক চিত্তে "আকাশের গল্প" প্রকাশ করিতেছি। অনধিকারীর এই ব্যর্থ চেষ্টা দেখিয়া নিশ্চয়ই পণ্ডিত ব্যক্তিরা এই ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবেন। সেই ভরসায়ই আমি দুঃসাহস করিয়াছি।

এই পুস্তকের অধিকাংশ উপাদানই ইংরেজী গ্রন্থ হইতে সঙ্কলিত হইয়াছে। শিশু-সাহিত্যের অন্যতম প্রবর্ত্তক, সুবিখ্যাত চিত্রশিল্পী আমার ভক্তিভাজন মাতুল শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী বি,এ মহাশয়ের লিখিত কয়েকটী প্রবন্ধ হইতেও আমি সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছি।

মেট্রপলিটান্ কলেজের গণিতাধ্যাপক আমার শ্রদ্ধাস্পদ মাতুল শ্রীযুক্ত মুক্তিদারঞ্জন রায় এম্. এ মহাশয় "আকাশের গল্পের" পাণ্ডু-লিপিখানি স্থানে স্থানে সংশোধন করিয়া দিয়াছেন। তজ্জন্য তাঁহার নিকট বিশেষ কৃতজ্ঞ রহিলাম।

ভক্তিভাজন পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্. এ, পি. আর. এস্ মহোদয়ের উদারতার কথা আমি ভাষায় ব্যক্ত করিতে অক্ষম। তাঁহার নিকট উৎসাহ না পাইলে আমি এই পুস্তক প্রকাশ করিতে কখনই সাহসী হইতাম না। তিনি শারীরিক অসুস্থতা সত্ত্বেও অতিশয় আগ্রহের সহিত এই পুস্তকের পাণ্ডুলিপিখানি দেখিয়া দিয়াছেন এবং গ্রন্থ সন্নিবিষ্ট সুন্দর ভূমিকাটী লিখিয়া দিয়াছেন। আমি তজ্জন্য তাঁহার নিকট আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে, যাঁহাদের জন্য এই গ্রন্থ লিখিত হইল তাঁহারা যদি ইহা পাঠ করিয়া বিন্দুমাত্রও উপকৃত হন তাহা হইলে আমার যত্ন, শ্রম ও অর্থব্যয় সার্থক মনে করিব।

ময়মনসিংহ
১লা আষাঢ়; ১৩২০ সন। } গ্রন্থকার।

সূচী।

সূচনা।

প্রথম খণ্ড।

দ্বিতীয় খণ্ড।

চিত্রসূচী।

গ্যালিলিও ।

আকাশের গল্প।

সূচনা।

ব্রহ্মাণ্ড।

দিনের বেলায় আমরা আকাশে কেবল সূর্য্য দেখিতে পাই। সূর্য্য পূর্ব্বদিকে উঠে, আর সারাদিন কিরণ দিয়া পশ্চিম দিকে অস্ত যায়। সূর্য্য অস্ত গেলে অন্ধকার ধীরে ধীরে পৃথিবীকে ঢাকিতে থাকে। তখন নীল আকাশে এক একটী করিয়া উজ্জ্বল হীরার ফুলের মত তারার ফুল ফুটিয়া উঠে। দেখিতে দেখিতে আকাশ ছাইয়া পড়ে। যে দিকে চাও, সেই দিকেই অসংখ্য তারা মিট্ মিট্ করিয়া জ্বলিতেছে। তখন আকাশের কি চমৎকার শোভা! যেন দেব-শিশুরা প্রদীপ জ্বালাইয়া দীপালী উৎসব করিতেছে!

রাত্রিকালে হীরার ফুলের মত যে অসংখ্য উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক আকাশে দৃষ্টিগোচর হয়, সাধারণতঃ সেইগুলিকে "তারা" বলে। বাস্তবিক ঐ সকল জ্যোতিষ্ক একরকম পদার্থ নহে। উহাদের মধ্যে কতগুলি "গ্রহ" আর সব "নক্ষত্র।" গ্রহের সংখ্যা বেশী নয়; সমুদয়ে চারি শতের কিছু উপরে হইবে। কিন্তু নক্ষত্র কোটী কোটী।

দিনের বেলায়ও আমাদের মাথার উপরে আকাশে অনেক তারা থাকে। কিন্তু সূর্য্যের প্রখর আলোকে ঐ সকল তারার ক্ষীণ আলোক ঢাকিয়া যায়। সেইজন্য আকাশ তারা-শূন্য বোধ হয়। আর দিবাভাগে যে আলোক অল্প দূর হইতেও দেখা যায় না রাত্রিতে সেই আলোক বহুদূর হইতে দৃষ্টিগোচর হয়।

গ্রহ ও নক্ষত্রে কি প্রভেদ।

'গ্রহে' আর 'নক্ষত্রে' অনেক প্রভেদ। প্রথমতঃ গ্রহের নিজের আলোক নাই, নক্ষত্রের নিজের আলোক আছে। আবার গ্রহগুলি নক্ষত্রের তুলনায় অনেক ক্ষুদ্র। গ্রহগুলি আমাদের খুব নিকটে, আর নক্ষত্রগুলি অনেক দূরে। এই জন্যই নক্ষত্রগুলিকে অতি ক্ষুদ্র দেখায়। এক একটী নক্ষত্র লক্ষ লক্ষ গ্রহের সমান বৃহৎ। একটি দৃষ্টান্ত দিলেই সহজে বুঝিতে পারিবে। আমাদের পৃথিবী একটি গ্রহ, আর আমাদের সূর্য্য, আকাশের কোটী কোটী নক্ষত্রের ন্যায় একটী নক্ষত্র। অথবা রাত্রিকালে, আকাশের গায় যে অসংখ্য আলোক মিট্ মিট্ করিয়া জ্বলিতেছে দেখা যায়,- উহারা সকলেই এক একটী প্রকাণ্ড সূর্য্য! এখন অনুমান কর আকাশে কত সূর্য্য!

আকাশের কোটী কোটী নক্ষত্র সূর্য্যের ন্যায় বৃহৎ বলিয়াছি; এখন সূর্য্য কত বড় একবার ভাবিয়া দেখা যাউক। আমাদের পৃথিবী অতিশয় প্রকাণ্ড। উহার পৃষ্ঠে বহুসংখ্যক সুবিস্তৃত দেশ-মহাদেশ, সাগর-মহাসাগর, শত শত পর্ব্বত, অগণিত নদ-নদী শোভা পাইতেছে। পৃথিবী যে কত বড় আমরা তাহা সম্যক্ ধারণাও করিতে পারি না। কিন্তু যে পৃথিবী হইতে সূর্য্য ক্ষুদ্র আলোক-পিণ্ডের ন্যায় বোধ হয় উহা সেই পৃথিবীর তের লক্ষ গুণ বড়। অর্থাৎ তের লক্ষ পৃথিবী একত্র করিলে সূর্য্যের ন্যায় বৃহৎ হইবে। এখন সূর্য্য কত বড় একবার চিন্তা করিয়া দেখ! সূর্য্য অত্যন্ত দূরে আছে বলিয়াই এমন

ক্ষুদ্র দেখায়। কিন্তু নক্ষত্রগুলি আরও অনেক দূরে অবস্থিত, এইজন্য সূর্য্যের ন্যায় বৃহৎ নক্ষত্রগুলিও আমাদিগের নিকট আলোক-বিন্দুর ন্যায় প্রতীয়মান হয়।

যদি আমাদের সূর্য্যকে কোন একটা নক্ষত্রের স্থানে রাখিয়া, সেই নক্ষত্রটীকে সূর্য্যের স্থানে রাখা যাইত, তাহা হইলে বোধ হয় আমরা কোন পরিবর্ত্তনই লক্ষ্য করিতাম না। আমাদের সূর্য্যকে নক্ষত্রের ন্যায় ক্ষুদ্র এবং নক্ষত্রটীকে সূর্য্যের ন্যায়ই বৃহৎ ও উজ্জ্বল দেখাইত।

পৃথিবী সূর্য্যের গ্রহ। পৃথিবীর নিজের আলোক নাই; সূর্য্যের আলোকে আলোকিত হয়। পৃথিবীর ন্যায় বুধ, শুক্র, মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি ইত্যাদি আরও কতগুলি গ্রহ আছে। ঐ সকল গ্রহও সূর্য্যের কিরণে আলোকিত হয়। কোন গ্রহেরই নিজের আলোক নাই! গ্রহসকল একস্থানে স্থির নহে। উহারা সর্ব্বদা সূর্য্যের চারিদিকে ঘুরিতেছে। সূর্য্য ও নক্ষত্রসকল স্থির।* গ্রহদিগের গতিদ্বারা উহাদিগকে নক্ষত্রসকল হইতে চিনিয়া লওয়া যায়। নতুবা গ্রহ ও নক্ষত্র শুধুচক্ষে দূর হইতে দেখিতে ঠিক এক রকমই বোধ হয়।

আজ রাত্রিতে নক্ষত্র সকল পরস্পর হইতে যতদূরে যে ভাবে আছে, একমাস পরেও ঐরূপ থাকিবে। একশত বৎসর পরেও উহাদের স্থান ও পরস্পরের দূরত্বের কোনও পরিবর্ত্তন হইবে না। কিন্তু গ্রহগুলি সর্ব্বদা স্থান পরিবর্ত্তন করিতেছে।

মঙ্গল একটি অতি উজ্জ্বল গ্রহ। একদিন রাত্রিতে মঙ্গল আকাশের যে স্থানে আছে সেই স্থানের নিকটবর্ত্তী নক্ষত্রগুলি লক্ষ্য কর। মঙ্গল দৃশ্যতঃ কোন্ নক্ষত্রের কত নিকটে, কোন্টার কত বামে এবং কোন্টার কত দক্ষিণে তাহা কাগজে দাগ দিয়া রাখ। দুই তিনমাস পরে আকাশে মঙ্গল দেখিয়া কাগজের চিত্রের সহিত মিলাইয়া দেখ।

* নক্ষত্রদিগেরও গতি আছে; তাহা স্থানান্তরে উল্লিখিত হইয়াছে।

দেখিবে, নক্ষত্রগুলির পরস্পরের স্থান, কাগজে যেরূপ চিহ্নিত করিয়াছিলে তেমনি আছে। কিন্তু মঙ্গল পূর্ব্ব স্থানে নাই; চিহ্নিত নক্ষত্রগুলি অতিক্রম করিয়া গিয়াছে।

কোন জ্যোতিষ্ক গ্রহ কি নক্ষত্র তাহা জানিতে হইলে উহাকে কিছুদিন লক্ষ্য করিতে হইবে। যদি দেখা যায়, কোন জ্যোতিষ্ক চিহ্নিত নক্ষত্রগুলি অতিক্রম করিয়া যাইতেছে, তবে বুঝিতে হইবে উহা একটা গ্রহ।

গ্রহ চিনিবার আরও একটী উপায় আছে। নক্ষত্র সকল মিট্ মিট্ করিয়া আলোক দিয়া থাকে, কিন্তু গ্রহের আলোক মিট্‌মিট্ করে না; সর্ব্বদা একরূপ। *

উপগ্রহ।

গ্রহ যেমন সূর্য্যের চারিদিকে ঘুরে তেমনি কতকগুলি জ্যোতিষ্ক আছে, উহারা গ্রহের চারিদিকে ঘুরে। উহাদিগকে "উপগ্রহ" বা "চন্দ্র" কহে। আমাদের পৃথিবীর একটী উপগ্রহ বা চন্দ্র আছে। গ্রহের ন্যায় চন্দ্র বা উপগ্রহেরও নিজের আলোক নাই; উহারা সূর্য্যের আলোকে আলোকিত হয়।

একদিন রাত্রিতে যখন আকাশে চাঁদ উঠে, গ্রহ-নক্ষত্র সকল প্রকাশ পায়, তখন যদি আমাদের সূর্য্যকে একবারে ঢাকিয়া ফেলা যাইত, তাহা হইলে চন্দ্র ও গ্রহগুলি সম্পূর্ণ অদৃশ্য হইয়া যাইত। কিন্তু নক্ষত্রগুলি দীপ-মালার মত তেমনি উজ্জ্বল থাকিত। কারণ, নক্ষত্রের নিজের আলোক আছে, আর গ্রহ-উপগ্রহ সকলেই সূর্য্যের

---

* পণ্ডিতেরা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে বিকীরিত আলোক অনেক দূর হইতে আসিলে মিট্ মিট্ করিতে দেখা যায়। কিন্তু প্রতিফলিত আলোক স্থির ভাবে দীপ্তি প্রদান করে।

আলোকে উজ্জ্বল দেখায়। সূর্য্যের আলোক না পাইলে গ্রহ ও উপগ্রহসকল অদৃশ্য হইয়া যাইবে।

পৃথিবী কত বড় আমরা তাহারই ধারণা করিতে পারি না। আর সূর্য্য এই বিশাল পৃথিবীর ন্যায় তের লক্ষ পৃথিবীর সমান হইবে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আকাশের অগণিত নক্ষত্রের সকলেই এক একটী সূর্য্য! আমাদের সূর্য্যের চারিদিকে যেমন বহুসংখ্যক গ্রহ ঘুরিতেছে, ঐ সকল দূরবর্ত্তী কোটী কোটী সূর্য্যকেও বোধ হয় বহুসংখ্যক গ্রহ প্রদক্ষিণ করিতেছে। ঐ সকল কোটী কোটী সূর্য্য এক একটী বিশাল রাজ্যের রাজা স্বরূপ। পরস্পর হইতে উহারা কোটী কোটী মাইল ব্যবধান। এখন চিন্তা করিয়া দেখ, আকাশ কত বিস্তৃত! আকাশ অনন্ত। গ্রহ নক্ষত্রাদিও অনন্ত। অনন্ত আকাশের অনন্ত জ্যোতিষ্ক লইয়া ভগবানের অসীম সাম্রাজ্য! উহাকেই আমরা "ব্রহ্মাণ্ড" বলি।

ব্রহ্মাণ্ড অর্থ ব্রহ্মার 'অণ্ড' বা ডিম। ভগবানের সৃষ্ট জগৎ ডিমের ন্যায় গোলাকার। এই জন্য আমাদের প্রাচীন পণ্ডিতগণ ইহার নাম "ব্রহ্মাণ্ড" রাখিয়াছেন। বাস্তবিক ডিমের খোলসের ন্যায় আকাশ পৃথিবীকে চারিদিকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। আকাশের খোলটীর ঠিক মধ্যস্থলে যেন আমাদের পৃথিবী। আমাদের পুরাণে লিখিত আছে, দুইটী কটাহ মুখোমুখী করিয়া রাখিলে যেমন হয়, 'ব্রহ্মাণ্ড' ঠিক তেমন অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্ড গোলাকার। সেই ব্রহ্মাণ্ডের গোল আবরণের মধ্যেই পৃথিবী, চন্দ্র ও সূর্য্য নক্ষত্রাদি জ্যোতিষ্ক সকল অবস্থিত।

মাধ্যাকর্ষণ।

পৃথিবীর আকর্ষণ-শক্তির কথা।

তোমরা সকলেই দেখিয়াছ, ঊর্দ্ধে ঢিল নিক্ষেপ করিলে উহা কতক দূর উঠিয়া পৃথিবীর উপর পতিত হয়। বোঁটা ছিঁড়িলে ফল মাটিতে পড়ে। বন্দুকের গুলি খুব উপরে উঠে কিন্তু অবশেষে পৃথিবীতেই ফিরিয়া আইসে।

ইহার কারণ, পৃথিবীর একটা আকর্ষণী শক্তি আছে। সেই আকর্ষণ-বলে পৃথিবী সকল পদার্থকে নিজের কেন্দ্রের দিকে টানিতেছে। আশ্রয়হীন পদার্থ সেই আকর্ষণেই পৃথিবীর উপর পতিত হয়। পৃথিবীর সেই শক্তিকে মাধ্যাকর্ষণ কহে। নানাদেশের প্রাচীন পণ্ডিতেরা চুম্বকের লৌহ আকর্ষণ করিবার ক্ষমতা দেখিয়া অতিশয় বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছেন, কিন্তু পৃথিবী যে পদার্থসকলকে আকর্ষণ করিয়া নিজের উপর টানিয়া আনে তাহা তাঁহারা বুঝিতে পারেন নাই।

ভারতবর্ষের জ্যোতির্ব্বিদ্ পণ্ডিতগণ সর্ব্বপ্রথমে পৃথিবীর আকর্ষণী শক্তির কথা প্রকাশ করিয়াছেন। ভাস্করাচার্য্য নামক একজন পণ্ডিত স্পষ্টই লিখিয়াছেন, "পৃথিবীর আকর্ষণ করিবার শক্তি আছে। যেহেতু আশ্রয়হীন ভারী পদার্থসকল আকাশে নিক্ষেপ

ভাস্করাচার্য্য।

করিলে পৃথিবী নিজের দিকে আকর্ষণ করিয়া থাকে। তাহাতেই পদার্থসকল পড়িতেছে বলিয়া ধারণা জন্মে। চারিদিকেই সমান আকাশ, অতএব পৃথিবী কোথায় পতিত হইবে?* ভাস্করাচার্য্য খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে জন্মগ্রহণ

---

* আকৃষ্ট শক্তিশ্চ মহী তয়াযৎ,
খস্থং গুরু স্বাভিমুখং স্বশক্ত্যা,

সার আইজাক নিউটন।

করেন। তাঁহার পূর্ব্বে অন্য কোন দেশের লোকই এই সত্য অবগত ছিলেন না।

নিউটন।

সপ্তদশ শতাব্দীতে ইংলণ্ডের অসাধারণ পণ্ডিত "নিউটন্" স্বাধীন ভাবে মাধ্যাকর্ষণ আবিষ্কার করেন। কথিত আছে,—তিনি একদিন বাগানে বসিয়াছিলেন, এমন সময় হঠাৎ তাঁহার সম্মুখে একটা আতাফল পতিত হইল। আতাফলটী পড়িতে দেখিয়াই নিউটনের মনে চিন্তা হইল—আতাফলটী মাটীতে পড়িল কেন? উহার বোঁটা ছিঁড়িয়াছিল, উহা তো উপরেও উঠিতে পারিত? পৃথিবীতে পড়িবার কারণ কি? অচেতন পদার্থ এক স্থান হইতে অন্য স্থানে যাইতে পারে না, তবে বোঁটা ছিঁড়িলে ফল ভূ-পৃষ্ঠে আইসে কেন?

নিউটন্ গভীর চিন্তার পর স্থির করিলেন, যে জগতে সমস্ত পদার্থই পরস্পরকে আকর্ষণ করিতেছে। পদার্থ যতই দূরে থাকুক না কেন, এই আকর্ষণের বিরাম নাই। সামান্য ধুলিকণা হইতে পৃথিবী, চন্দ্র, সূর্য্য ও অপরাপর জ্যোতিষ্ক সকলেই এই আকর্ষণের অধীন। সূর্য্য যেমন পৃথিবীকে আকর্ষণ করিতেছে, পৃথিবীও তেমন সূর্য্যকে আকর্ষণ করিতেছে।

ভাস্করাচার্য্য কেবল পৃথিবীর আকর্ষণের কথা বলিয়াছিলেন। কিন্তু নিউটন প্রমাণ করিয়াছেন, জগতের ছোট বড় সকল বস্তুই পরস্পরকে আকর্ষণ করিতেছে। ব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় পদার্থই এই মাধ্যাকর্ষণের নিয়মের অধীন।

নিউটন্ মাধ্যাকর্ষণের কতকগুলি বিধি নির্দ্ধারণ করিয়াছেন।

আকৃষ্যতে তৎপততীব ভাতি,
সমে সমন্তাৎ কপতত্বিয়ং খে
৬ শ্লোকঃ সিদ্ধান্ত শিরোমণি, গোলাধ্যায়।

মোটামুটি উহার কয়েকটী বিধি জানা না থাকিলে 'আকাশের গল্প' বুঝিতে অসুবিধা হইবে, এই জন্য প্রথমেই তাহার সাধারণ বিবরণ প্রদত্ত হইল।

কোন পদার্থ হাতে লইলে বোধ হয়, যেন সেই পদার্থটা হাতকে নীচের দিকে টানিতেছে। পৃথিবী সকল পদার্থকেই আকর্ষণ করিতেছে, এইজন্য কোন পদার্থ শূন্যে তুলিয়া ধরিলে হাতে চাপ লাগে। পৃথিবীর এই আকর্ষণের জন্যই পদার্থ ভারী বোধ হয়। পৃথিবী সকল পদার্থকে সমান জোরে টানে না। এজন্যই ওজনের পার্থক্য ঘটে। একটী "ক্রিকেট বল্" তুলিতে হাতে যত আয়াস লাগে, এক খানি ইট তুলিতে তার চেয়ে বেশী আয়াস লাগে। একটা বড় পাথর তুলিতে আরও অধিক আয়াস লাগে। পাথর খুব বড় হইলে তুলিতেই পারা যায় না। ইহার কারণ, বল্ হইতে ইটে বেশী জিনিস এবং ইট হইতে পাথরে আরও বেশী জিনিস। সমান বড় একটী লোহার পাত ও একটী কাঠের তক্তা তুলিতে চেষ্টা করিলে দেখা যাইবে, লোহার পাতটী তুলিতে বেশী আয়াস লাগে। কারণ, লোহার পাতে কাঠের তক্তা হইতে জিনিস অধিক। পদার্থের জিনিসের অনুপাতে মাধ্যাকর্ষণের বল বেশি বা কম হয়।

জিনিস কাহাকে কহে।

মনে কর, জগতে কেবল 'ক' ও 'খ' এই দুইটী গোলা আছে। আর 'ক' ও 'খ' এর জিনিস সমান। তাহা হইলে উহারা পরস্পরের আকর্ষণে উভয়ের মধ্যবর্ত্তী ম স্থানে মিলিত হইবে।

পূর্ব্বোক্ত 'ক' ও 'খ' এর মধ্যে যদি খ এর জিনিষ ক অপেক্ষা বেশী হয় তাহা হইলে 'ক', 'খ' এর অধিকতর নিকটবর্ত্তী কোন এক স্থানে মিলিত হইবে।

এখন যদি 'ক' একটী লোহার গোলা হয়, আর 'খ' আমাদের পৃথিবী হয় তবে 'ক' গোলা এত অধিক পথ চলিবে যে পৃথিবীর গতি বুঝিতেই
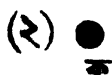
পারা যাইবে না। দেখা যাইবে যেন 'ক'ই সমস্ত পথ চলিয়া পৃথিবীর নিকটবর্ত্তী হইয়াছে। পৃথিবী যেন এক স্থানেই স্থির রহিয়াছে এবং 'ক' গোলককে নিজের দিকে আকর্ষণ করিয়া আনিয়াছে। এই জন্যই দেখা যায় যে পৃথিবী হইতে লঘু পদার্থসকল আশ্রয়হীন হইলে পৃথিবীর পৃষ্ঠে আসিয়া পড়ে।

একটী পদার্থ অন্য পদার্থকে যে বলে টানে সেই পদার্থও প্রথমটীকে সেই বলে টানে। একটী দৃষ্টান্ত দেখিলেই সহজে বুঝা যাইবে। বোঁটা ছিন্ন হইলে ফল মাটিতে পড়ে। উহার কারণ বলিয়াছি—পৃথিবীর আকর্ষণ। কিন্তু পৃথিবী যে বলে ফলকে আকর্ষণ করে ফলও সেই বলে পৃথিবীকে আকর্ষণ করে। তবে ফল পৃথিবীর টানে উহার পৃষ্ঠে আসিয়া পড়ে কেন? ইহার কারণ,—পৃথিবী অতিশয় প্রকাণ্ড পদার্থ; উহার জিনিস ফলের জিনিসের তুলনায় অত্যন্ত অধিক। সুতরাং যে বল ফলটীকে টানিয়া আনে সেই বল পৃথিবীকে নড়াইতেও পারে না বলিলেই হয়। এজন্য সমস্ত পদার্থই আশ্রয় না থাকিলে ঊর্দ্ধ হইতে পৃথিবীর আকর্ষণে উহার উপর পতিত হইয়া থাকে।

পদার্থ যত দূরে থাকে মাধ্যাকর্ষণের বল তত অল্প হয়। এই বলের পরিমাণ দূরত্বের বর্গানুসারে হ্রাস পায়। এক মাইল দূরে

মাধ্যাকর্ষণের যে বল, দুই মাইল দূরে তাহার অর্দ্ধেক হয় না, এক চতুর্থ হয়। এবং তিন মাইল দূরে তাহার নয় ভাগের এক ভাগ হইয়া থাকে। এই অনুপাতে প্রত্যেক গ্রহের উপর সূর্য্যের আকর্ষণ-বল নির্দ্ধারিত হইয়াছে। মাধ্যাকর্ষণের জন্যই পদার্থের ভার বোধ হয়। পৃথিবী সকল পদার্থকে নিজের দিকে টানিতেছে। কোন পদার্থ তুলিতে হইলে আমাদিগকে উহা জোরে উর্দ্ধে ঠেলিয়া রাখিতে হয়। এই নিমিত্তই কোন বস্তু তুলিতে ভারী বোধ হয়। সকল পদার্থের উপরেই মাধ্যাকর্ষণের সমান আকর্ষণ; অর্থাৎ মাধ্যাকর্ষণ একসের তুলা, একসের লৌহ ও একসের সোণাকে সমান বলে টানে।

পদার্থ সকল ভারী বোধ হয় কেন?

ইহাতে আমাদের জিনিসের পরিমাণ করিবার সুবিধা হইয়াছে। আমাদের সোণা, রূপা, লোহা, সীসা ইত্যাদি যে কোন পদার্থ আবশ্যক হয় আমরা দাড়ি পাল্লায় সেই পরিমাণের বাট্‌খেরার সহিত মিলাইয়া লই। এইরূপ জিনিস পরিমাণ করাকে ওজন করা বলে।

জড়পদার্থ অন্য বলের সাহায্য ব্যতীত পৃথিবীর আকর্ষণের বল অতিক্রম করিতে সক্ষম হয় না। এই জন্য যেখানে যে পদার্থ রাখ সেই পদার্থ সেইখানেই থাকে। আবার জড় পদার্থ আপনা হইতে চলে না। কিম্বা চালাইয়া দিলেও আপনা হইতে থামিতে পারে না। যাহা দ্বারা গতি (Motion) উৎপন্ন হয় তাহাকে বল (Force) কহে।

গতি ও বল।

কোন জড়পদার্থকে একবার চালাইয়া দিলে চিরকাল একই মুখে সরল পথে সমান বেগে চলিতে থাকে। যদি দেখ বেগ বাড়িতেছে তবে বুঝিবে গতির (Motion) অনুকূল বল (Force) আরোপিত হইয়াছে। যদি দেখ বেগ কমিতেছে, তবে বুঝিবে, গতির বিপরীত অর্থাৎ প্রতিকূল বল ক্রিয়া করিতেছে।

ঊর্দ্ধে ঢিল নিক্ষেপ করিলে মাধ্যাকর্ষণের বল গতির প্রতিকূল হয়। এইজন্য ঢিলের বেগ ক্রমে কমিয়া যায় ও শেষে ঢিল পতিত হয়। কিন্তু ঢিল পতিত হইবার সময় মাধ্যাকর্ষণের বল অনুকূল, এই জন্য ক্রমে বেগ বৃদ্ধি পায়। আবার যদি দেখা যায়, কোন পদার্থ সোজা না গিয়া বাঁকা চলিতেছে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, কোন বল পাশ হইতে গতির মুখ ফিরাইয়া দিতেছে।

দড়িতে ঢিল বাঁধিয়া ঘুরাইলে ঢিলটা সোজা পথেই ছুটিয়া যাইতে চায়। দড়ি ছাড়িয়া দিলে উহা সোজা পথেই ছুটিয়া যায়। হাতের বল উহাকে সোজা যাইতে না দিয়া কেবল গতির মুখ ফিরাইয়া দেয়। ঢিলটী সোজাপথে চলিতে না পারিয়া হাতের চারিদিকে ঘুরে।

গ্রহাদির সূর্য্য-প্রদক্ষিণের কারণ।

পূর্ব্বোক্ত কারণেই পৃথিবী ও অপরাপর গ্রহসকল সূর্য্যের চারিদিকে ঘুরিতেছে। সকল গ্রহেরই প্রথমে নিজের একটা গতি ছিল। সূর্য্যের আকর্ষণে ধরা পড়াতে উহারা আর নিজ নিজ পথে যাইতে পারিতেছে না।

সূর্য্য আকর্ষণ-বলে গ্রহসকলকে স্বীয় কেন্দ্রে আনিতে চায়। আবার গ্রহ সকল আপন বেগে সোজা পথে চলিয়া যাইতে চেষ্টা করিতেছে। সূর্য্যের বল আপন কেন্দ্রের দিকে, আর গ্রহদিগের বল সূর্য্যের বলের বিপরীত।

এই দুই কারণে গ্রহসমূহ সোজা পথেও যাইতে পারিতেছে না, আবার সূর্য্যের উপরে গিয়াও পড়িতেছে না। সূর্য্য কেবল উহাদের গতির মুখ ফিরাইয়া দিতেছে, তাই গ্রহসকল সূর্য্যের চারিদিকে রজ্জুবদ্ধ ঢিলের ন্যায় অনবরত ঘুরিতেছে। কোন কারণে যদি গ্রহদিগের বেগ কমিয়া যায় তাহা হইলে উহারা সূর্য্যের গায় গিয়া পড়িবে। আবার সূর্য্যের বল কমিলে গ্রহ সকল সোজা

পথে চলিয়া যাইবে। সূর্য্যের সহিত আর উহাদের কোন সম্বন্ধ থাকিবে না। (চিত্র দেখ) সোজাসুজি ক খ দিকে গ্রহের নিজের
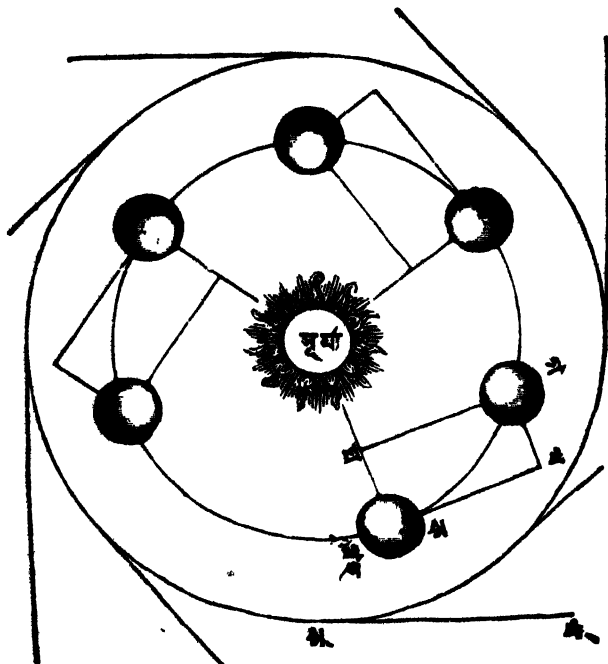
গতি; সূর্য্যের কেন্দ্রের দিকে সূর্য্যের আকর্ষণ। গ্রহ ক খ পথে চলে না, ক ঘ পথেও চলে না, মাঝামাঝি ক গ পথে চলিয়া সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিতেছে।

গ্রহগুলি যে কারণে সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করে সেই কারণে উপগ্রহ সকলও গ্রহগণের চারিদিকে ঘুরিতেছে। পৃথিবীর আকর্ষণ না থাকিলে, উহার চন্দ্র, সোজা পথে আপন বেগে চলিয়া যাইত। আবার চন্দ্রের বেগ না থাকিলে উহা এতদিনে একবারে পৃথিবীর উপর

আসিয়া পড়িত। চন্দ্র পৃথিবীতে আসিয়া পড়িলে বড় সোজা ব্যাপার হইত না।

মাধ্যাকর্ষণের প্রভাব ভগবানের বিশাল রাজ্যের সর্ব্বত্র বিদ্যমান। অনন্ত আকাশের অগণিত জ্যোতিষ্ক এই নিয়মের অধীন হইয়া চলিতেছে। কাহারও একটু অবাধ্য হইবার শক্তি নাই। বাস্তবিক ব্রহ্মাণ্ডের শৃঙ্খলা দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়।

জগতের সকলপদার্থই মাধ্যাকর্ষণের অধীন।

দূরবীক্ষণ।

হালণ্ড রাজ্যে হান্স লিপার্‌সিম্ নামে একজন চসমা ব্যবসায়ী ছিলেন। একদিন লিপার্‌সিম্ কোথায় গিয়াছিলেন, তখন সুযোগ পাইয়া তাঁহার পুত্র দুইখানি কাঁচ লইয়া খেলা করিতে লাগিলেন। তিনি একবার কাঁচ দুইখানির ভিতর দিয়া সম্মুখস্থ এক গির্জ্জার চূড়ার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। দেখিলেন, গির্জ্জার চূড়ায় স্থাপিত কুক্কুটের প্রতিকৃতিটী অপেক্ষাকৃত বড় এবং উহা বিপরীত অর্থাৎ উপরিভাগ নীচের দিকে দৃষ্টিগোচর হইতেছে। পুত্র এই ব্যাপারে অতিশয় বিস্মিত হইলেন। এবং পিতা বাড়ীতে ফিরিয়া আসিলে তিনি তাঁহাকে এই কথা জানাইলেন। পিতাও ঐরূপ দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। পুত্র অনেক চিন্তা করিয়া সেই কাঁচ দুইখানি একটী কাষ্ঠফলকে এরূপ কৌশলে সংযুক্ত করিলেন যে, ইহাদিগকে ইচ্ছানুসারে নিকটস্থ ও দূরস্থ করা যায়। ইহাই দূরবীক্ষণের সূত্রপাত।

দূরবীক্ষণ যন্ত্রের একটী চোঙ্গা বা নল আছে। ঐ চোঙের দুই-দিকে দুইখানি কাঁচ আটা থাকে। উহাদিগকে ইচ্ছামত পরস্পরের

নিকটে ও দূরে নিবার ব্যবস্থা আছে। একদিকের কাচটী বেশ বড়; উহাকে "বস্তুর কাচ" (Object glass) কহে। যে বস্তু দেখিতে হইবে, সেই বস্তুর ছবি উহাতে পড়া চাই। ছোট কাচটীকে "চোখের কাচ" (Eye piece) বলে। উহার ভিতর দিয়া দেখিতে হয়।

যে দুইরকম কাচের কথা বলিলাম, সাধারণ কাচ দিয়া উহাদের কাজ চলে না। কাচকে পালিশ করিয়া খুব মসৃণ করিতে হয়, তারপর বিশেষ ভাবে গড়িয়া লইলে তবে দূরবীক্ষণে ব্যবহারের উপযোগী হয়।

কাচের গড়নের উপর দূরবীক্ষণের গুণ নির্ভর করে। কোন্ কাচ কতখানি পুরু বা পাত্‌লা হইবে তাহা ঠিক্ করিতে অতিশয় বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতার প্রয়োজন। পূর্ব্বে বস্তুর কাচের স্থানে একরকম আরসী ব্যবহৃত হইত। কাঁচের ব্যবহার তখনও জানা ছিল না।

যে সময়ে হলাণ্ডের চশ্‌মা-বিক্রেতার পুত্র কাষ্ঠফলকে কাচ লাগাইয়া কৌতুক দেখিতেছিলেন, সেই সময়ে ইটালির বিখ্যাত পণ্ডিত গ্যালিলিও (Galileo) জীবিত ছিলেন। তিনি এই বিষয় অবগত হইয়া ১৬০৯ খৃঃ অব্দে এক কাষ্ঠময় নলের দুইদিকে কাচ বসাইয়া একটী দূরবীক্ষণ যন্ত্র প্রস্তুত করিলেন। ইহাই প্রকৃত পক্ষে প্রথম দূরবীক্ষণ।

গ্যালিলিওই সকলের আগে দূরবীক্ষণ দিয়া আকাশের জ্যোতিষ্ক সকল পর্য্যবেক্ষণ করেন। গ্যালিলিও যখন তাঁহার দূরবীক্ষণ-সাহায্যে 'চন্দ্রের পাহাড়,' 'সূর্য্যের গায় কালদাগ' 'বৃহস্পতির চারটী চন্দ্র' ও আর আর আশ্চর্য্য বিষয় প্রত্যক্ষ করিয়া সকলের নিকট বলিলেন, তখন কেহই তাঁহার কথা বিশ্বাস করিল না। বরং সকলেই তাঁহাকে পাগল মনে করিল। এই সকল অভিনব তথ্য আবিষ্কার করিয়া গ্যালিলিওকে অতিশয় নির্য্যাতন সহ্য করিতে হইয়াছিল।
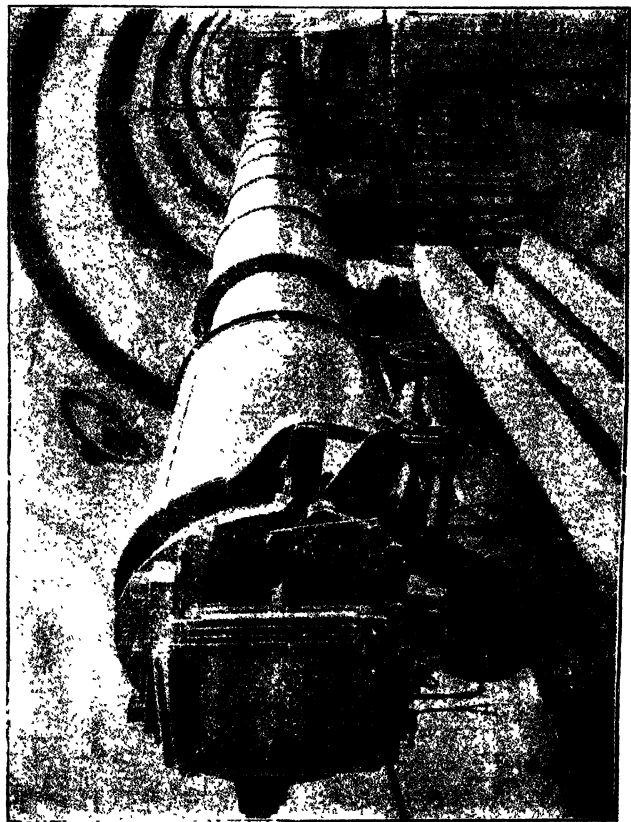
পারিসের দূরবীক্ষণ।

দূরবীক্ষণের ইতিহাসে গ্যালিলিওর পরই হর্শেলের (William Herschel) নাম উল্লেখযোগ্য। হর্শেলের জন্মস্থান জর্ম্মনি দেশে। তিনি একজন সৈনিক ছিলেন। কিন্তু ঐ কার্য্য তাঁহার ভাল না লাগায় তিনি জর্ম্মনি দেশ হইতে পলায়ন করিয়া ইংলণ্ডে আশ্রয় লইলেন। হর্শেল ইংলণ্ডে আসিয়া গান বাজনার ব্যবসা আরম্ভ করিলেন। ঐ ব্যবসায়ে তাঁহার বেশ পয়সা হইতেছিল। কিন্তু ভগবান্ সেই সময়ে তাঁহার সম্মুখে উন্নতির এক নূতন পথ খুলিয়া দিলেন।

হর্শেল দূরবীক্ষণ দিয়া আকাশের জ্যোতিষ্ক দেখিতে বড়ই ভালবাসিতেন। কিন্তু তাঁহার কাছে যে দূরবীক্ষণটী ছিল, সেইটী অতি নিকৃষ্ট রকমের। উহাদ্বারা হর্শেলের কৌতূহল নিবৃত্ত হইত না। তিনি একটী ভাল দূরবীক্ষণ পাইবার জন্য বড়ই ব্যস্ত হইলেন। হর্শেল ভাল একটী দূরবীক্ষণ কিনিতে গিয়া দেখিলেন, মূল্য এত অধিক যে দাম দিয়া কিনা তাঁহার অসাধ্য। তখন তিনি নিজেই দূরবীক্ষণ প্রস্তুত করিতে সঙ্কল্প করিলেন।

হর্শেল সংকল্প করিয়া একেবারে কাজে লাগিয়া গেলেন। দূরবীক্ষণ নির্ম্মাণ করা যে খুব কঠিন কাজ তাহা বলাই বাহুল্য। যেমন বুদ্ধির প্রয়োজন, তেমন পরিশ্রম ও অভ্যাসের দরকার। হর্শেল তবু দমিলেন না। তিনি গান-বাজনার ব্যবসা করিয়া যে অবসর পাইতেন তাহা দূরবীক্ষণ নির্ম্মাণে ব্যয় করিতেন। হর্শেল এই কার্য্যে এমন মনোযোগ দিলেন যে, স্নান আহারের কথা পর্য্যন্ত অনেক সময় তাঁহার স্মরণ থাকিত না। তাঁহার ভগিনী 'কেরোলিন' ক্ষুধার সময় ভ্রাতার মুখে আহার তুলিয়া দিতেন এবং "আরব্য উপন্যাস" পড়িয়া শুনাইয়া তাঁহার পরিশ্রমের ক্লেশ দূর করিতেন।

হর্শেল বহু ক্লেশ ও পরিশ্রম করিয়া একটী উৎকৃষ্ট দূরবীক্ষণ নির্ম্মাণ করিলেন। পণ্ডিতেরা তাঁহার দূরবীক্ষণ খুব পছন্দ করিলেন। তখন

হর্শেল গান বাজনার ব্যবসা পরিত্যাগ করিয়া দূরবীক্ষণ নির্ম্মাণ করিতে লাগিলেন। অধ্যবসায়ের ফলে তিনি ঐ কার্য্যে অতিশয় দক্ষতা লাভ করিলেন। হর্শেল যে কেবল দূরবীক্ষণই নির্ম্মাণ করিতেন তাহা নহে। তিনি জ্যোতিষ শাস্ত্রেরও চর্চ্চা করিতেন। এই বিষয়ে তিনি অনেক নূতন তথ্য আবিষ্কার করিয়াছেন। পরিশেষে ইউরেনাস্ নামক গ্রহ আবিষ্কার করিয়া হর্শেল জগতে অমর হইয়াছেন।

হর্শেল বহু দূরবীক্ষণ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। তাহার মধ্যে যে যন্ত্রটী খুব বড়, উহার ব্যাস ৪ ফিট্ ছিল ; সেই দূরবীক্ষণের দ্বারা আকাশের গ্রহ নক্ষত্রকে উহারা যত দূরে আছে তার চেয়ে ৮••••••••আশী কোটি মাইল নিকটবর্ত্তী দেখা যাইত। হর্শেল একবার আমোদ করিবার জন্য তাঁহার বন্ধুবান্ধব দিগকে লইয়া দূরবীক্ষণের চোঙের ভিতর বসিয়া আহার করিয়াছিলেন।

বর্ত্তমান সময়ে অনেক উৎকৃষ্ট দূরবীক্ষণ নির্ম্মিত হইয়াছে। ইহাদের তুলনায় হর্শেলের দূরবীক্ষণ অতি সাধারণ। আমেরিকার হেমিল্টন্ পর্ব্বতে প্রতিষ্ঠিত "লিক্" (Lick) মান-মন্দিরে একটী খুব উৎকৃষ্ট দূরবীক্ষণ আছে। উহার নলটী ৩৮ হাত লম্বা, আর সম্মুখের বড় কাচ (Object Glass) খানির ব্যাস দুই হাত। প্রায় ২৫ হাত উচ্চ একটী স্তম্ভের উপর দূরবীক্ষণটী স্থাপিত।

লিক্ মানমন্দিরের দূরবীক্ষণটীতে মোট সওয়া ছয় লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছে। কেবল বড় কাচ খানির জন্য এক লক্ষ ছাপ্পান্ন হাজার টাকা লাগিয়াছে। "জেম্‌স্ লিক্" নামক এক ব্যক্তির অর্থে এই মান-মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে। তাঁহার নাম অনুসারেই মান-মন্দিরের নাম হইয়াছে। লিক লেখাপড়া জানিতেন না। ব্যবসা করিয়া তিনি অনেক অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন। তাঁহার কোন উত্তরাধিকারী না থাকায়, মরিবার সময় তিনি উইল করিয়া

তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি একটী মান-মন্দির নির্ম্মাণের জন্য দিয়া যান। উইলের একটী সর্ত্ত ছিল এই যে, তাঁহার টাকা দিয়া পৃথিবীর সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট একটী দূরবীক্ষণ নির্ম্মাণ করিতে হইবে।
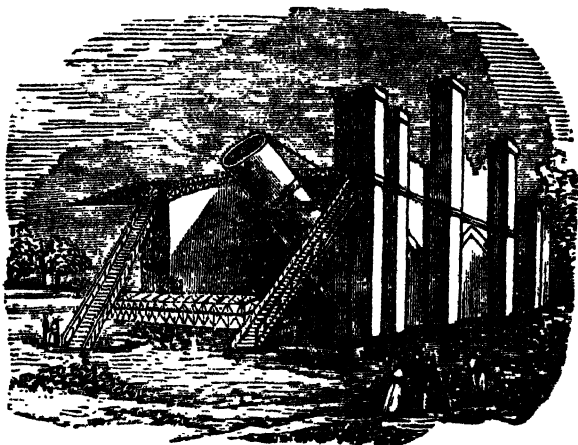
লর্ড রসের দূরবীক্ষণ।

সেই দূরবীক্ষণ নির্ম্মাণের পর আরও বড় দুইটী দূরবীক্ষণ নির্ম্মিত হইয়াছে। আয়র্লণ্ড নিবাসী "লর্ড রস্" (Lord Ross) যে দূরবীক্ষণটী প্রস্তুত করিয়াছেন, তাহাই বর্ত্তমান সময়ের সর্ব্বাপেক্ষা বিখ্যাত দূরবীক্ষণ। উহার দৈর্ঘ্য ৩৬ হাত, চোঙ্গের ব্যাস প্রায় সাড়ে চার হাত। এই দূরবীক্ষণটী নির্ম্মাণ করিতে প্রায় সাড়ে চারি লক্ষ টাকা ব্যয়িত হইয়াছে। রসের দূরবীক্ষণ দিয়া অনেক নূতন তথ্য আবিষ্কৃত হইয়াছে। আমরা এই পুস্তকের অনেক স্থানে এই বিখ্যাত দূরবীক্ষণের উল্লেখ করিয়াছি। বিগত 'পারিস' নগরীর প্রদর্শনীতে যে দূরবীক্ষণ প্রদর্শিত হইয়াছিল, উহা রসের দূরবীক্ষণ হইতেও বৃহৎ।

বর্ণ-বীক্ষণ।

দূরবীক্ষণ আবিষ্কৃত হইলে আকাশের অনেক অদৃশ্য গ্রহ নক্ষত্রাদি দৃষ্টিগোচর হইল। কিন্তু তাহাতেও জ্ঞানিগণের তৃপ্তি হইল না। দূরবর্ত্তী জ্যোতিষ্কসকল কি অবস্থায় আছে, কি পদার্থে উহারা গঠিত, উহাদের নিজের আলোক আছে কি না, ইত্যাদি বিষয় জানিবার জন্য কৌতূহল হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু ঐ সকল তথ্য অতি উৎকৃষ্ট দূরবীক্ষণ সাহায্যেও জানিতে পারা যায় না।

বর্ণ-বীক্ষণের জন্ম-কথা।

ব্রহ্মাণ্ডের তুলনায় সৌর-জগৎ অতিক্ষুদ্র। সুতরাং সৌর-জগতের সূর্য্য ও গ্রহাদির অবস্থা বিচার করিয়া অতিশয় দূরবর্ত্তী জ্যোতিষ্ক-সকলের সম্বন্ধে কোনও মীমাংসাই করা যাইতে পারে না। বর্ণ-বীক্ষণ (Spectroscope) আবিষ্কারের পূর্ব্বে সূর্য্যের উপাদান সম্বন্ধেও পণ্ডিতেরা কোনও তথ্য নির্দ্ধারণ করিতে পারেন নাই। নক্ষত্রসকল সূর্য্যের মত তেজোময় অর্থাৎ উহাদেরও নিজের আলোক আছে, এই সংবাদ দূরবীক্ষণ প্রদান করিল। কিন্তু উহারা কি পদার্থে গঠিত তাহা জানা গেল না।

১৬৭৫ খৃঃ অব্দে নিউটন্ প্রথম আবিষ্কার করিলেন যে সূর্য্যের সাদা রশ্মিতে প্রধানতঃ সাতটী রংএর আলোক আছে। * অর্থাৎ সাত রংএর আলোক মিশিয়া ঐ সাদা রংএর আলোক হইয়াছে। নিউটন তিন পল বিশিষ্ট কাচ (Prism) দিয়া সূর্য্যের আলোক পৃথক করিয়া দেখাইলেন সাত রংএর আলোক হয়। আমরা যে সাতবর্ণের রামধনু দেখিতে

---

* সূর্য্য-রশ্মিতে অনেক রং আছে। আমরা সাতটি মাত্র রং ধরিতে পারি।

পাই তাহার কারণ, সূর্য্যের রশ্মি জল-বিন্দুর উপর পড়িলে ঐ সাদা আলোকের উপাদান পৃথক্ হইয়া যায় এবং সাত বর্ণের বিচিত্র রামধনু দৃষ্টিগোচর হয়। ঝাড়ের কলমের ভিতর দিয়াও সূর্য্যের আলোক গেলে উহার উপাদানগুলি পৃথক হইয়া যায় এবং রামধনুর মত রং দেখিতে পাওয়া যায়। তিন পল বিশিষ্ট কাচ আলোকের উপাদান পৃথক করে। ইহা ঐ কাচের গুণ।

বর্ণ-বীক্ষণের কাজ ও ব্যবহার প্রণালী।

আলোক বিশ্লিষ্ট হইলে অর্থাৎ উহার উপাদানগুলি পৃথক্ হইয়া পড়িলে যে সাত বর্ণের রামধনুর বর্ণবিশিষ্ট ফিতার আকার হয় উহাকে বর্ণ-চ্ছটা (Spectrum) কহে। বর্ণ-বীক্ষণ যন্ত্রে (Spectroscope) তিন পল বিশিষ্ট কাচ দ্বারা আলোক বিশ্লেষণ করা হয়। ঐ কাচটাই যন্ত্রের প্রধান অংশ। তাহা ছাড়া ঐ যন্ত্রে আলোকের বর্ণচ্ছটা সূক্ষ্মরূপে পরীক্ষা করিবার উপায় করা হইয়াছে। অনেক যন্ত্রে বর্ণচ্ছটার "ফটোগ্রাফ" তুলিবারও সুবিধা থাকে।

জ্বলন্ত পদার্থ ও তাহার অবস্থা ভেদে বর্ণচ্ছটার চেহারা অসংখ্য রকম হয়। "ফ্রাউনহোপার" (Frounhoper) নামক একজন জার্ম্মান পণ্ডিত এই তথ্যটি আবিষ্কার করেন। তিনি পরীক্ষা করিয়া দেখাইলেন, সকল পদার্থের আলোকই বিশ্লিষ্ট হইলে বর্ণচ্ছটা হয়। কিন্তু বিভিন্ন পদার্থের বর্ণচ্ছটা বিভিন্ন রকম। সুতরাং যে পদার্থ হইতে আলোক আসিতেছে সেই পদার্থের আলোক বিশ্লেষণ করিয়া উহার বর্ণচ্ছটা পরীক্ষা করিলেই বলা যাইতে পারে উহা কি কি উপাদানে গঠিত। বর্ণচ্ছটা পরীক্ষা করিয়া পদার্থের উপাদান তো বলা যাইতে পারেই, তাহা ছাড়া উহা কঠিন অথবা তরল কিংবা বাষ্পময়, উহা স্থির কি সচল, সচল হইলে নিকট আসিতেছে কি দূরে সরিতেছে এবং উহার বেগ কিরূপ ইত্যাদি বিষয়ও নির্দ্ধারণ করা যাইতে

পারে। * দূরবীক্ষণ দিয়া যেমন দূরের জ্যোতিষ্কসকল দৃষ্টিগোচর হইতেছে তেমন বর্ণ-বীক্ষণ দিয়া উহাদের প্রাকৃতিক অবস্থা জানিবার সুবিধা হইয়াছে।

সূর্য্যে লৌহ, দস্তা, সীস ইত্যাদি নানা প্রকার ধাতু আছে, শুক্রে ও মঙ্গলে জল আছে ইত্যাদি তথ্য আমরা বর্ণ-বীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যেই জানিতে পারিয়াছি। কোটি কোটি মাইল দূরবর্ত্তী নক্ষত্রসকল যে আমাদের সূর্য্যের ন্যায় এক একটী প্রকাণ্ড সূর্য্য, উহারাও যে তেজোময় তাহাও আমরা বর্ণ-বীক্ষণের পরীক্ষায় অবগত হইয়াছি।

এখন বুঝিতে পারিলে, দূরবীক্ষণ সাহায্যে দূরের জ্যোতিষ্কগুলি আমরা ভাল রূপে দেখিতে পাই। আর বর্ণ-বীক্ষণ দ্বারা জানিতে পারি, কোন্ জ্যোতিষ্কটী কি কি সামগ্রী দিয়া প্রস্তুত হইয়াছে, উহা চলিতেছে কি স্থির আছে এবং উহা কঠিন, তরল, কি বাষ্পময় অবস্থায় আছে। এই দুইটী যন্ত্রের সাহায্যে আমরা কোটী কোটী মাইল দূরবর্ত্তী গ্রহ-নক্ষত্রাদির বিস্ময়জনক বৃত্তান্ত জানিতে পারিয়াছি। দেখ, মানুষ বুদ্ধি বলে কত উন্নতি করিয়াছে।

ফটোগ্রাফী।

তোমরা নিশ্চয়ই ফটোগ্রাফের চিত্র দেখিয়াছ। অনেকে নিজেদেরই ফটো তুলিয়া থাকিবে। একটী যন্ত্রের সাহায্যে ইচ্ছামত সকল

* হাগিন (Huggin) বর্ণ-বীক্ষণ সাহায্যে স্থির করিয়াছেন সিরিয়াস্ (Sirius) নামক একটী উজ্জ্বল নক্ষত্র সেকেণ্ডে ২০ মাইল গতিতে আমাদের পৃথিবী হইতে দূরে সরিয়া যাইতেছে এবং আর্কটরাস (Arcturus) নামক আর একটী বৃহৎ নক্ষত্র প্রতি সেকেণ্ডে ৫০ মাইল গতিতে পৃথিবীর নিকটবর্ত্তী হইতেছে।

পদার্থেরই ছবি তুলিয়া লওয়া যায়। ঐ যন্ত্রের মধ্যে আরকের সাহায্যে তৈয়ারি কাচ পুরিয়া লইতে হয়। যে আলোক এত ক্ষীণ যে, চোকে একটুকুও দেখা যায় না, আঁধারই থাকিয়া যায়, সেই আলোকও পূর্ব্বোক্ত যন্ত্রের মধ্যস্থিত প্রলেপ দেওয়া কাচে চিহ্ন রাখিয়া যায়। আমরা খালি চক্ষে যে সকল পদার্থ দেখি দুরবীক্ষণ চক্ষে লাগাইলে তার চেয়ে অনেক দূরের বস্তু দেখিতে সমর্থ হই। আর চক্ষের বদলে যদি ঐ প্রলেপ দেওয়া কাচ দুরবীক্ষণে লাগাইয়া লই, তাহাহইলে অনেক দূরবর্ত্তী অদৃশ্য জ্যোতিষ্কসকলের আলো ঐ কাচে পড়িয়া চিহ্ন রাখিয়া যাইবে।

সাধারণতঃ ফটোগ্রাফীদ্বারা আমাদের কি উপকার হইয়া থাকে তাহা না বলিলেও হইবে। কিন্তু বৈজ্ঞানিক জগতে ফটোগ্রাফীতে যে কি কল্যাণ সাধিত হইয়াছে তাহার সামান্য আভাস মাত্র দিতেছি। ফটোগ্রাফীর সাহায্যে অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রহ আবিষ্কৃত হইয়াছে। সেইগুলি এত ক্ষুদ্র যে কোন কালেই হয়ত চক্ষে ধরা পড়িত না। যে সকল নক্ষত্র এত দূরবর্ত্তী যে উহাদের ক্ষীণ আলোকরশ্মিও আমরা চক্ষে দেখিতে পাই না, উহারাও ঐ ফটোগ্রাফীর সাহায্যে ধরা পড়িয়াছে। ফটোগ্রাফীর সাহায্যে আকাশের তারা গণিবার কত সুবিধা হইয়াছে। যেমন ফটোযন্ত্রের সাহায্যে মানুষের কিম্বা দৃশ্যাবলীর চিত্র তোলা যায় তেমনি সমস্ত আকাশের ভিন্ন ভিন্ন খণ্ডের চিত্র তুলিতে পারা যায়। ঐ চিত্রে জ্যোতিষ্কসকলের চিহ্ন পড়ে। ঐ রকম খণ্ড খণ্ড ছবি একত্র জুড়িয়া লইলেই আকাশের একখানি সম্পূর্ণ মানচিত্র হইল। ঐরূপে তারা গণনা করা কত সহজ হইয়া পড়ে!

আকাশের গল্প।

প্রথম খণ্ড।

সৌর-জগৎ।

আমাদের বোধ হয়, পৃথিবী স্থির রহিয়াছে, আর সূর্য্য উহার চারিদিকে ঘুরিতেছে। সূর্য্য যেন পূর্ব্বদিকে উদয় হইয়া পশ্চিম দিকে অস্ত যায়; আবার পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করিয়া পূর্ব্বদিকে দেখা দেয়। বাস্তবিক সূর্য্য স্থির, পৃথিবীই উহাকে প্রদক্ষিণ করিতেছে।

চলন্ত গাড়ীতে বসিয়া পথের ধারের গাছ পালার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে বোধ হয় গাড়ী একস্থানেই রহিয়াছে আর গাছপালাই গাড়ীর পশ্চাতের দিকে ছুটিয়া চলিয়াছে।

পৃথিবী অবিরত চলিতেছে। আমরা গতিশীল পৃথিবীতে থাকিয়া দেখি, যেন সূর্য্য পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমে যাইতেছে। বাস্তবিক পৃথিবীরই

গতি পশ্চিম হইতে পূর্ব্বদিকে। পৃথিবী, পশ্চিম হইতে পূর্ব্বদিকে অবিরত নিজ মেরুদণ্ডের (axis) চারিদিকে লাটিমের ন্যায় ঘুরিয়া ঘুরিয়া সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিতেছে। পৃথিবীর আবর্ত্তনের (rotation) জন্যই সূর্য্য ঘুরিতেছে বলিয়া বোধ হয়।

সৌর-জগৎ কাহাকে কহে ?

সূর্য্য ও উহার আকর্ষণের অধীন জ্যোতিষ্কসমূহ লইয়া 'সৌর-জগৎ'। সূর্য্য, সৌর-জগতের মধ্যস্থলে অবস্থিত। সমস্ত জ্যোতিষ্ক-মণ্ডলী মাধ্যাকর্ষণের প্রভাবে নিয়মিত সময়ে নির্দ্দিষ্ট পথে সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিতেছে। সুতরাং সূর্য্যকে সৌর-জগতের রাজা বলা যাইতে পারে।

সৌর-জগতের সাধারণ বিবরণ।

সৌর-জগতে এপর্য্যন্ত প্রায় ৪৫০ সাড়ে চারিশত গ্রহ আবিষ্কৃত হইয়াছে।* ইহাদের মধ্যে আটটী গ্রহই প্রধান। আটটী গ্রহের মধ্যে বুধ, শুক্র, পৃথিবী, মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি এই ছয়টী গ্রহ প্রাচীন জ্যোতির্ব্বিদগণের নিকট পরিচিত ছিল।

ইউরেনাস্ ও নেপ্‌চুন্ এই দুইটী গ্রহ অনেক পরে আবিষ্কৃত হইয়াছে। তাহা ছাড়া চারিশতের অধিক অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রহ নূতন আবিষ্কৃত হইয়াছে। এখনও প্রায় প্রতি বৎসরেই নূতন নূতন ক্ষুদ্র গ্রহ ধরা পড়িতেছে।

গ্রহের নাম, স্থান ও সংখ্যা।

---

* প্রাচীন হিন্দুশাস্ত্রে ৯টী গ্রহের উল্লেখ আছে। সেই নয়টী গ্রহ—রবি, চন্দ্র, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, শনি, এবং রাহু ও কেতু। তখনকার পণ্ডিতেরা মনে করিতেন,—পৃথিবী স্থির ; উহার চতুর্দ্দিকে সূর্য্য, চন্দ্র, মঙ্গলপ্রভৃতি গ্রহ ঘুরিতেছে। বাস্তবিক রাহু ও কেতু কোন জ্যোতিষ্ক নহে ; উহারা পৃথিবী ও চন্দ্রের ছায়া মাত্র। অপর সাতটী জ্যোতিষ্ক হইতে রবি, সোম, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র ও শনি এই সাতটী বারের নাম হইয়াছে। রবি গ্রহ নয় পূর্ব্বেই বলিয়াছি।

গ্রহদিগের মধ্যে বুধ, সূর্য্যের নিকটতম। বুধের পর শুক্র। তাহার পর পৃথিবী, পৃথিবীর পর মঙ্গল। (চিত্র দেখ) এই চারিটী গ্রহের মধ্যে পৃথিবী আয়তনে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ, আর বুধ সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র। শুক্র প্রায় পৃথিবীর সমান; মঙ্গল, শুক্র হইতে ক্ষুদ্র কিন্তু বুধ হইতে বড়।
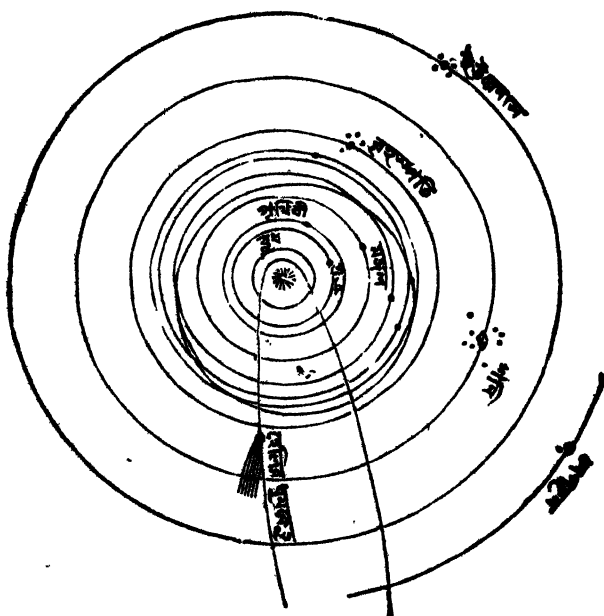
সৌর-জগৎ।

মঙ্গলের পর বৃহস্পতি। বৃহস্পতি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গ্রহ। উজ্জ্বলতায় ও আয়তনে উহাকে গ্রহ-রাজ বলা যাইতে পারে। কিন্তু খালি চক্ষে শুক্রকেই সর্ব্বাপেক্ষা উজ্জ্বল ও বৃহৎ দেখায়। মঙ্গল ও বৃহস্পতির

মধ্যবর্ত্তী স্থলে নূতন আবিষ্কৃত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রহগুলি অবস্থিত। দূরবীক্ষণ ব্যতীত উহাদের দুই একটী ছাড়া অপর গ্রহগুলিকে দেখিবার সাধ্য নাই। ঐ সকল গ্রহের প্রত্যেকেই নির্দ্দিষ্ট পথে. নিয়মিত সময়ে সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিতেছে। সিরিস্, পেলাস্, যুনো, ভেষ্টা, ফ্লোরা ও ভিক্টোরিয়া এই কয়টী গ্রহই অপেক্ষাকৃত বড়।

বৃহস্পতির পর শনি গ্রহ। শনি বৃহস্পতি হইতে অনেক ক্ষুদ্র; তথাপি আয়তন অনুসারে গ্রহদিগের মধ্যে বৃহস্পতির পরেই উহার স্থান। শনির পরবর্ত্তী গ্রহ ইউরেনাস্, তারপর নেপ্‌চুন্। পূর্ব্বে পণ্ডিতেরা শনি পর্য্যন্তই সৌর-জগতের সীমা বলিয়া জানিতেন, শনির পরে কোন গ্রহ আছে, বহুশতাব্দী পর্য্যন্ত একথা কাহার কল্পনায়ও উদয় হয় নাই। ইউরেনাস্ ও নেপ্‌চুন্ আবিষ্কৃত হইলে জানা গেল সৌর-জগৎ কত বিস্তৃত!

পৃথিবীকে ১৭ ভাগ করিয়া এক ভাগ লইলে বুধ, ১০ ভাগ করিয়া ৯ ভাগ লইলে শুক্র, এবং সাত ভাগ করিয়া একভাগ লইলে মঙ্গলের সমান হইবে। অর্থাৎ বুধ $\frac{১}{১৭}$, শুক্র $\frac{৯}{১০}$, মঙ্গল $\frac{১}{৭}$, বৃহস্পতি ১৩০০, শনি ৭১৭, ইউরেনাস্ ৬৩ এবং নেপ্‌চুন্ ৮৬টী পৃথিবীর সমান।
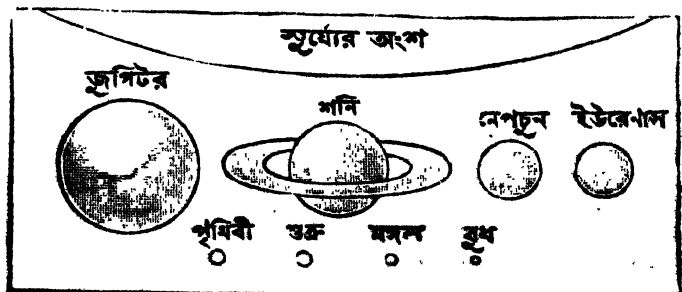
তুলনায় গ্রহদিগের আয়তন।

সৌর-জগতের গ্রহদিগের আয়তন ও দূরত্বের বিষয়ে সুপ্রসিদ্ধ জ্যোতির্ব্বিদ্ হর্শেল্ একটী দৃষ্টান্ত দিয়া অতি সুন্দররূপে বুঝাইয়া দিয়াছেন। একটী সমতল মাঠের মাঝখানে দুই ফিট্ ব্যাস * বিশিষ্ট একটী গোলক স্থাপন করিয়া মনে কর উহা আমাদের সূর্য্য। এই কাল্পনিক সূর্য্য হইতে ৮২ ফিট্ দূরে একটী সরিষা রাখ, উহা বুধ; ১৪২ ফিট্ দূরে একটী মটর রাখ, উহা শুক্র; ২১৫ ফিট্ দূরে আর একটী মটর রাখ, উহা পৃথিবী; এবং ৩২৭ ফিট্ দূরে একটী আল্‌পিনের মাথা রাখিয়া মনে কর উহা মঙ্গল। মঙ্গলের পর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রায় তিনশত গ্রহ; উহাদের জন্য আমাদের পূর্ব্বোক্ত সূর্য্য হইতে ৫০০ হইতে ৬০০ ফিট্ মধ্যে কতগুলি ধূলি ছড়াইয়া দাও। ১৩২০ ফিট্ দূরে একটী কমলালেবু রাখিলে বৃহস্পতির অনুরূপ হইবে, আর ২১১২ ফিট্ দূরে একটী ছোট কমলালেবু এবং ৩৯৬০ ফিট্ দূরে একটী ছোট কুল রাখিলে যথাক্রমে শনি ও ইউ-রেনাসের অনুরূপ হইবে। নেপ্‌চুনের জন্য ৬৬০০ ফিট্ দূরে একটী বড় কুল রাখিলেই চলিবে।

তুলনায় গ্রহদিগের আয়তন।

গ্রহ সকল নির্দ্দিষ্ট পথে সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিতেছে। ঐ ভ্রমণ পথকে 'কক্ষ' (orbit) কহে। গ্রহের কক্ষ সম্পূর্ণ গোলাকার নহে—বৃত্তাভাস (Ellipse)।

গ্রহকক্ষ।

---

* ব্যাস ও পরিধি। পূর্ব্বেই বলিয়াছি গ্রহসকল গোলাকার। গোল বস্তু মাত্রেরই ব্যাস ও পরিধি আছে। একটী কমলা লেবুর মাঝখানে একটী সূতা এক পাক জড়াও। এক পাকে যতটা সূতা লাগিল উহাই কমলা লেবুর 'পরিধি' অর্থাৎ বেড়। একটী শলাকা ঐ কমলা লেবুর ঠিক মধ্য দিয়া এক প্রান্ত হইতে ঠিক অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত চালাইয়া দাও। এইটীই উহার 'ব্যাস'।

সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

গ্রহের নাম	ব্যাস	সূর্য্য হইতে দূরত্ব	স্বীয় মেরুদণ্ডের চারিদিকে আবর্ত্তনের সময়			যত সময়ে সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করে।			কাহাকর্ত্তৃক কোন্ সময়ে আবিষ্কৃত হয়	গতি (প্রতি মিনিটে)
	(মাইল)	(মাইল)	ঘঃ	মিঃ	সেঃ	দিঃ	ঘঃ	মিঃ		মাইল—
বুধ	২৯৯২	৩৫৯৮৭০০০	২৪	৫	—	৮৭	২৩	১৬	প্রাচীন	১৭৮৪
শুক্র	৭৬৬০	৬৭২৪৫০০০	২৩	১৬	২১	২২৪	১৬	৫০	”	১৩০৫
পৃথিবী	৭৯১৬	৯১২৯৬০০০০	২৩	৫৬	৪	৩৬৫	৬	৯	”	১১১০
মঙ্গল	৪২১১	১৪১৬৫০০০০০	২৪	৩৭	২০	৬৮৬	২৩	৩১	”	৯০৫
বৃহস্পতি	৮৬০০০	৪৮৫৬৭৮০০০	৯	৫৫	২১	৪৩৩২	১৪	২	”	৪৮৭
শনি	৭০৫০০	৮৮৬৭৭৯০০০	১০	১৪	২৩	১০৭৫৯	৫	১৬	”	৩৫৪
ইউরেনাস্	৩১৭০০	১৭৮৩৩৮৩০০০	১০	—	—	৩০৬৮৮	১৭	২১	হর্শেল্ (১৭৮১)	২৫৩
নেপচুন্	৩৪৫০০	২৭৯৪০০০০০০				৬০১৮০	১৭	৫	লেভেরিয়ার	২০২
সূর্য্য	৮৬৬০০০		২৫	৭	৪৮					

সৌর-জগতে 'ধূমকেতু' নামক আর একপ্রকার অতি অদ্ভুত জ্যোতিষ্ক আছে। উহাদের বিকট আকৃতি দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। আকাশে নানাপ্রকার আকৃতি বিশিষ্ট ধূমকেতু দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। কতকগুলি ধূমকেতু পুচ্ছহীন, আর কতকগুলির পুচ্ছ আছে। ধূমকেতুর পুচ্ছটী বড়ই আশ্চর্য্যজনক। আকাশে দ্বি-পুচ্ছ, ত্রি-পুচ্ছ ও বহু-পুচ্ছ ধূমকেতু মাঝে মাঝে আবির্ভূত হইয়া থাকে। কতকগুলি ধূমকেতু গ্রহসকলের ন্যায় নির্দ্দিষ্ট সময়ে সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিতেছে। আর কতকগুলি ধূমকেতু সৌর-জগতে একবার দেখা দিয়া চিরদিনের জন্য অদৃশ্য হইয়া যায়।

ধূমকেতু।

পূর্ব্বোক্ত সুবৃহৎ জ্যোতিষ্ক ব্যতীত "উল্কা" নামক এক প্রকার ক্ষুদ্র জ্যোতিষ্ক আকাশে প্রায়ই দৃষ্ট হইয়া থাকে। রাত্রিকালে আকাশের দিকে কিছুকাল তাকাইয়া থাকিলে "হাউই" বাজীর মত এক-প্রকার উজ্জ্বল পদার্থ শূন্যে ছুটাছুটি করিতে দেখা যায়। উহা-দিগকেই উল্কা কহে। উল্কাপাত দেখিলে বোধ হয় যেন আকাশ হইতে নক্ষত্র খসিয়া পড়িতেছে। বাস্তবিক নক্ষত্র এক একটী সূর্য্যের ন্যায় বৃহৎ; উল্কাগুলি প্রস্তরখণ্ডের ন্যায় ক্ষুদ্র। প্রতি মুহূর্ত্তে বহুসংখ্যক উল্কা পৃথিবীতে পড়িতেছে।

উল্কা।

গ্রহ সকলের আহ্নিক ও বার্ষিক গতি।

একটী প্রদীপে গোল বস্তুর সকল ভাগ একবারে আলোকিত হইতে পারে না। প্রদীপের সম্মুখে একটী গোলা ধরিলে দেখিতে পাইবে, গোলার যে ভাগ প্রদীপের দিকে সেই ভাগই মাত্র আলোকিত হইয়াছে, অপর ভাগ অন্ধকারে ঢাকা রহিয়াছে। গোলাটী ঘুরাইলে উহার যে ভাগ আলোকিত ছিল, তাহা ক্রমে আঁধারে পড়িবে, এবং যে

ভাগ আঁধারে ছিল তাহা আলোকিত হইবে। আবার পূর্ব্বের ভাগ ঘুরিয়া আলোকে আসিবে। পূর্ব্বে বলিয়াছি, গ্রহসকল সূর্য্যের আলোকে আলোকিত হয় এবং উহারা সূর্য্যকে

দিন, রাত্রি ও বৎসর।

প্রদক্ষিণ করে। সকল গ্রহই গোলাকার। সুতরাং সূর্য্যের আলোকে কোন গ্রহের সর্ব্বাংশ একবারে আলোকিত হইতে পারে না। গ্রহসকল যদি সর্ব্বদা একভাগ সূর্য্যের দিকে রাখিয়া প্রদক্ষিণ করিত, তাহা হইলে যে ভাগ সূর্য্যের দিকে, সেই ভাগই চিরকাল আলোকিত ও অপর ভাগ সর্ব্বদা অন্ধকারে থাকিত। কিন্তু গ্রহসকল লাটিমের মত অথবা গাড়ীর চাকার মত ঘুরিতে ঘুরিতে অগ্রসর হয়। এইজন্য প্রত্যেক ভাগ পর্য্যায়ক্রমে আলোক এবং অন্ধকারে আসিতেছে। যখন যে ভাগ আলোকে থাকে, সেই ভাগে **দিন** ও অপর ভাগে **রাত্রি** হয়।

দিন ও রাত্রি।

সুবিধার জন্য পণ্ডিতেরা গ্রহসকলের ভিতর দিয়া দুই প্রান্ত পর্য্যন্ত বিস্তৃত একটী শলাকা কল্পনা করিয়াছেন; উহাকে অক্ষ বা **মেরুদণ্ড** (axis) কহে। মেরুদণ্ডের দুই প্রান্তকে **মেরু** (pole) বলে। গাড়ীর চাকা অথবা নাটাই যেমন শলার চারিদিকে

ঘুরে, গ্রহসকলও তেমনি আপন আপন কাল্পনিক মেরুদণ্ডের চারিদিকে ঘুরে। এই ঘূর্ণন বা আবর্ত্তনকেই আহ্নিক বা দৈনিক গতি বলে। কারণ, এই গতির জন্যই দিন-রাত্রি হয়। যে গ্রহ যত দ্রুত ঘুরে সেই গ্রহের দিন-রাত্রি তত তাড়াতাড়ি হয়। গ্রহসকল স্বীয় মেরুদণ্ডের চারিদিকে আবর্ত্তন (rotation) করিতে করিতে নির্দ্দিষ্ট সময়ে সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করে। সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিতে যে গ্রহের যত সময় লাগে তাহাকে সেই গ্রহের বৎসর কহে। এবং যে গতিতে সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করে, উহাকে বার্ষিক গতি কহে। সকল গ্রহের বৎসর সমান নহে।

সৌর-জগতের উৎপত্তি।

এখন সৌর-জগতের উৎপত্তি সম্বন্ধে দুই একটী কথা বলা আবশ্যক। জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ অনুমান করেন, পূর্ব্বে সমগ্র সৌর-জগতের জ্যোতিষ্ক-সমূহ একটী অত্যুত্তপ্ত প্রকাণ্ড বাষ্পপিণ্ড ছিল। উহা শূন্যে আপন মেরুদণ্ডের চারিদিকে ঘুরিত। ঐ বাষ্পপিণ্ড যতই শীতল হইতে লাগিল ততই উহার আয়তন ক্ষুদ্র হইতে লাগিল। তখন উহা অধিকতর দ্রুত গতিতে ঘুরিতে আরম্ভ করিল। এইরূপ সকল ঘূর্ণায়মান পদার্থেরই কেন্দ্র হইতে বাহিরের দিকে একটী গতি উৎপন্ন হয়। উহাকে কেন্দ্রাপসারিণী (Centrifugal force) কহে। এই গতির প্রভাবে পূর্ব্বোক্ত কোমল বিরাট্ বাষ্পপিণ্ড হইতে বাষ্পরাশি উৎক্ষিপ্ত হইয়া কতকগুলি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র বাষ্পপিণ্ডে পরিণত হইয়াছিল। এই সকল পিণ্ডও মাধ্যাকর্ষণের প্রভাবে আপন আপন মেরুদণ্ডের চারিদিকে ঘুরিতে ঘুরিতে পূর্ব্বোক্ত গোলকটিকে প্রদক্ষিণ করিতে লাগিল। ঐ সকল ক্ষুদ্র বাষ্পপিণ্ডই কালে আমাদের বুধ, শুক্র, পৃথিবী ইত্যাদি গ্রহে পরিণত হইয়াছে। গ্রহ হইতে আবার

পূর্ব্বোক্ত প্রকারে উপগ্রহের উৎপত্তি হইল। এই রূপেই সৌর-জগতের সকল জ্যোতিষ্কের উৎপত্তি হইয়াছে।

আবার যে পদার্থ যত বড়, সেই পদার্থ উত্তপ্ত হইলে, শীতল হইতে তত অধিক সময় লাগে। এক চামচ্ গরম জল এক বাটি জলের পূর্ব্বে শীতল হইয়া যায়, আবার এক বাটি জল, এক কলসী জলের আগে ঠাণ্ডা হয়। বুধ, শুক্র, পৃথিবী ইত্যাদি গ্রহ একবারে শীতল হইয়া গিয়াছে। চন্দ্রের আগ্নেয়গিরিগুলি পর্য্যন্ত নির্ব্বাপিত হইয়াছে। কিন্তু বৃহস্পতি, শনি, ইউরেনাস্ এবং নেপ্চুন গ্রহ অতিশয় বৃহৎ, এইজন্য উহারা এখনও খুব উত্তপ্ত রহিয়াছে।

সূর্য্য।

পৃথিবীর প্রায় সকল প্রাচীন জাতিই এক সময়ে সূর্য্যের উপাসক ছিল; সূর্য্যকে দেবতা ভাবিয়া পূজা করিত। আর্য্য ঋষিরা সূর্য্যকে দেবতাদিগের মধ্যে অতি উচ্চস্থান দিয়াছিলেন। সূর্য্যের গুণ কীর্ত্তন করিয়া তাঁহারা অনেক স্তবস্তুতি রচনা করিয়া গিয়াছেন।

সূর্য্য মানুষের কত উপকার সাধন করিতেছে, তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। সূর্য্যের উত্তাপে জল বাষ্প হইয়া আকাশে উঠে। বাষ্প হইতে মেঘ হয়। মেঘ হইতে বৃষ্টিপাত হইয়া ধরাকে শস্যশালিনী করিতেছে এবং শুষ্ক নদনদী সকলকে পরিপূর্ণ করিয়া দিতেছে। ঋতুর পরিবর্ত্তন সূর্য্যের উত্তাপের উপর নির্ভর করে। সূর্য্যোত্তাপে পৃথিবী উষ্ণ হইলে বায়ু সঞ্চারিত হয়। সূর্য্যের আলোক ও উত্তাপ ভিন্ন কোন প্রাণীই জীবিত থাকিতে পারিত না। সূর্য্য, পৃথিবী ও অপরাপর

গ্রহ ও উপগ্রহ প্রভৃতিকে স্বীয় আকর্ষণ বলে ধরিয়া রাখিয়াছে। এইরূপ উপকারী সূর্য্যকে হিন্দুরা পূজা করিতেন, ইহাতে আশ্চর্য্যের বিষয় কিছুই নাই।

সূর্য্যের দূরত্ব, আয়তন ও ভার।

সূর্য্য, পৃথিবী হইতে প্রায় ৯২৯৬০০০০ নয় কোটি উনত্রিশ লক্ষ ষাটিহাজার মাইল দূরে অবস্থিত। পৃথিবী হইতে সূর্য্য পর্য্যন্ত যদি রেলের লাইন থাকিত এবং ঘণ্টায় ৬০ মাইল চলিতে পারে এরূপ দ্রুতগামী একখানি গাড়ীতে আরোহণ করিয়া যদি আমরা সূর্য্যের দিকে অনবরত অগ্রসর হইতাম, তাহা হইলেও সূর্য্যে পৌঁছিতে আমাদের প্রায় ২৭৬ বৎসর লাগিত।

সূর্য্য পৃথিবী অপেক্ষা প্রায় তেরলক্ষ গুণ বড়, অর্থাৎ প্রায় তেরলক্ষ পৃথিবী একত্র করিলে সূর্য্যের সমান হইবে। সূর্য্যের ব্যাস প্রায় ৮৬৬০০০ মাইল। যদি একখানি ডাকগাড়ী ঘণ্টায় ৬০ মাইল বেগে অনবরত চলিতে থাকে, তাহা হইলে সূর্য্যের পরিধিটা একবার প্রদক্ষিণ করিয়া আসিতে উহার পাঁচ বৎসরের কম লাগিবে না। সূর্য্যের আয়তন সৌর জগতের সমগ্র গ্রহের আয়তনসমষ্টির অপেক্ষাও প্রায় ৬০০ শত গুণ বড়। যদি সূর্য্যমণ্ডলের অভ্যন্তর ভাগ খনন করিয়া শূন্য করা যাইত এবং আমাদের পৃথিবীকে উহার কেন্দ্রস্থানে রাখা হইত, তাহা হইলেও পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে এত স্থান থাকিত যে, চন্দ্র এখন পৃথিবী হইতে যত দূরে অবস্থিত আছে (২৪০০০০ মাইল) তাহার অপেক্ষা ১৬২০০০ মাইল অধিক দূরে স্থাপিত হইলেও অনায়াসে চন্দ্র সূর্য্যের গর্ভের মধ্যে থাকিয়াই পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করিতে পারিত।

সূর্য্য পৃথিবী হইতে যত বড়, তত গুরুভার নহে। অর্থাৎ আয়তনের তুলনায় সূর্য্যের ওজন খুব কম। সূর্য্য প্রায় ১৩ তের লক্ষ পৃথিবীর সমান বড়, কিন্তু ১৩ তের লক্ষ পৃথিবীর সমান ভারী নহে। পৃথিবী হইতে

মাত্র ৩ তিন লক্ষ গুণ অধিক ভারী। ইহা হইতে পণ্ডিতেরা অনুমান করিয়াছেন, সূর্য্য পৃথিবীর ন্যায় কঠিন নহে, উহা বাষ্পপিণ্ড মাত্র।

আমরা সূর্য্যের যে উজ্জ্বল গোলাকার অংশ প্রত্যহ দেখিতে পাই, উহাকে আলোক-মণ্ডল বলে। এই আলোক-মণ্ডল হইতেই আমরা প্রধানতঃ আলোক ও উত্তাপ প্রাপ্ত হইয়া থাকি। সূর্য্যের আলোকেই সৌর-জগতের সকল জ্যোতিষ্ক আলোকিত হয়, অন্য কোনও জ্যোতিষ্কের নিজের আলোক নাই। সূর্য্যের উত্তাপ অতীব ভয়ানক। ২ বর্গফুট পরিমিত (২ ফুট দীর্ঘ ও ২ ফুট প্রস্থ) স্থানে যে পরিমাণ সূর্য্য-কিরণ পতিত হয়, তাহা সংগ্রহ করিতে পারিলে, এক মিনিটে লৌহ প্রভৃতি ধাতুকে গলাইতে পারা যাইত। সূর্য্যের যে উত্তাপ পৃথিবী প্রাপ্ত হইয়া থাকে, তাহা সূর্য্য-বিকীর্ণ তাপের ২০০,০০০০০০০ দুইশত কোটি ভাগের এক ভাগ মাত্র। কেহ বলেন আলোক মণ্ডল বাষ্পময়, কেহ বলেন কঠিন, আবার কাহারও মতে একবারে বাষ্পময়ও নয়, আবার কঠিনও নয়, এই দুইএর মধ্যবর্ত্তী। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আমরা সূর্য্যের যে উজ্জ্বল গোলাকার অংশ দেখি উহাই আলোক-মণ্ডল এবং উহাই আলোক ও তাপের আধার।

আলোক-মণ্ডল (Photosphere)

সূর্য্যের আলোক-মণ্ডলটী আবার একটী উজ্জ্বল বাষ্পাবরণে আচ্ছাদিত। এই বাষ্পাবরণকে বর্ণ-মণ্ডল কহে। এই বর্ণ-মণ্ডল নানাপ্রকার ধাতুর বাষ্পের সমষ্টি মাত্র। এই সকল বাষ্প খালি চক্ষে দৃষ্টিগোচর হয় না। এই আবরণ না থাকিলে আমরা এখনকার অপেক্ষা অধিক পরিমাণে আলোক ও উত্তাপ পাইতাম। বর্ণ-মণ্ডল ভেদ করিয়া আসিবার সময় অনেক সূর্য্য-রশ্মি ইহাতে লীন হইয়া যায়।

বর্ণ-মণ্ডল (Chromosphere)

বর্ণ-মণ্ডলের স্থূলতা ৩০০০ হাজার মাইল হইতে ৮০০০ হাজার মাইলের মধ্যে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এই জ্বলন্ত বাষ্পাবরণের উপরিভাগে সর্ব্বদা প্রবল ঝড় বহিতেছে। আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের সময় দশ পনর মাইল স্থান পর্য্যন্ত ভস্ম ও ধাতব নিঃস্রবে আচ্ছাদিত হইয়া যায়; আর আগ্ন্যুৎপাত কালীন গর্জ্জনে ২০।২৫ মাইল দূরবর্ত্তী স্থানের লোক অস্থির হইয়া উঠে। কিন্তু সূর্য্য-মণ্ডলের ঝটিকার তুলনায় আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতও অতি অকিঞ্চিৎকর ব্যাপার। পৃথিবীর পৃষ্ঠে যে ঝড় হয়, তাহার গতি ঘণ্টায় একশত মাইলের অধিক নয়; কিন্তু সূর্য্য-মণ্ডলের বাতাবর্ত্তের গতি প্রতি সেকেণ্ডে একশত মাইলেরও অধিক।

সৌর-শিখা।
(Solar prominences)

বর্ণ-মণ্ডল হইতে জ্বলন্ত বাষ্পীয় পদার্থ-সমূহ প্রচণ্ডবেগে সর্ব্বদা উৎক্ষিপ্ত হইতেছে। উহাদের গর্জ্জন সহস্রাধিক বজ্র-পতন-ধ্বনি অপেক্ষাও ভীষণ। ঐসকল অনল-শিখার উচ্চতার তুলনায় হিমালয়

সৌর-শিখা।

পর্ব্বতও অতি ক্ষুদ্র বোধ হইবে। সেই সকল অগ্নি-শিখা এমনি বেগে ছুটিয়া বাহির হয় যে, তাঁহার গতির সহিত অন্য কিছুর গতিরই তুলনা হইতে পারে না। আমরা অসামান্য গতির দৃষ্টান্ত দিতে হইলেই ডাক-গাড়ী অথবা কামানের গোলার কথা বলিয়া থাকি। ডাক-গাড়ী মিনিটে দুই মাইল এবং কামানের গোলা দশ এগার মাইলের অধিক যাইতে পারে না। কিন্তু বর্ণ-মণ্ডল হইতে জ্বলন্ত বাষ্পরাশি সেকেণ্ডে পাঁচশত মাইল গতিতে ঊর্দ্ধে উত্থিত হইয়া থাকে।

১৮৮০ খৃষ্টাব্দে ৭ই অক্টোবর বেলা সাড়ে দশ ঘটিকার সময় অধ্যাপক ইয়ং (Young) একটী সৌর-শিখা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন; উহা প্রথমে ৪০ হাজার মাইল উচ্চ হইয়াছিল। ঐ শিখা দেখিতে দেখিতে দ্বিগুণ উচ্চ হইল। ক্রমে উচ্চ হইতে হইতে উহা ৩ লক্ষ ৫০ হাজার মাইল ঊর্দ্ধে উঠিল। অবশেষে বেলা সাড়ে বারটার সময় ঐ শিখা বহুখণ্ডে বিভক্ত হইয়া একেবারে তিরোহিত হইয়া গেল। ট্রোভেলট্ (Trouvelet) নামক আর একজন জ্যোতির্ব্বেত্তা ১৮৭২ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে একটী সৌর-শিখা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, উহা ১ লক্ষ মাইল উচ্চে উঠিয়াছিল।

খালি চক্ষে দেখিলে সূর্য্য-মণ্ডলের সকল স্থান সর্ব্বদা সমান উজ্জ্বল দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু দূরবীক্ষণ দ্বারা দেখিলে সূর্য্যের গায় প্রায়ই কাল কাল দাগ দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। ঐ কাল দাগকে সৌর-কেতু বা সৌর-কলঙ্ক বলে। এমন বৎসর যায় না, যে বৎসর একটী না একটী কেতুর উদয় না হয়। সৌর-কেতু মধ্যে মধ্যে এমন বৃহৎ হয় যে তাহা খালি চক্ষেই প্রত্যক্ষ করা যায়। একখণ্ড কাচে প্রদীপের কালি মাখাইয়া চক্ষের সম্মুখে ধরিলে সূর্য্যোত্তাপে চক্ষের অনিষ্ট হইবার আর

সৌর-কেতু।
(Sunspot)

আশঙ্কা থাকে না। এই প্রণালীতে আমাদের দেশের লোক বহুকাল হইতে গ্রহণ দেখিয়া আসিতেছে।
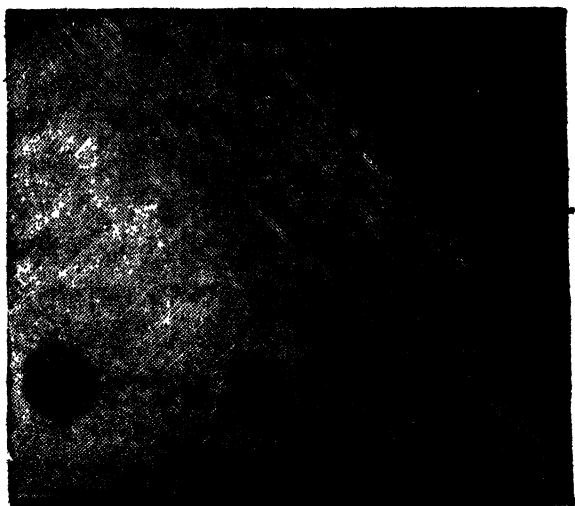
সৌর-কেতু।

সৌর-কেতুর পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমে একটী নিয়মিত গতি আছে। সচরাচর সৌর-কেতু সূর্য্যের পূর্ব্বপ্রান্তে উদিত হইয়া ক্রমে সরিতে সরিতে প্রায় ১৩ দিনে সূর্য্যের পশ্চিম প্রান্তে গিয়া অদৃশ্য হইয়া যায়। যদি ইহা সূর্য্যে মিশিয়া না যায়, তাহাহইলে ১৩ দিন পর পুনরায় পূর্ব্ব প্রান্তে উদিত হয়। ইহা হইতে জ্যোতির্ব্বেত্তাগণ অনুমান করেন, সৌর-কেতুর নিজের কোন গতি নাই। পৃথিবী যেমন ২৪ ঘণ্টায় একবার আপন মেরুদণ্ডে আবর্ত্তন (rotation) করে সূর্য্যও তেমনি আমাদের ২৫ দিন ৮ ঘণ্টায় একবার স্বীয় মেরুদণ্ডের চারিদিকে আবর্ত্তন করিয়া থাকে। অর্থাৎ পৃথিবীর ২৫ দিনে সূর্য্যের একদিন

হয়। গ্যালিলিও সর্ব্বপ্রথম সৌর-কেতু আবিষ্কার করেন এবং ইহাদের গতি লক্ষ্য করিয়া সূর্য্যের আবর্ত্তনের সময় নির্দ্ধারণ করেন।

খালি চক্ষে সৌর-কেতুকে একটী কাল দাগের মত দেখা যায়। কিন্তু উৎকৃষ্ট দুরবীক্ষণ দ্বারা দেখিলে কেতুর ভিন্ন ভিন্ন অংশ দেখিতে পারা যায়। কেতুর মধ্যভাগে একটী গহ্বর হয়, ইহাকে কেতু-গর্ভ (neucleus) বলা যাইতে পারে। কেতু-গর্ভের চারিদিকে ঘন কৃষ্ণ ছায়া (umbra) উহাকে ঘেরিয়া রহিয়াছে ; তাহার পরের অংশটী অপেক্ষাকৃত লঘু কৃষ্ণ ছায়া দ্বারা পরিবেষ্টিত। উহাকে উপ-ছায়া (penumbra) কহে। কেতুর আকার ও গঠন সর্ব্বদা একরূপ থাকে না। এক সময়ে দুই বা ততধিক কেতু সৌরমণ্ডলে প্রকাশ পায়। কখন কখন একটী কেতুই ভাঙ্গিয়া দুই তিনটী স্বতন্ত্র কেতুতে পরিণত হয়।

সৌর-কেতুর সংখ্যা এগার বৎসর অন্তর অত্যন্ত বৃদ্ধি পায়। তখন সূর্য্য-মণ্ডলে ঝটিকার প্রকোপ প্রবল হয়। আমরা পৃথিবীতে থাকিয়াও সেই সৌর-উৎপাতের অসুবিধা ভোগ করিয়া থাকি। ভূপৃষ্ঠেও সে সময় প্রবল ঝড় বহিতে থাকে এবং তাড়িত-চালিত যন্ত্রাদি উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠে।

সৌর-কেতুর প্রকৃতি সম্বন্ধে পণ্ডিতেরা প্রায় এক শতাব্দীকাল অনেক তর্কবিতর্ক করিয়াছেন কিন্তু আজ পর্য্যন্তও কেহ কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন নাই। তবে ফরাসী জ্যোতির্ব্বিদ ফায়ের (M. Faye) মতই অনেকে গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি বলেন, প্রচণ্ড উত্তাপে সূর্য্যের অভ্যন্তর হইতে নানা প্রকার ধাতব বাষ্প ঊর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত হইয়া থাকে। ঐ উর্দ্ধোত্থিত বাষ্পরাশি অপেক্ষাকৃত শীতল হইয়া বৃষ্টিরূপে আলোক-মণ্ডলে পতিত হয় এবং পুনরায় উত্তপ্ত হইয়া পূর্ব্বের ন্যায় উপরে উঠিতে থাকে। সূর্য্যে অনবরত এই কার্য্য চলি-

তেছে। এই প্রকার গতি সৌরমণ্ডলের সর্ব্বত্র সমান নহে, সেই জন্য মধ্যে মধ্যে সূর্য্যের ভয়ানক বাতাবর্ত্ত বা ঘূর্ণ বায়ু দেখা দেয়। এই ঝটিকা প্রভাবে সূর্য্যের বর্ণমণ্ডলের উপরিস্থ জল-জান বাষ্পরাশি নিম্নে আলোক-মণ্ডলের উপর নিক্ষিপ্ত হয়। শীতল বাষ্পরাশি যে যে স্থানে পতিত হয়, সেই সেই স্থানের আলোক অদৃশ্য হইয়া সূর্য্যের গাত্রে কলঙ্ক উৎপন্ন করে। নদীর আবর্ত্তের মধ্যস্থলে যেমন গহ্বর, সূর্য্যের মধ্যস্থলেও সেইরূপ গহ্বর হইয়া থাকে। এক একটা গহ্বর এত বৃহৎ হয় যে, আমাদের পৃথিবীটা ইহার ভিতর নিক্ষেপ করিলেও উহা পূর্ণ হইবে না।

ছটা-মুকুট।

সূর্য্যের পূর্ণ গ্রহণ কালে একটী আশ্চর্য্য ব্যাপার দৃষ্টিগোচর হয়। [illegible]-গ্রহণের সময় পৃথিবী ও সূর্য্যের মধ্যে চন্দ্র অবস্থান করে এবং চন্দ্র

দ্বারাই সূর্য্য ঢাকা পড়ে। গ্রহণের সময় দূরবীক্ষণ সাহায্যে দেখিলে স্পষ্ট দেখা যাইবে, কতকগুলি অতি সুদীর্ঘ উজ্জ্বল অনল ছটা সম্মুখস্থ চন্দ্রের কৃষ্ণবর্ণ ভাগের চারিদিকে মুকুটের ন্যায় শোভা পাইতেছে। পূর্ব্বে বলিয়াছি বর্ণ-মণ্ডল একটী জ্বলন্ত বাষ্পাবরণ মাত্র। ঐ বাষ্পাবরণের সর্ব্বোপরিস্থ স্তরের উপাদান জল-জান বাষ্প এবং নিম্নস্তর নানা প্রকার ধাতব বাষ্পময়। বর্ণ-মণ্ডলের বহির্ভাগ হইতে উৎক্ষিপ্ত অতি লঘু বাষ্প রাশিই গ্রহণের সময় মুকুটরূপে শোভা পায়। তাহাকেই ছটা-মুকুট বা (corona) বলে। কিন্তু এই বাষ্পের প্রকৃতি আজও নির্দ্ধারিত হয় নাই।

ছটা-মুকুট।

এখন সূর্য্য-মণ্ডলের গঠন প্রণালীর আমরা আভাস পাইলাম। প্রথমেই ছটা-মুকুট (corona) তারপর বর্ণ-মণ্ডল (chromosphere), তন্নিম্নে আলোক-মণ্ডল (photosphere); আলোক-মণ্ডলের নীচের অংশের অর্থাৎ সূর্য্যের অভ্যন্তরের বিশেষ বিবরণ আমরা অবগত নহি। তবে সূর্য্য-মণ্ডলের অভ্যন্তর দেশ যে উত্তপ্ত বাষ্পময়, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। এক সময়ে হর্শেল মত প্রকাশ করিয়াছিলেন যে সূর্য্যের সর্ব্বোপরিস্থ উজ্জ্বল মেঘস্তরের (অর্থাৎ আলোক-মণ্ডলের) নিম্নে আর একটী মেঘ-মণ্ডল আছে, উহা অতিশয় শীতল। ঐ শীতল আবরণের নিম্নে মানুষের মত বুদ্ধিমান জীবের বাস। আর আলোক-মণ্ডলে যখন সৌর-কেতুরূপ গহ্বর উৎপন্ন হয় তখন ঐ সকল জীব তন্মধ্য দিয়া সূর্য্যের বহির্ভাগ দেখিতে পায়। এই মত অনেক দিন পূর্ব্বেই পরিত্যক্ত হইয়াছে।

সূর্য্যের আলোক দেখিতে উজ্জ্বল শ্বেতবর্ণ। কিন্তু উহা বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে, সূর্য্যরশ্মি প্রধানতঃ সাতটী বর্ণের সমষ্টি মাত্র। আকাশে যখন রাম-ধনুর উদয় হয়, তখন সূর্য্য-রশ্মির সপ্তবর্ণ দৃষ্টি-

গোচর হইয়া থাকে। বৃষ্টিকালীন জলবিন্দুসমূহে সূর্য্য-কিরণ পতিত হইলে ঐ কিরণ বিশ্লিষ্ট হয়। তিন পল বিশিষ্ট কাচের মধ্য দিয়া সূর্য্যরশ্মি আসিলেও উহার সাতটী রঙ্ পৃথক হইয়া পড়ে এবং তখনও রামধনুর ন্যায় বর্ণ বৈচিত্র্য দেখিতে পাওয়া যায়। কেবল সূর্য্যের আলোকই যে এইরূপ হয় তাহা নহে, যে কোন আলোক এইরূপে বিশ্লিষ্ট করা যায়। বর্ণ-বীক্ষণ-যন্ত্র দ্বারা পরীক্ষা করিয়া পণ্ডিতেরা নির্দ্ধারণ করিয়াছেন যে, সূর্য্যের আলোক নানাপ্রকার ধাতব বাষ্প হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। সূর্য্যে জলজান, অঙ্গারক, দস্তা, তাম্র, সীস টিন, রৌপ্য, কেল্‌সিয়াম্, সোডিয়াম্, নিকেল্, মেগ্নেসিয়াম্, কোবল্ট, এলিউমিনিয়াম, পটাসিয়াম্ প্রভৃতি বিদ্যমান আছে। কিন্তু এ পর্য্যন্ত সূর্য্যমণ্ডলে স্বর্ণ, নাইট্রোজান, গন্ধক, ফস্‌ফরাস্ ও পারদের অস্তিত্ব প্রমাণিত হয় নাই।

বুধ, মঙ্গল ও পৃথিবী আদি গ্রহরাজি সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিতেছে, ইহা তোমরা জানিয়াছ। কিন্তু সূর্য্যও নিশ্চল নহে। গ্রহ-উপগ্রহ পরিবৃত সূর্য্য সমস্ত সৌর-জগৎটা সঙ্গে লইয়া প্রতি ঘণ্টায় কুড়ি-হাজার মাইল বেগে লিরা বা বীণা (Lyra) নামক নক্ষত্রমণ্ডলীর একটী নক্ষত্রাভিমুখে প্রধাবিত হইতেছে। তোমরা মনে করিতে পার, সূর্য্য আমাদের পৃথিবী এবং অন্যান্য গ্রহাদি লইয়া প্রচণ্ডবেগে ছুটিতে ছুটিতে হয়ত একদিন কোন নক্ষত্রে গিয়া পড়িবে। তখন ভয়ানক একটা সংঘর্ষ হইয়া সকলই ধ্বংস হইয়া যাইবে। কিন্তু শীঘ্র সেরূপ আশঙ্কার কোন কারণ নাই। সেই বীণা (Lyra) নক্ষত্রমণ্ডলী এবং অপরাপর তারকাগণ এখনও এত দূরে রহিয়াছে যে, দশ সহস্র বৎসর পরেও সূর্য্য যে স্থান পরিবর্ত্তন করিতেছে তাহা অপরাপর নক্ষত্রের তুলনায় খালি চক্ষে দেখিয়া বুঝা যাইবে না।

সূর্য্যের গতি।

গ্রহরাজি যেমন সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করে, সূর্য্যও বোধ হয় তেমনি এক মহাসূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিবার জন্ত ভীম গতিতে ছুটিতেছে। সেই মহাসূর্য্য আজ পর্য্যন্তও জ্যোতির্ব্বিদ্‌দিগের অপরিজ্ঞাত। হয় তো কালে উহা ধরা পড়িবে।

পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ হেতু সকল পদার্থই ভারী বোধ হয়। পৃথিবীর ন্যায় সূর্য্যেরও মাধ্যাকর্ষণ আছে। সূর্য্যের জিনিস (mass) পৃথিবীর জিনিস হইতে অধিক, এইজন্য সূর্য্যের আকর্ষণও সেই অনুপাতে অধিক। ভূপৃষ্ঠে যে পদার্থ ১ সের ভারী, সূর্য্যমণ্ডলে লইয়া গেলে সেই পদার্থ ২৭ সের ভারী হইবে।

চন্দ্র।

শৈশব হইতে চন্দ্রের সহিত আমাদের পরিচয়। ছেলেবেলা মায়ের কোল হইতে "আয় আয়" বলিয়া চাঁদকে কত ডাকিয়াছি! সন্ধ্যা হইতেই চাঁদ দেখিবার জন্য কত ব্যাকুল হইয়াছি। চাঁদের কত গল্প, কত কাহিনী আজও মনে গাঁথা রহিয়াছে।

পণ্ডিতেরা দূরবীক্ষণ দিয়া পরীক্ষা করিয়া চন্দ্র-মণ্ডলের যে সকল আশ্চর্য্য তথ্য আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহা আরব্য উপন্যাসের গল্পের ন্যায় কৌতূহলজনক।

চন্দ্রের সুন্দর সুন্দর "ফটোগ্রাফের" চিত্র তোলা হইয়াছে। চন্দ্রের যে মানচিত্র প্রস্তুত হইয়াছে, তাহা আমাদের আফ্রিকার মানচিত্রের তুলনায় খুব নিকৃষ্ট বোধ হইবে না। চন্দ্রের মানচিত্রে আমাদের ক্ষুদ্র গ্রামগুলির মত স্থানও নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

চন্দ্র পৃথিবীর একটী গ্রহ। যে সকল জ্যোতিষ্ক গ্রহের চারিদিকে ঘুরে, উহাদিগকে 'চন্দ্র' বা উপগ্রহ কহে। আমাদের চন্দ্র পৃথিবীর উপগ্রহ। অনেকের ধারণা আমাদের পৃথিবীরই কেবল চন্দ্র আছে, আর কোন গ্রহের চন্দ্র নাই। বাস্তবিক তাহা নয়। সৌর-জগতের অনেক গ্রহেরই চন্দ্র আছে। চন্দ্র সম্বন্ধে বরং আমাদের পৃথিবীই দরিদ্র। পৃথিবীর একটী চন্দ্র, মঙ্গলের দুইটী, বৃহস্পতির পাঁচটী, শনির আটটী, ইউরেনাশের চারিটী এবং নেপচুনের একটী। সাধারণের পরিচিত গ্রহের মধ্যে কেবল বুধ ও শুক্রের চন্দ্র নাই।

আকাশে কত চন্দ্র আছে।
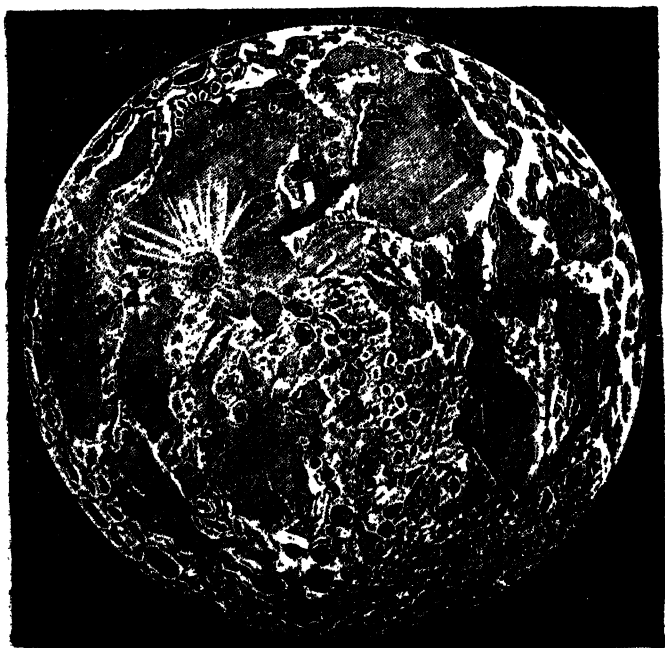
পূর্ণচন্দ্র।

গ্রহগুলি পশ্চিম হইতে পূর্ব্বদিকে ভ্রমণ করিয়া সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করে। উপগ্রহ বা চন্দ্রের গতিও ঐ প্রকার; কেবল ইউরেনাস ও নেপচুনের চন্দ্র পূর্ব্বদিক হইতে পশ্চিম দিকে গমন করিয়া সূর্য্য প্রদক্ষিণ করে।

চন্দ্রের আয়তন, ওজন ও দূরত্ব।

আমরা এই প্রবন্ধে কেবল পৃথিবীর চন্দ্রের কথা বলিব। খালি চক্ষে দেখিলে চন্দ্রকে সূর্য্যের ন্যায়ই বড় দেখায়। বাস্তবিক চন্দ্র পৃথিবী হইতেও অনেক ক্ষুদ্র। প্রায় পঞ্চাশটী চন্দ্র একত্র করিলে আমাদের পৃথিবীর সমান হইবে। চন্দ্রের ব্যাস প্রায় ২১৬০ দুই হাজার একশত ষাটি মাইল। কিন্তু আয়তনের তুলনায় চন্দ্রের ওজন খুব কম। আশীটী চন্দ্র একত্র করিলে পৃথিবীর ওজনের সমান হইবে। অতএব চন্দ্রের উপাদান পৃথিবীর উপাদান হইতে অনেক হাল্‌কা। *
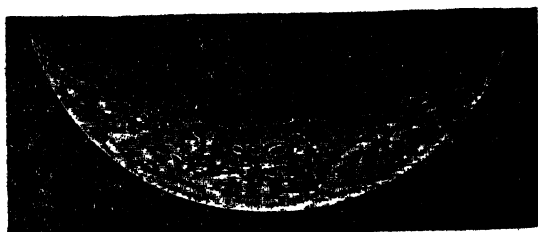
চন্দ্র-কলা।

চন্দ্র ২৪০০০০ দুই লক্ষ চল্লিশ হাজার মাইল দূরে থাকিয়া পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করিতেছে। পূর্ণিমার রাত্রে চন্দ্র ঠিক গোলাকার হয়।

* চন্দ্রের ঘনত্ব সর্ব্বত্র সমান নহে। এইজন্য চন্দ্র-মণ্ডলের কেন্দ্র ও উহার ভার-কেন্দ্র এক নহে। এই দুই কেন্দ্রের দূরত্ব প্রায় ৩৩$\frac{১}{৪}$ মাইল। চন্দ্রের ভার-কেন্দ্র হইতে চন্দ্র-মণ্ডলের কেন্দ্র পৃথিবীর অধিকতর নিকটবর্ত্তী।

পূর্ণিমার পর চাঁদ ক্রমে ক্রমে ক্ষয় পায়। চৌদ্দ পনর দিন পর আর কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না। তখন অমাবস্যা। অমাবস্যার পর চাঁদ আবার বাড়িতে থাকে। বাড়িতে বাড়িতে আবার চৌদ্দ পনর দিন পর পূর্ণ হয়। একদিনে চন্দ্রের যতটুকু অংশ বাড়ে বা কমে সেই অংশকে 'কলা' কহে।

চন্দ্র-কলা।

চন্দ্রের নিজের আলোক নাই। চন্দ্রের উপর সূর্য্যের আলোক পতিত হয় বলিয়া উহাকে উজ্জ্বল দেখায়। পৃথিবী দিনের বেলায় যেরূপ আলোকিত হয়, চন্দ্রও ঐরূপ আলোকিত হয়। আমাদের দেশের হিন্দু পণ্ডিতেরা অতি প্রাচীন কালেই এই তথ্যটী আবিষ্কার করিয়াছিলেন।

সুপ্রসিদ্ধ জ্যোতির্ব্বিদ্ পণ্ডিত ভাস্করাচার্য্য লিখিয়াছেন, "চন্দ্রের কোন তেজ নাই, চন্দ্রের যে অংশ সূর্য্যের দিকে থাকে সেই অংশ সূর্য্য-কিরণ প্রতিফলিত হইয়া প্রকাশ পায়। অপর অংশে সূর্য্য-কিরণ প্রতিফলিত না হওয়াতে শ্যামল থাকে। যেমন রৌদ্রে একটী ঘট রাখিলে তাহার এক অংশই প্রকাশিত হয় অপর অংশ তাহার নিজের ছায়াতে অপ্রকাশিত থাকে, এই স্থলেও সেইরূপ হয়।" যে দিন চন্দ্রের অর্দ্ধ ভাগে অর্থাৎ যে ভাগ আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় সেই ভাগে সূর্য্যকিরণ পতিত না হয়, সেই দিন আমরা চন্দ্র দেখিতে পাই না। ইহারই নাম অমাবস্যা। চন্দ্র ও সূর্য্য এক রাশিস্থ অর্থাৎ সম-সূত্রে অবস্থিত হইলে এইরূপ ঘটিয়া থাকে।

চন্দ্রের নিজের আলোক নাই।

চন্দ্রে লোক থাকিলে আমাদের দিনের বেলায় যখন পৃথিবী আলোকিত হয় তখন তাহারা পৃথিবীকে চাঁদের মত দেখে। আমাদের চাঁদের যেমন হ্রাস-বৃদ্ধি

চাঁদের চাঁদ।

হয়, চাঁদের লোকও তাহাদের চাঁদের অর্থাৎ আমাদের পৃথিবীর হ্রাস-বৃদ্ধি দেখিতে পাইবে।

আমাদের চন্দ্রের উদয় অস্ত আছে। কিন্তু চন্দ্রের চাঁদের উদয় অস্ত নাই। চাঁদের লোক তাহাদের চাঁদকে একস্থানেই দেখিতে পাইবে। তাহাদের চাঁদ একস্থানে দুলিতে দুলিতে ধীরে ধীরে অদৃশ্য হয়, আবার ক্রমে বড় হইয়া পূর্ণ হয়। পৃথিবী হইতে সূর্য্যকে যত বড় দেখা যায়, অমাবস্যার দিন পৃথিবীকে চন্দ্র হইতে উহার ১৫ গুণ বড় চন্দ্রের ন্যায় দৃষ্টিগোচর হইবে। কিন্তু পূর্ণিমার দিন চন্দ্র হইতে পৃথিবীকে দেখা যাইবে না।

গ্রহদিগের ন্যায় চন্দ্রেরও আহ্নিক গতি আছে। অর্থাৎ চন্দ্রও নিজ কল্পিত মেরুদণ্ডের চারিদিকে ঘুরিয়া পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করিতেছে। চন্দ্র ২৭ দিন, ৭ ঘণ্টা, ৪৩ মিনিটে আপন মেরুদণ্ডের চারিদিকে একবার ঘুরে এবং ঐ সময়ে পৃথিবীকে একবার প্রদক্ষিণ করিয়া আসে। এইজন্য আমরা চিরকাল চন্দ্রের এক দিক দেখিয়া থাকি। পৃথিবীর সকল দেশের লোকই কখন না কখন চাঁদ দেখিতে পায়। চন্দ্র সর্ব্বদা এক দিক পৃথিবীর দিকে রাখিয়া প্রদক্ষিণ করিতেছে বলিয়া চন্দ্রের এক পিঠের লোক চিরকাল তাহাদের চন্দ্র (পৃথিবী) দেখিবে, তাহার আর উদয় অস্ত হইবে না। কিন্তু চন্দ্রের যে পিঠ আমরা দেখি না, সেই পিঠের অধিবাসিগণ কোন কালেও চন্দ্রের চাঁদ দেখিতে পাইবে না।

পৃথিবীর আহ্নিক গতি দ্বারা যেমন দিনরাত্রি হয়, সেইরূপ চন্দ্রের আহ্নিক গতি দ্বারাও চন্দ্রের দিনরাত্রি হয়। আমাদিগের ২৯½ দিবসে চন্দ্রের এক দিবস হয়। চন্দ্রের যে ভাগে সূর্য্যকিরণ পতিত হয়, সেই ভাগে দিন, অন্য ভাগে রাত্রি। একবার সূর্য্য উদয় হইলে চন্দ্র হইতে চৌদ্দ দিন পর্য্যন্ত দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। আবার সূর্য্য চৌদ্দ দিন অদৃশ্য থাকে; তখন চন্দ্রের রাত্রি। সুতরাং আমাদের

চৌদ্দ দিনে চন্দ্রের একদিন আর চৌদ্দ রাত্রিতে এক রাত্রি। সেখানে লোক থাকিলে উহারা বোধ হয় এক এক জন ছোট খাট কুম্ভকর্ণ! নতুবা এরূপ দীর্ঘ রাত্রি কিরূপে ঘুমাইয়া কাটাইবে? আমাদের দিন যখন একটু বড় হয় তখন আমাদের গ্রীষ্মকাল। আমরা সেই সময়ে খুব গরম অনুভব করি। আবার রাত্রি যখন একটু বড় হয়, সূর্য্যের উত্তাপ কিছু কম পাই, তখন শীতকাল। যেখানে আমাদের চৌদ্দ রাত্রিতে একরাত্রি এবং চৌদ্দদিনে একদিন, সেই খানে কি ভীষণ শীত! এবং গ্রীষ্মকালে কি ভয়ানক গরম! আমরা তাহা কল্পনাও করিতে পারি না!

চন্দ্রের দিন ও রাত্রি।

চন্দ্রের জন্মসম্বন্ধে ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা বলেন,—অতি প্রাচীন কালে পৃথিবী যখন উষ্ণ বাষ্পাকারে, ভীষণ বেগে শূন্যপথে ঘূরিতেছিল তখন হঠাৎ কতকটা অংশ কেন্দ্রাপসারিণী গতিতে পৃথিবীর দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হয়। সেই বিশ্লিষ্ট অংশ আবার মাধ্যাকর্ষণের অধীন হইয়া পৃথিবীর চারিদিকে ঘুরিতে লাগিল। উহাই এখন চন্দ্রে পরিণত হইয়াছে। পৃথিবী হইতে এতটা পদার্থ চলিয়া যাওয়াতে উহার গায় একটা প্রকাণ্ড গর্ত্ত হওয়া স্বাভাবিক। সেই গর্ত্তটাই নাকি "প্রশান্ত" মহাসাগর। আমাদের পুরাণে আছে, দেবাসুরের সমুদ্র মন্থনকালে সমুদ্র-গর্ভ হইতে চন্দ্র উত্থিত হইয়াছিল। এই কাহিনী পূর্ব্বোক্ত পণ্ডিতদিগের মতেরই রূপান্তর কিনা এখন বলা অসাধ্য।

চন্দ্রের জন্ম কথা।

চন্দ্রমণ্ডলে দৃষ্টিপাত করিলে উহার গায় কাল কাল দাগ দেখিতে পাওয়া যায়। এই কাল চিহ্নগুলি প্রাচীনকালের লোকেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। তখন দূরবীক্ষণ যন্ত্র আবিষ্কৃত হয় নাই; চন্দ্রের অবস্থা জানিবার কোন উপায় ছিল না। সেকালের পণ্ডিতেরা চন্দ্রের

কাল দাগগুলি ব্যাখ্যা করিবার জন্য নানাবিধ কাল্পনিক গল্প রচনা করিলেন। সেই সকল অদ্ভুত গল্প শুনিলে এখন আমাদের হাসি পায়। আমরা ছোট বেলা ঠাকুরমার নিকট শুনিয়াছি, চন্দ্রে একটা প্রকাণ্ড বটগাছ আছে। সেই বটগাছের নীচে বসিয়া এক বৃদ্ধা স্ত্রীলোক সূতা কাটিতেছে। দূরবীক্ষণ আবিষ্কারের পর চন্দ্রের কাল দাগগুলির প্রকৃত কারণ বাহির হইয়াছে।

আমরা চন্দ্র-মণ্ডলের উপরিভাগ যেরূপ মসৃণ ও উজ্জ্বল দেখি, বাস্তবিক উহা তদ্রূপ নহে। ভূ-পৃষ্ঠের ন্যায় চন্দ্র-পৃষ্ঠও অসমান; কোন স্থান উচ্চ কোনও স্থান নিম্ন। দূরবীক্ষণ দ্বারা দেখিলে চন্দ্রে অসংখ্য উচ্চ পর্ব্বত ও গভীর গহ্বর দৃষ্টিগোচর হয়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, চন্দ্রের একপিঠ আমরা দেখি। অপর পিঠ কিরূপ তাহা বলিবার সাধ্য নাই। হয়তো সেই দিক বৃক্ষলতাদি শোভিত এবং বাসের সম্পূর্ণ উপযোগী। চন্দ্রের পাহাড় গুলিতে সূর্য্য-

চন্দ্রের কলঙ্ক।

কিরণ পতিত হইলে উহাদিগকে খুব উজ্জ্বল দেখায় এবং পাহাড়গুলির পার্শ্বে কৃষ্ণ ছায়া পড়ে। পৃথিবীর পৃষ্ঠে এরূপ নিবিড় কাল ছায়া পতিত হইতে পারে না। চন্দ্রে বায়ু নাই, পৃথিবীতে বায়ু আছে। পৃথিবীর বায়ু-মণ্ডল সূর্য্যরশ্মি অনেক পরিমাণে প্রতিফলিত করিয়া দেয়। চন্দ্রে বায়ু না থাকাতে তথায় আলোক বিক্ষিপ্ত হয় না। তাই চন্দ্রের গায় পাহাড়ের ছায়া অতিশয় কৃষ্ণ বর্ণ দেখায়। উহাই চন্দ্রের কলঙ্ক বা কাল চিহ্ন। এতদ্ব্যতীত চন্দ্রে কতকগুলি গভীর গহ্বর আছে। উহাদের ভিতর সূর্য্যের আলোক প্রবেশ করিতে পারে না, এইজন্য ঐ সকল স্থান গভীর কৃষ্ণবর্ণ দেখায়।

শুক্ল পক্ষের অষ্টমী নবমী তিথি পর্য্যন্ত পাহাড়ের ছায়াগুলি স্পষ্ট দৃষ্টিগোচর হয়। পূর্ণিমার রাত্রে সূর্য্যের আলোক ঠিক সম্মুখ হইতে

চন্দ্রের উপর পতিত হওয়াতে, তখন ছায়াগুলি পাহাড়ের পশ্চাতে পড়িয়া যায়। সেইজন্য তখন আর তত বেশী কাল চিহ্ন দেখা যায় না।

চন্দ্রের পূর্ব-ভাগের দৃশ্য।

দূরবীক্ষণ দিয়া চন্দ্রের পাহাড়ের ছায়াগুলি স্পষ্ট দৃষ্টিগোচর হয়। ঐ সকল ছায়ার সাহায্যে চন্দ্রের পাহাড়ের উচ্চতা নিরূপিত হইয়াছে।

চন্দ্রের পাহাড়গুলি অতিশয় বৃহৎ। আমাদের হিমালয়ের ন্যায় সুবিশাল পর্ব্বতও চন্দ্রে অনেক আছে। চন্দ্রের আয়তন আমাদের পৃথিবীর পঞ্চাশ ভাগের একভাগ মাত্র। সুতরাং চন্দ্রের আয়তনের তুলনায় পাহাড়গুলি খুবই বড় সন্দেহ নাই। চন্দ্রের কতকগুলি পর্ব্বত সমতলক্ষেত্রে পৃথক্ পৃথক্ অবস্থিত; পরস্পরের সহিত কোন সম্বন্ধ নাই।

চন্দ্রের পাহাড় ও গহ্বর।

আবার গারো ও বিন্ধ্য পর্ব্বতশ্রেণীর ন্যায় পর্ব্বতমালাও চন্দ্রে অনেকগুলি আছে। এই সকল পাহাড় ব্যতীত মধুচক্রের রন্ধ্রের ন্যায় চন্দ্রে শত শত পর্ব্বত-গহ্বর আছে। চন্দ্র-মণ্ডলের প্রায় বারআনা অংশই ঐ সকল গহ্বরে পূর্ণ। গহ্বরগুলি সমতল ক্ষেত্রের গর্ত্তের মত নয়। উহাদিগের চারিদিকে উচ্চ পাহাড়ের প্রাচীর ক্রমশ সূক্ষ্ম হইয়া ঊর্দ্ধে উঠিয়াছে। শিখর দেশে কূপের ন্যায় গহ্বর।

চন্দ্রের গুহাগুলি বড়ই কৌতুহলজনক। গুহাগুলির আয়তনও ক্ষুদ্র নয়। বড় গুহাগুলির ব্যাস ৬০।৭০ মাইল হইবে। পণ্ডিতেরা অনুমান করেন, চন্দ্রের পাহাড়গুলি হইতে এক কালে ভীষণ অগ্ন্যুৎ-পাত হইত। পর্ব্বতের মুখগুলি (Crater) উহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। অগ্ন্যুৎপাত কালে যখন ভিতর হইতে বেগে গলিত ধাতব নিঃস্রব বাহির হয়, তখন আগ্নেয় গিরির শিখর ভাগ ভাঙ্গিয়া উৎক্ষিপ্ত হয় এবং সেস্থানে একটা মুখ হয়। চন্দ্রের কতকগুলি গহ্বর ঐ কারণে উৎপন্ন হইয়াছে।

চন্দ্রের 'টাইকো' (Tycho) নামক একটী বৃহৎ গহ্বর আছে। উহা বড়ই বিস্ময়জনক। চন্দ্রের প্রতিকৃতির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যাইবে, উপরিভাগের একটী স্থান হইতে অত্যুজ্জ্বল আলোক-রেখা

বাহির হইতেছে। উহাই 'টাইকো'। এই গুহা প্রায় ৫০।৬০ মাইল বিস্তৃত এবং প্রাচীরের ন্যায় উচ্চ পর্ব্বতমালা উহার চারিদিক বেষ্টন করিয়া আছে। গুহাটী ঠিক কটাহের ন্যায়। উহার মধ্য হইতে সূর্য্যকিরণ প্রতিফলিত হয়। টাইকোর চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী পাহাড়শ্রেণী প্রাচীরের

টাইকো।
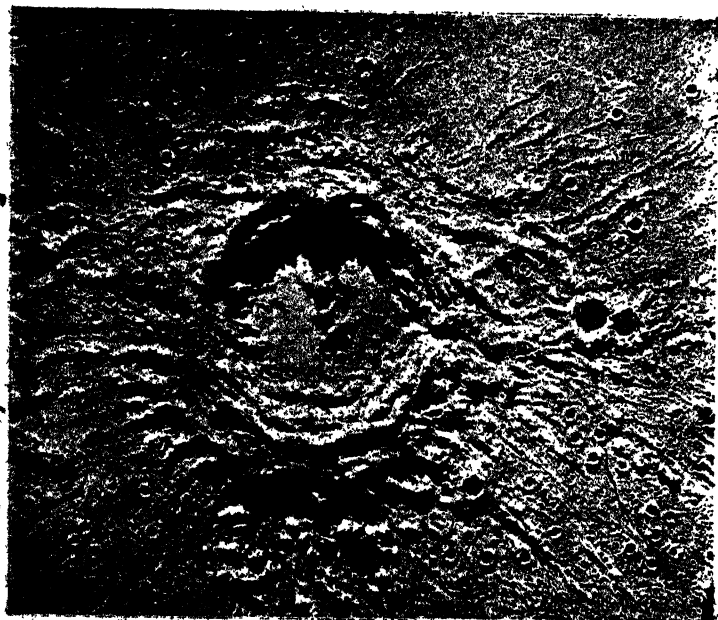
চন্দ্রের টাইকো গহ্বর।

ন্যায় ঊর্দ্ধে উঠিয়া শৃঙ্গের আকার ধারণ করিয়াছে। সেই শৃঙ্গ হইতে টাইকোর অভ্যন্তর প্রায় বিশ হাজার ফিট্ গভীর!

চন্দ্রের অধিকাংশ গহ্বরের নাম জ্যোতির্ব্বিদ্গণ প্রাচীন গ্রীস্

দেশীয় পণ্ডিতদিগের নাম অনুসারে রাখিয়াছেন। যেমন 'প্লেটো', 'এরিষ্টটল্,' 'আরকিমিডিস্', 'কোপারনিকাস্' ইত্যাদি।

'কোপারনিকাস্' (Copernicus) গহ্বরটী বড়ই রমণীয়। ইহার প্রতিকৃতি দেখিলেই বুঝা যায়, এক সময়ে ইহা একটী প্রকাণ্ড আগ্নেয়গিরি ছিল। উহার চারিদিকের প্রাচীর খুব উন্নত। শৃঙ্গ হইতে গহ্বরের গভীরতা ১১৩০০ ফিট্। সমতল ক্ষেত্র হইতে ঐ সকল প্রাচীরের উচ্চতা ২৬০০ ফিটের ন্যূন হইবেনা। কোপারনিকাসের চারিদিকে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গহ্বর আছে। (৪৮ পৃষ্ঠায় চিত্র দেখ)।

কোপারনিকাস্।

'প্লেটো' (Plato) নামক গহ্বরটী ছোট দূরবীক্ষণ দ্বারাও দেখা যায়। উহার দেয়ালের উচ্চতা প্রায় ৩০০০ তিন হাজার ফিট্। এই উন্নত দেয়ালের মাঝে ৬০ ফিট্ ব্যাস বিশিষ্ট বিস্তৃত প্রস্তরময় ক্ষেত্র। চন্দ্রের অনেকগুলি গুহা আছে উহাদের ভিতর কখনও সূর্য্যের আলোক প্রবেশ করিতে পারে না।

প্লেটো।

দূরবীক্ষণ দ্বারা দেখিলে চন্দ্রের গুহা হইতে কতকগুলি সাদা রেখা বহির্গত হইয়াছে দেখা যায়। পণ্ডিতেরা বলেন, অগ্ন্যুদ্গম কালে যে ধাতু গলিয়া বাহির হইয়াছিল, সেই স্রোত এখন কঠিন হইয়া আছে। উহাই সূর্য্যের আলোকে উজ্জ্বল সাদা রেখার মত দেখায়। চন্দ্রে বায়ু না থাকায় ঐ ধাতু-স্রোত আজও মলিন হয় নাই। রেখাগুলির কোন কোনটার দৈর্ঘ্য দুই হাজার মাইল হইবে। চন্দ্রে জল ও বায়ু না থাকায় চন্দ্র-পৃষ্ঠের প্রাকৃতিক অবস্থার বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন হয় না। জল ও বায়ু তিল তিল করিয়া সমস্ত জড় পদার্থকে ক্ষয় করে। চন্দ্রে জল ও বায়ু না থাকায় গিরি গহ্বরাদি অক্ষত রহিয়াছে বটে, কিন্তু চন্দ্রের প্রাকৃতিক

অবস্থা বড়ই ভীষণ হইয়াছে। আমাদের পৃথিবীতে কত সুন্দর সলিলপূর্ণ নদ-নদী, সাগর-মহাসাগর আছে, কত রমণীয় ফল-ফুল শোভিত দেশ আছে; কত শ্যামল মাঠ চারিদিকে বিস্তৃত রহিয়াছে! এক এক ঋতুতে আমাদের প্রকৃতির এক এক রকম শোভা। চন্দ্রে কেবল প্রস্তরময় মাঠ ধূ ধূ করিতেছে! একটী তৃণও তথায় জন্মিতে পারে না। সেই দৃশ্যের কথা চিন্তা করিলেও শরীর শিহরিয়া উঠে। মেঘ নাই, বৃষ্টি নাই, রাত্রিতে ভয়ানক শীত, দিনে ভয়ানক রৌদ্র! যে চন্দ্রকে দেখিয়া আমরা নয়ন জুড়াই, যাহার সৌন্দর্য্যের সহিত জগতের সকল পদার্থের সৌন্দর্য্যের তুলনা করি, সেই রমণীয় চন্দ্রেরই এই অবস্থা!

চন্দ্রে লোক থাকিলে সেই সকল অধিবাসীরা কোন শব্দ শুনিতে পাইবে না, ঢাক ঢোল বাজাইলেও শুনিবে না। কারণ, চন্দ্রে বায়ু নাই। তথায় কারো কথা কেহ শুনিবে না, তাই সঙ্কেতে মনের ভাব প্রকাশ করিতে হইবে। কেহ কোন গন্ধও পাইবেনা। আর সকলেই মূক ও বধির হইবে।

চন্দ্র-কলার হ্রাস-বৃদ্ধির কারণ।

পূর্ণিমা রাত্রিতে সম্পূর্ণ গোলাকার চন্দ্র দেখিতে পাওয়া যায়। পূর্ণিমার পর চাঁদ ক্রমে ছোট হইতে থাকে। চৌদ্দ পনর দিন পরে চাঁদ একবারে অদৃশ্য হয়; তখন অমাবস্যা। তারপর দ্বিতীয়ার দিন কাস্তের আকার চাঁদ পশ্চিমাকাশে দৃষ্টিগোচর হয়। তখন দিন দিনই চাঁদ বাড়িতে থাকে আর পশ্চিম হইতে পূর্ব্বদিকে অগ্রসর হইতে থাকে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, চাঁদ পশ্চিম হইতে পূর্ব্বদিকে যাইতে যাইতে পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে। আবার চৌদ্দ পনর দিন পর

পূর্ণচন্দ্র পূর্ব্বাকাশে উদিত হয়। তারপর চাঁদ আরও পূর্ব্বদিকে সরিতে থাকে এবং ক্রমশঃ ক্ষয় পায়। এইরূপে চন্দ্র পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিয়া পুনরায় পশ্চিম আকাশে দেখা দেয়। একদিনে চন্দ্রের যে অংশ বাড়ে বা ক্ষয় পায় সেই অংশ এক কলা।
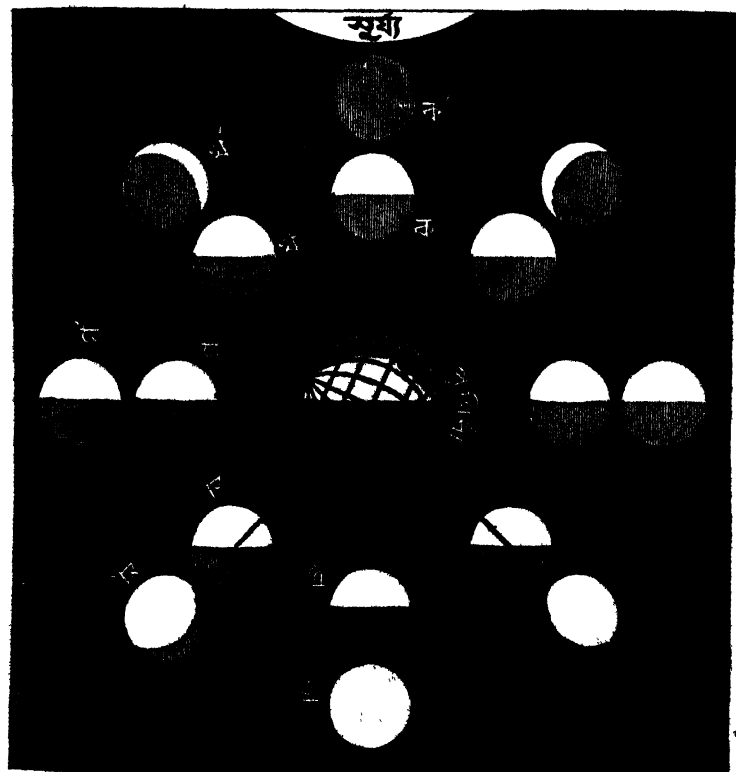
চন্দ্র-কলার হ্রাস-বৃদ্ধি।

চন্দ্র-কলার হ্রাস-বৃদ্ধি হয় কেন, তাহা চিত্র দেখিলে বুঝা

যাইবে। চন্দ্র যখন "ক" চিহ্নিত স্থানে থাকে তখন তাহার যে ভাগ সূর্য্যের আলোকে উজ্জ্বল হয় সেই ভাগ সূর্য্যের দিকে থাকে, আর যে ভাগ আলোক পায় না সেই ভাগ পৃথিবীর দিকে থাকে। এইজন্য পৃথিবীর লোকেরা তখন চন্দ্র দেখিতে পায় না। সেই সময়কে অমাবস্যা বলে, যেমন র্ক। চন্দ্র যখন "ক" স্থান হইতে "খ" স্থানে আসে তখন তাহার সমুদয় আলোকিত অংশের ¼ অংশ মাত্র আমরা দেখিতে পাই। যেমন র্খ। "গ" চিহ্নিত স্থানে চন্দ্র আসিলে উহার উজ্জ্বল ভাগের অর্দ্ধাংশ আমরা দেখিতে পাই যেমন র্গ। "ঘ" চিহ্নিত স্থানে চন্দ্র আসিলে উহার চারি ভাগের তিন ভাগ দৃষ্টিগোচর হয়, যেমন র্ঘ। "ছ" স্থানে চন্দ্র আসিলে উহার উজ্জ্বল ভাগের সমুদয় দেখিতে পাওয়া যায়; যেমন র্ছ; তখন পূর্ণিমা।

জোয়ার ও ভাটা।

তোমরা সমুদ্রে অথবা বড় বড় নদীতে নির্দ্দিষ্ট সময়ে জল স্ফীত হইয়া উঠিতে এবং আবার ঠিক সময়ে জল হ্রাস পাইতে দেখিয়া থাকিবে। জল ঐরূপে বৃদ্ধি হওয়াকে জোয়ার এবং হ্রাস হওয়াকে ভাটা কহে।

মাধ্যাকর্ষণ প্রবন্ধে বলিয়াছি, জগতের প্রত্যেক পদার্থই পরস্পরকে আকর্ষণ করিতেছে, পদার্থের দূরত্ব ও জিনিসের অনুপাতে এই আকর্ষণের হ্রাস-বৃদ্ধি হয়। চন্দ্র ও সূর্য্য উভয়ই পৃথিবীকে আকর্ষণ করিতেছে।

সূর্য্যের জিনিস, চন্দ্রের জিনিস হইতে অধিক, এইজন্য উহার আকর্ষণও পৃথিবীর উপর অধিক হইবার কথা। সূর্য্য অত্যন্ত বৃহৎ এবং দূরে অবস্থিত বিধায় সূর্য্য পৃথিবীকে সমগ্র ভাবে আকর্ষণ করে, কিন্তু চন্দ্র পৃথিবী হইতে ক্ষুদ্র ও নিকট বলিয়া পৃথিবীর যে অংশের নিকট আইসে, তাহার উপর আকর্ষণ করিয়া থাকে। এইজন্য কোন নির্দ্দিষ্ট স্থানে সূর্য্যের আকর্ষণ হইতে চন্দ্রের আকর্ষণ অধিক। সূর্য্যের আকর্ষণ চন্দ্রের আকর্ষণের $\frac{4}{5}$ মাত্র। সুতরাং চন্দ্রের আকর্ষণই জোয়ার ভাটার কারণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে।

জোয়ার-ভাটার কারণ।

পৃথিবীর $\frac{3}{4}$ চারি ভাগের তিন ভাগই জলে আবৃত। এইজন্য চন্দ্র পৃথিবীর যে অংশের নিকটবর্ত্তী হয়, সেই অংশের জল উহার আকর্ষণে স্ফীত হইয়া উঠে। তখন তথায় সর্ব্বাপেক্ষা অধিক জোয়ার হয়। ঠিক সেই সময়ে পৃথিবীর বিপরীত দিকেও জোয়ার হইয়া থাকে। কারণ, পৃথিবী উহার বিপরীত অংশের জলরাশি হইতে চন্দ্রের নিকট বলিয়া, পৃথিবী চন্দ্রের দিকে অধিকতর আকৃষ্ট হইয়া জল হইতে সরিয়া আইসে, তজ্জন্যই বিপরীত দিকের জলরাশিও স্ফীত হইয়া ঝুলিয়া পড়ে। তখন সেই স্থানেও জোয়ার হয়। পৃথিবীর দুই বিপরীত দিকে জল স্ফীত হইয়া উঠে বলিয়া দুই প্রান্তে জল কমিয়া যাওয়াতে ভাটা হয়। যখন চন্দ্র ও সূর্য্য সমসূত্রপাতে এক দিকে থাকে তখন আকর্ষণ অত্যন্ত বৃদ্ধি হওয়াতে ভরা-জোয়ার (Springtides) হয়। চন্দ্র ও সূর্য্য পৃথিবীর দুই বিপরীত দিকে থাকিলেও ভরা জোয়ার হয়। কিন্তু যখন চন্দ্র ও সূর্য্য পৃথিবীর সহিত সমকোণবর্ত্তী স্থানে থাকে তখন চন্দ্র ও সূর্য্যের আকর্ষণ পরস্পরের প্রতিকূল হওয়ায় জল অধিক পরিমাণে স্ফীত হয় না, তাই তখন কম জোয়ার (Neaptides) হয়।

জোয়ার-ভাটা।
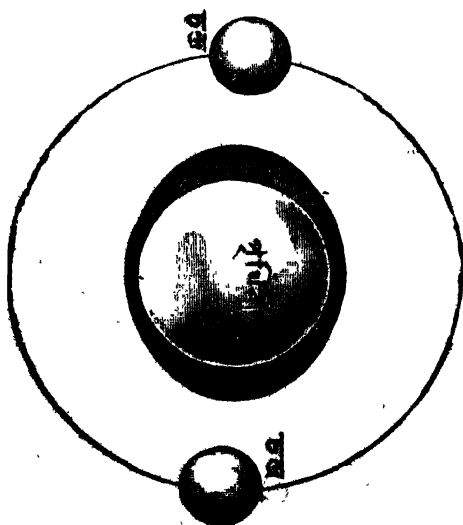
গ্রহণ।

চন্দ্র ও সূর্য্যগ্রহণ দেখিয়া প্রাচীন কালের সভ্য জাতিরাও ভয়ে এবং বিস্ময়ে অধীর হইতেন। এখনও নানা দেশের অসভ্য জাতীয় লোকেরা গ্রহণের সময় ভয়ে গুপ্তস্থানে পলায়ন করে। অজ্ঞ লোক-দিগের নিকট গ্রহণের দৃশ্য যে অতিশয় আশ্চর্য্য ব্যাপার হইবে তাঁহাতে আর সন্দেহ কি?

দিবা দ্বি-প্রহরে যথন সূর্য্য প্রখর কিরণ দিতেছে, প্রাণিগণ নিজ নিজ কাজে ব্যস্ত, জানা নাই, শুনা নাই, ধীরে ধীরে সূর্য্য অদৃশ্য হইতে লাগিল! আকাশ নির্ম্মল, একখণ্ড মেঘও নিকটে দৃষ্টিগোচর হইতেছে না, তবুও সূর্য্য অদৃশ্য হইতেছে! কিছু কালের মধ্যে সূর্য্য তিরোহিত হইল, অন্ধকারে পৃথিবী ঢাকিয়া ফেলিল, পাখীগুলি সভয়ে কুলায়ের দিকে ছুটিতে লাগিল! এই দৃশ্য দেখিয়া অজ্ঞ লোক ভয়-বিহ্বল হইবে ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি?

গ্রহণের ব্যাপারটী বুঝাইবার জন্য নানা দেশের লোক এক সময়ে নানাপ্রকার বিচিত্র গল্প রচনা করিয়াছিল। চীন দেশের লোকেরা মনে করিত, চন্দ্র সূর্য্যকে একটা প্রকাণ্ড অজগর সর্পে গিলিয়া ফেলে, এইজন্য চন্দ্র ও সূর্য্য অদৃশ্য হয়। আমেরিকার কোন কোন দেশের লোকরা মনে করে, গ্রহণের সময় চন্দ্র ও সূর্য্য রোগাক্রান্ত হইয়া থাকে।

আমাদের পুরাণে আছে, চন্দ্র ও সূর্য্যকে রাহু গ্রাস করে। এই জন্য গ্রহণ হয়। কিন্তু আমাদের দেশের জ্যোতির্ব্বিদগণ গ্রহণের প্রকৃত কারণ অবগত ছিলেন।

---

* সূর্য্যসিদ্ধান্ত আরও প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেখাইয়াছেন—
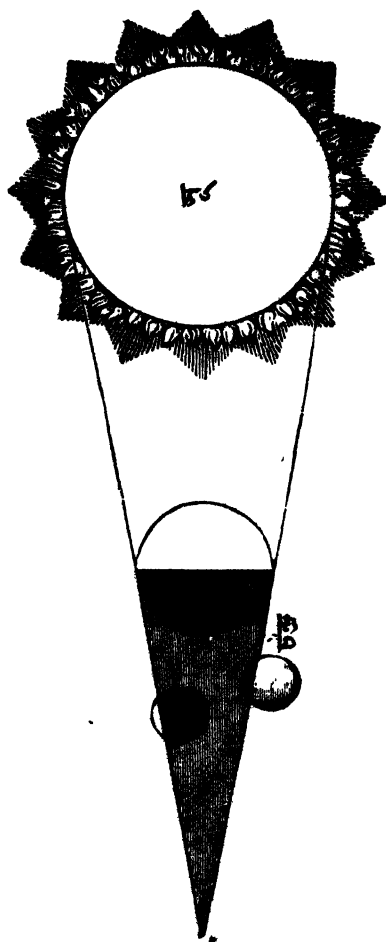
ছাদকো ভাস্করস্যেন্দু রধোস্থো ঘনবদ্ভবেৎ।

ভূচ্ছায়াং প্রাঙ্মুখশ্চন্দ্রো বিশত্যর্থোভবেদসৌ॥

চন্দ্রগ্রহণ।

সূর্য্যগ্রহণ দিবসে অমাবস্যাতে চন্দ্র ও সূর্য্যের ঠিক সমসূত্রে অবস্থান হয়, মেঘ যেরূপ নিম্নে থাকিয়া চন্দ্র-সূর্য্যকে আচ্ছাদন করে, তদ্রূপ চন্দ্র. সূর্য্যকে আচ্ছাদন

পূর্ব্বেই বলিয়াছি পৃথিবী সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করে এবং চন্দ্র পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে। যখন পৃথিবী, চন্দ্র ও সূর্য্যের মধ্যস্থলে আইসে তখন পৃথিবীর ছায়া চন্দ্রের উপর পতিত হয়; এই নিমিত্তই চন্দ্রকে অন্ধকারে আবৃত দেখা যায়। এইরূপ ছায়া-প্রবেশকেই চন্দ্রের গ্রহণ বলে। পূর্ণিমা রাত্রে চন্দ্রগ্রহণ হয়। কিন্তু সকল পূর্ণিমাতে চন্দ্রগ্রহণ হয় না। পৃথিবী ও চন্দ্রের যেরূপ গতির নিয়ম নির্দ্দিষ্ট আছে তদনুসারে সকল পূর্ণিমাতে পৃথিবী চন্দ্র ও সূর্য্যের ঠিক মধ্যবর্ত্তী হয় না। সুতরাং যে যে পূর্ণিমাতে পৃথিবী চন্দ্র ও সূর্য্যের সহিত ঠিক সমসূত্রে আইসে, সেই সেই পূর্ণিমাতেই চন্দ্রগ্রহণ হইয়া থাকে।

চন্দ্রগ্রহণ।

চন্দ্র যখন পৃথিবীর ছায়ায় মধ্যস্থল দিয়া গমন করে তখন চন্দ্রের সমুদায় অংশ ছায়াতে আবৃত হয়। ইহাকেই পূর্ণগ্রহণ কহে। যখন চন্দ্র ঐ ছায়ার এক পার্শ্ব দিয়া গমন করে, তখন চন্দ্রের সকল অংশ ছায়াতে ঢাকা পড়ে না। কিয়দংশ মাত্র আবৃত হয়। তখন আংশিক গ্রহণ হইয়া থাকে।

চন্দ্র পৃথিবীর ছায়াতে আবৃত হইলে চন্দ্রগ্রহণ হয়। কিন্তু সূর্য্যগ্রহণের সময়, সূর্য্য সেরূপ ছায়াতে আবৃত হয় না। সূর্য্য তেজোময়; সুতরাং উহা ছায়ায় ঢাকা পড়িতে পারে না। যখন চন্দ্র ও পৃথিবী নিজ নিজ পথে ভ্রমণ করিতে করিতে এরূপ অবস্থায় আইসে যে, চন্দ্র, পৃথিবী ও সূর্য্যের মধ্যস্থলে থাকে, তখন চন্দ্রদ্বারা সূর্য্য ঢাকা পড়ে। ইহাকেই সূর্য্যগ্রহণ কহে।

সূর্য্যগ্রহণ।

অমাবস্যাতে সূর্য্যগ্রহণ হইয়া থাকে। কিন্তু প্রতি অমাবস্যাতে সূর্য্য গ্রহণ হয় না। যে যে অমাবস্যায় চন্দ্র পৃথিবী ও সূর্য্যের মধ্য-

---

করে তাহাকে সূর্য্যগ্রহণ হয়, এবং পূর্ণিমার দিনে রাশি নক্ষত্রের গতি অনুসারে পৃথিবীর ছায়া চন্দ্রে পতিত হয়, তাহাতে চন্দ্রগ্রহণ হয়।

বর্ত্তী হয় কেবল সেই সেই অমাবস্যাতেই সূর্য্যগ্রহণ হইয়া থাকে। যে অমাবস্যায় চন্দ্র পৃথিবী ও সূর্য্যের সহিত ঠিক সমসূত্রে থাকে,
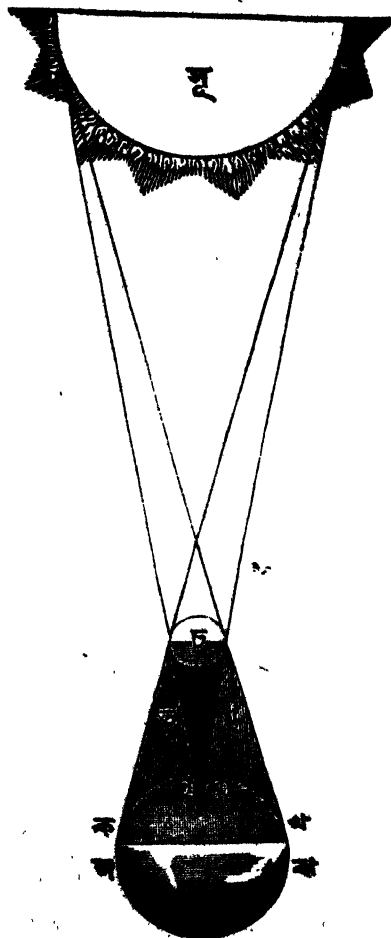
সূর্য্যগ্রহণ।

সেই অমাবস্যায় চন্দ্রদ্বারা সূর্য্য সম্পূর্ণ ঢাকা পড়ে। এইরূপ সকল অংশ আচ্ছন্ন হওয়াকেই পূর্ণগ্রহণ বলে।

সূর্য্যদ্বারা পৃথিবীর সকল স্থান একবারে আলোকিত হয় না। অর্থাৎ সকল স্থানে একবারে সূর্য্যোদয় দৃষ্ট হয় না। ইহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। কিন্তু সূর্য্যগ্রহণের সময় যে যে স্থানে সূর্য্য উদয় হয় তাহারও সকল স্থানে সূর্য্যের গ্রহণ দৃষ্ট হয় না। পণ্ডিতেরা পূর্ব্বেই গণিয়া বলিতে পারেন কোন্ কোন্ স্থান হইতে গ্রহণ দৃষ্ট হইবে। ইহার কারণ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

(সূ—সূর্য্য; চ—চন্দ্র; ক খ গ ঘ জ ঝ পৃথিবীর কিয়দংশ; ত থ চন্দ্রের ছায়া।) গ ও ঘ এর মধ্যবর্ত্তী স্থানের লোকেরা সূর্য্যের পূর্ণগ্রহণ দেখিতেছে। কগ ও খ ঘ স্থানের লোকেরা পূর্ণগ্রহণ দেখে না। কিন্তু সূর্য্যের কিয়দংশ আচ্ছন্ন দেখিতেছে। ক জ ও খ ঝ স্থানের লোকেরা অন্যস্থানে যখন গ্রহণ, সেই সময়েও তেজোময় সূর্য্য দেখিতেছে।

বুধ।

বুধ সূর্য্যের নিকটতম গ্রহ। অনেক দিন পূর্ব্বে কেহ কেহ অনুমান করিয়াছিলেন, বুধ ও সূর্য্যের মধ্যবর্ত্তী আর একটী গ্রহ আছে। তাঁহারা ঐ গ্রহের নাম রাখিয়াছিলেন ‘ভল্‌কান্’ (Vulcan)। ভল্‌কানের গতির পরিমাণ এবং উহা যে পথে সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করে তাহাও নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। তার পর পণ্ডিতেরা বিশেষভাবে

পরীক্ষা করিয়া সিদ্ধান্ত করিলেন যে, বুধ ও সূর্য্যের মধ্যবর্ত্তী কোন গ্রহ নাই। সুতরাং এখন পর্য্যন্ত বুধই সূর্য্যের নিকটতম গ্রহ।

বুধ গ্রহ সূর্য্যের অতি নিকটবর্ত্তী বিধায় উহাকে লক্ষ্য করা কঠিন। সূর্য্যের প্রখর আলোকে বুধ প্রায়ই অদৃশ্য হইয়া থাকে; সর্ব্বদা দৃষ্টিগোচর হয় না। এইজন্য খালি চক্ষে প্রাচীন জ্যোতিষীদিগের বুধ আবিষ্কার করিতে নিশ্চয়ই অতিশয় বেগ পাইতে হইয়াছিল। আমাদের দেশীয় জ্যোতিষীরা যে বহু সহস্র বৎসর পূর্ব্বে খালি চক্ষে বুধকে লক্ষ্য করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন এবং উহাকে গ্রহ বলিয়া চিনিয়াছিলেন, ইহাতে তাঁহাদের সূক্ষ্ম দৃষ্টি ও অসীম অধ্যবসায়ের পরিচয় পাওয়া যায়। আরও বিস্ময়ের বিষয়, তাঁহারা বুধের ভ্রমণ-পথ (Orbit) এবং উহার সূর্য্য-প্রদক্ষিণ-কালও অভ্রান্তরূপে স্থির করিয়াছিলেন।

সূর্য্য অস্ত যাইবার কিছুকাল পরে কখন কখন পশ্চিম আকাশে ঠিক দিক্‌বলয়ে (Horizon অর্থাৎ যেখানে আকাশ আসিয়া পৃথিবীর সহিত মিলিয়াছে) একটী উজ্জ্বল তারকার মত বুধ দৃষ্টিগোচর হয়। বুধ যখন দিক্‌বলয়ের নিকট থাকে তখন খোলা মাঠে না গেলে উহাকে প্রত্যক্ষ করা কঠিন। যে দিন দিক্‌বলয়ে বুধকে প্রথম দেখিবে, তার কয়েক দিন পরই দেখিতে পাইবে উহা আর একটু উপরে উঠিয়াছে। তখন উজ্জ্বলতাও বৃদ্ধি পাইবে। তারপর বুধ আরও উপরে উঠিবে এবং তখন উজ্জ্বলতা আরও বৃদ্ধি পাইবে। এইরূপে বুধ যতই উপরে উঠিতে থাকিবে, তাহার উজ্জ্বলতাও ততই বৃদ্ধি পাইবে। তারপর ক্রমে বুধ নীচে নামিবে আর উজ্জ্বলতাও হ্রাস পাইতে থাকিবে। অবশেষে একদিন বুধ অদৃশ্য হইয়া যাইবে। তখন আর উহাকে পশ্চিম আকাশে দেখা যাইবে না। কিছু দিন পর বুধ পূর্ব্বাকাশে সূর্য্যো-

দয়ের পূর্ব্বে দৃষ্টিগোচর হইবে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বুধ সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করে। এইজন্য বুধ কখন সূর্য্যের আগে থাকে, কখন পশ্চাতে যায়। যখন বুধ সূর্য্যের আগে থাকে তখন সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে দেখা দেয়, আর যখন পশ্চাতে থাকে তখন সূর্য্যাস্তের পরে দৃষ্টিগোচর হয়। বুধ যখন সূর্য্যোদয়ের আগে পূর্ব্বাকাশে দেখা দেয় তখন উহাকে **প্রভাততারা** কহে। আর যখন সূর্য্যাস্তের পর পশ্চিম আকাশে দৃষ্টিগোচর হয় তখন উহাকে **সন্ধ্যাতারা** কহে।

প্রভাততারা ও সন্ধ্যাতারা।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সূর্য্যের খুব নিকট বলিয়া বুধকে লক্ষ্য করা সহজ নহে। বুধ যখন পূর্ব্বদিকে থাকে তখন উহা উষার অরুণালোকে প্রায়ই অদৃশ্য থাকে; আর যখন পশ্চিমদিকে থাকে তখনও প্রায়ই অস্তগামী সূর্য্যের কিরণে আবৃত থাকে।

বুধ পৃথিবীর ন্যায় গোলাকার। ইহা সূর্য্য হইতে ৩৫৯৮৭০০০ তিন কোটী উনষাটি লক্ষ সাতাশী হাজার মাইল দূরে অবস্থিত।

বুধের ব্যাস প্রায় ২৯৯২ দুই হাজার নয়শত বিরানব্বই মাইল। ইহার আয়তন পৃথিবীর আয়তনের সতের ভাগের এক ভাগ। অর্থাৎ সতরটী বুধ একত্র করিলে পৃথিবীর আয়তনের সমান হইবে।

বুধ ৮৭ দিন ২৩ ঘণ্টা ১৫ মিনিটে সূর্য্যকে এক বার প্রদক্ষিণ করে। অর্থাৎ আমাদের প্রায় ৮৮ দিনে বুধের এক বৎসর হয়। বুধ প্রতি মিনিটে ১৭৮৪ এক হাজার সাত শত চৌরাশী মাইল গতিতে সূর্য্যের চারিদিকে ভ্রমণ করিতেছে।

বুধের আয়তন, দিন ও বৎসর।

যদি গ্রহ-মণ্ডলে কোন চিহ্ন দৃষ্টিগোচর হয় তাহা হইলে উহার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া গ্রহের আবর্ত্তন কাল নিরূপণ করা সহজ হয়। কিন্তু বুধ একটী ক্ষুদ্র গ্রহ এবং উহা বেশ উজ্জ্বল, এইজন্য উহার গায়ে

কোন দাগ দেখা যায় না। তাই, পণ্ডিতদিগকে বুধের আবর্ত্তন-কাল নির্দ্ধারণ করিতে অতিশয় বেগ পাইতে হইয়াছিল।

বুধ ২৪ ঘণ্টা ৫ মিনিটে একবার আপন মেরুদণ্ডের চারিদিকে ঘুরে। অর্থাৎ ২৪ ঘণ্টা ৫ মিনিটে বুধের এক দিনমান হয়; সুতরাং বুধের দিন পৃথিবীর দিন হইতে কয়েক মিনিট বড়।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বুধ প্রভৃতি কোন গ্রহেরই নিজের আলোক নাই। উহারা সূর্য্যের আলোকে আলোকিত হয়। এক গ্রহ হইতে অপরাপর গ্রহকে ক্ষুদ্র তারার ন্যায় দৃষ্টি গোচর হইয়া থাকে। সূর্য্যকে পৃথিবী হইতে যত বড় দেখা যায়, বুধগ্রহ হইতে তাহার সাত গুণ বড় দেখা যাইবে। সূর্য্যের আলোক ও উত্তাপ সেখানে সাত গুণ অধিক।

বুধ সম্বন্ধে আমরা বিশেষ কিছুই জানি না। বুধ চন্দ্রের ন্যায় জলশূন্য কি না তাহা জানিতে পারা যায় নাই। বুধ গ্রহে কোন প্রাণী আছে কিনা তাহাও আমরা অবগত নহি।

বুধের ইউরোপীয় নাম মারকিউরী (Mercury)। প্রাচীন কালে গ্রীকগণ মারকিউরীকে প্রধান দেবদূত এবং বাগ্মিতা ও বাণিজ্য শাস্ত্রের দেবতা বলিয়া পূজা করিতেন।

শুক্র।

বৎসরের কোন কোন সময়ে সূর্য্য অস্তাচলে গমন করিলে পশ্চিম আকাশে একটী খুব উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। উহার নাম শুক্র গ্রহ। সুনীল আকাশে উজ্জ্বল শুক্র গ্রহটী বড়ই রমণীয় দেখায়। যখন দিবসের প্রখর আলোক নিবিয়া যায়, শীতল বাতাস বহিতে থাকে, সদ্য প্রস্ফুটিত কুসুম-গন্ধে চারিদিক আমোদিত

হয়, পাখীগণ সুমধুর গান গাহিয়া কুলায়ের দিকে ছুটিয়া যায়, কুল-বধূগণ ঘরে ঘরে প্রদীপ প্রজ্বালিত করেন, সেই শুভক্ষণে শুক্র পশ্চিম আকাশে দেখা দেয়। তখন উহাকে দেখিলে মনে হয় যেন কোন দেব-বালা নীরবে আকাশ হইতে শান্ত, কোলাহলশূন্য ধরণীর শ্যামল-শোভা নিরীক্ষণ করিতেছেন!

ইংরেজীতে শুক্র গ্রহকে ভিনাস্ (Venus) কহে। ভিনাস্ প্রেম ও সৌন্দর্য্যের দেবতা। বাস্তবিক শুক্রের এই নামটী সার্থক হইয়াছে। যখন দিবা অবসানে শ্রান্ত জীব-কুল শান্তি-পূর্ণ আবাসে ফিরিয়া আইসে, যখন গৃহে গৃহে মধুর মিলন-অভিনয় আরম্ভ হয়, তখন শুক্র আকাশে দেখা দেয়। কবিগণ কত কবিতায় এই সুন্দর জ্যোতিষ্কের মাধুর্য্য বর্ণনা করিয়াছেন!

শুক্র অতিশয় উজ্জ্বল গ্রহ। আকাশের উজ্জ্বলতম নক্ষত্রও উহার নিকট হীন-প্রভ বোধ হয়। বাস্তবিক উজ্জ্বলতার তুলনায়, সূর্য্যের কথা ছাড়িয়া দিলে চন্দ্রের পরই উহার স্থান নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। শুক্রের উজ্জ্বলতা এত অধিক যে উহা দূরবীক্ষণ ব্যতীত দিনের বেলায়ও দৃষ্টি-গোচর হইয়া থাকে। আয়তনেও শুক্র অপরাপর গ্রহ নক্ষত্র হইতে বৃহত্তর বলিয়া মনে হয়। কিন্তু শুক্র প্রায় অধিকাংশ গ্রহ হইতেই ছোট।

শুক্রের আয়তন, দিন ও বৎসর।

শুক্রের স্বীয় আলোক নাই। সকল গ্রহই সূর্য্যের আলোকে আলোকিত হইয়া থাকে। শুক্রের ব্যাস প্রায় ৭৬৬০ সাত হাজার ছয় শত ষাট মাইল। উহা পৃথিবীর ন্যায় গোলাকার এবং উহার মেরু-প্রান্তদ্বয় কিঞ্চিৎ চাপা। শুক্র, সূর্য্য হইতে ৬৭২৪৫০০০ ছয় কোটী বায়াত্তর লক্ষ পঁয়তাল্লিশ হাজার মাইল দূরে অবস্থিত। শুক্রের আয়তন পৃথিবীর আয়তনের দশ ভাগের নয় ভাগ।

শুক্র ২২৫ দিনে একবার সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করে। সুতরাং ২২৫ দিনে শুক্রের এক বৎসর হয়। ২৩ ঘণ্টা ২১ মিনিটে শুক্র স্বীয় মেরুদণ্ডের চারিদিকে একবার আবর্ত্তন করে। অর্থাৎ ২৩ ঘণ্টা ২১ মিনিটে শুক্রের এক দিবস হয়। *

শুক্র গ্রহের প্রাকৃতিক অবস্থার বিশেষ বিবরণ আজ পর্য্যন্ত জানা যায় নাই। শুক্রের চারিদিকে মেঘ অথবা অন্য কোন বাষ্প উহাকে এরূপভাবে আবৃত করিয়া রাখিয়াছে যে, উহার পৃষ্ঠের অবস্থা জানিবার কোন উপায় নাই। বাস্তবিক শুক্র পৃথিবীর নিকটবর্ত্তী হইলেও উহার প্রাকৃতিক অবস্থা বড়ই জটিল।

শুক্র আয়তনে পৃথিবীর প্রায় সমান হইলেও উহার ওজন পৃথিবীর ওজনের তিন চতুর্থ ভাগ। অর্থাৎ শুক্রের পদার্থ অপেক্ষাকৃত হাল্‌কা। শুক্রের মাধ্যাকর্ষণও সেই অনুপাতে কম। পৃথিবী-পৃষ্ঠে মাধ্যাকর্ষণের বলে কোন পদার্থ প্রথম সেকেণ্ডে ১৬ ফিট্ গতিতে পতিত হয়, শুক্র গ্রহে পতনশীলের গতি প্রথম সেকেণ্ডে ১৩ ফিট্ মাত্র।

শুক্রে কোন প্রাণী আছে কি ?

শুক্রে কোন প্রাণী আছে কি ? সূর্য্য হইতে পৃথিবী যত উত্তাপ প্রাপ্ত হয়, শুক্র তাহার দ্বিগুণ উত্তাপ পায়। পৃথিবীর উপর সূর্য্য যে পরিমাণ তাপ বিকীর্ণ করে, উহা দ্বিগুণ বাড়িলে এই সুজলা-শস্য-শ্যামলা-ধরণী মরুভূমিতে পরিণত হইবে। বৃক্ষলতাদি শুকাইয়া যাইবে, প্রাণিগণ অসহ্য উত্তাপে প্রাণত্যাগ করিবে! সেইজন্য মনে হয় শুক্রে কোন প্রাণী নাই।

---

* লয়েল সাহেব গণনা করিয়া বলিয়াছেন, শুক্র একবার সূর্য্য প্রদক্ষিণ কালে নিজের চারিদিকে নিজে একপাক ঘুরিয়া আইসে। সুতরাং চাঁদের যেমন এক দিকই পৃথিবীর দিকে থাকে সেইরূপ শুক্রেরও এক দিকই সর্ব্বদা সূর্য্যের দিকে থাকে।

শুক্রে অতিশয় উত্তাপ, এইজন্যই আমরা তথায় কোন প্রাণী থাকা অসম্ভব মনে করি। হয়তো ইহা আমাদের ভুল ধারণা। যে স্থানের যেরূপ প্রাকৃতিক অবস্থা, সেই স্থানের উপযোগী করিয়াই সর্ব্বশক্তিমান ভগবান্ জীব সৃষ্টি করিতে পারেন। ইহাতে আশ্চর্য্য কি ?

সমুদ্রের তলদেশে জলের চাপ অতিশয় ভয়ানক। এই চাপের আধিক্য বশতঃ তথায় কোন প্রাণী নাই, ইহা বৈজ্ঞানিকেরা সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন। সমুদ্রের তলদেশে চাপ এত অধিক যে কুম্ভীরের কঠিন চর্ম্ম অথবা গণ্ডারের ত্বক্,—যাহা বন্দুকের গুলিতেও বিদ্ধ হয় না, তাহাও উহার দশ ভাগের এক ভাগ চাপে ফাটিয়া যায়। কিন্তু এখন জানা গিয়াছে যে, সমুদ্রের তলদেশেও প্রাণী বাস করে। উহাদের দেহ সমুদ্রের অসাধারণ চাপের উপযোগী করিয়াই গঠিত হইয়াছে। এই সকল প্রাণীদিগকে উপরে তুলিলে চাপের অল্পতা হেতু অর্দ্ধপথেই উহাদের দেহ-চর্ম্ম ফাটিয়া যায়।

আমাদের পৃথিবীর প্রাকৃতিক অবস্থার সহিত অপর গ্রহাদির প্রাকৃতিক অবস্থার বৈষম্য আছে বলিয়াই এ কথা বলা যায় না যে, তথায় কোন প্রাণী নাই। চির-তুষারাবৃত 'লাপল্যাণ্ড' দেশে লোক বাস করে একথা উষ্ণ দেশবাসী লোকেরা পূর্ব্বে কল্পনাও করিতে পারিত না।

বুধ ও শুক্রের উপগ্রহণ।

চন্দ্র পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করিতে করিতে যখন সূর্য্য ও পৃথিবীর মধ্যবর্ত্তী হয়, তখনই আমরা সূর্য্যগ্রহণ দেখি। সেইরূপ বুধ ও শুক্র গ্রহ যখন সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিতে করিতে পৃথিবী ও সূর্য্যের মধ্যে আইসে তখন সূর্য্যগ্রহণ হইয়া থাকে। সে সময়ে উহাদের আলোকিত ভাগ সূর্য্যের দিকে এবং অন্ধকার ভাগ পৃথিবীর দিকে থাকে।* কিন্তু পৃথিবী

* শুক্র ১৮৭৪ এবং ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে পৃথিবী ও সূর্য্যের মধ্যবর্ত্তী হইয়াছিল, আর ১০৫ বৎসরের আগে ঐ অবস্থায় আসিবে না।

হইতে অনেক দূরে বলিয়া বুধ বা শুক্র দ্বারা সূর্য্য-মণ্ডল ঢাকা পড়ে না, উহার গায় একটী কাল দাগের মত দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ কাল
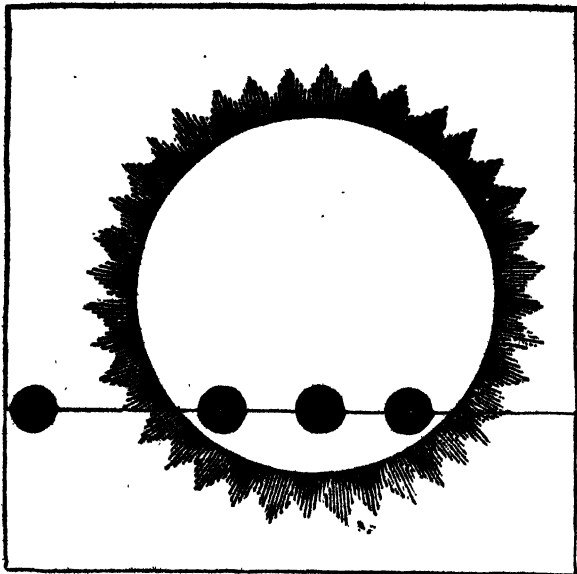
শুক্রের উপগ্রহণ (Transit of Venus)।

গোলাকার চিহ্নটী ধীরে ধীরে সূর্য্য-বিম্বের উপর দিয়া চলিয়া যায়। উহাকেই উপ-গ্রহণ বা Transit কহে।

চন্দ্র-কলার যেমন হ্রাস-বৃদ্ধি (Phase) হয় তেমনি বুধ ও শুক্রের কলারও হ্রাস-বৃদ্ধি হইয়া থাকে। কিন্তু বুধ ও শুক্র চন্দ্রের তুলনায় পৃথিবীর এত দূরে যে উহাদের কলার হ্রাস-বৃদ্ধি খালি চক্ষে দেখা যায় না। চন্দ্র আমাদের নিকট বলিয়া উহাকে বৃহৎ দেখা যায় এবং উহার কলা-পরিবর্ত্তন (Phase) দৃষ্টিগোচর হয়। বুধ ও শুক্র যখন সূর্য্য ও পৃথিবীর প্রায়

শুক্রের কলা।

মাঝামাঝি স্থানে আইসে তখন উহাদিগকে পৃথিবী হইতে শুক্লপক্ষের দ্বিতীয়ার চন্দ্রের মত দেখা যায়। উহারা যতই পৃথিবী হইতে দূরে যাইতে থাকে ততই উহাদের কলা বাড়িতে থাকে। খুব দূরে গেলে পূর্ণ-চন্দ্রের ন্যায় দেখা যায়; মধ্যমিত দূরে অর্দ্ধ চন্দ্রাকার দেখায়।
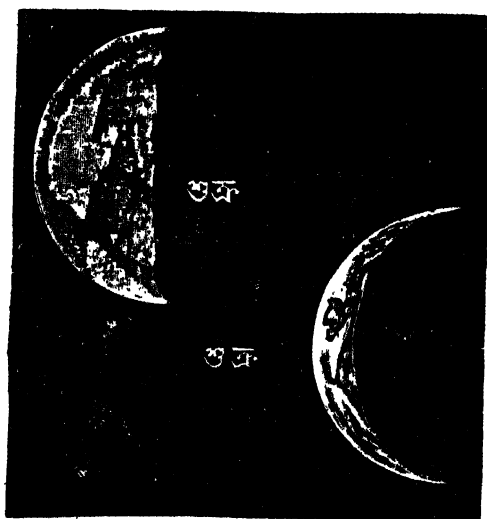
শুক্র-কলার হ্রাস-বৃদ্ধি।

পৃথিবীর ন্যায় শুক্রেরও বায়ু-মণ্ডল আছে। বর্ণ-বীক্ষণের পরীক্ষায় জানাগিয়াছে, শুক্রের বায়ু-মণ্ডলে (atmosphere) জলীয় বাষ্প বর্ত্তমান আছে। ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে শুক্র যখন পৃথিবী ও সূর্য্যের মধ্যবর্ত্তী হইয়াছিল তখন পণ্ডিতেরা শুক্রের নৈসর্গিক অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া বলিয়াছেন যে শুক্রে জল আছে।

পূর্ব্বে কেহ কেহ অনুমান করিয়াছিলেন, পৃথিবীর ন্যায় শুক্রেরও একটী চন্দ্র আছে। কিন্তু এই অনুমান এখন মিথ্যা বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে।

বুধের ন্যায় শুক্রও কখন কখন প্রভাত বা শুক্র-তারা-রূপে সূর্য্যোদয়ের আগে পূর্ব্বাকাশে দেখা দেয়, আবার কখন সূর্য্যাস্তের পর সন্ধ্যা-তারা হইয়া পশ্চিম আকাশে দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। বস্তুতঃ 'শুক-তারা' ও 'সন্ধ্যা-তারা' উভয়ই এক।

পৃথিবী

পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা স্থির করিয়াছেন, জলন্ত বাষ্পময় সূর্য্য হইতে বুধ, শুক্র ও পৃথিবী প্রভৃতি গ্রহসকল উৎপন্ন হইয়াছে। ইউরূপে এই মত প্রচারিত হইবার বহু সহস্র বৎসর পূর্ব্বে আমাদের প্রাচীন ঋষিগণ এই তথ্য লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। বহু প্রাচীন গ্রন্থে উহার আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায়। একখানি গ্রন্থে আছে,— 'আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে অগ্নি, অগ্নি হইতে জলের উৎপত্তি হইয়াছে এবং জল হইতে পৃথিবীর উৎপত্তি হইয়াছে।' *

পৃথিবীর জন্ম-কথা। মনু নামক একজন পণ্ডিত লিখিয়াছেন,—'বায়ুর বিকৃতি হইতে দীপ্তিমান্ তেজঃ, তেজঃ হইতে জল এবং কালক্রমে জল হইতে পৃথিবীর উৎপত্তি হইয়াছে।' তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে, পৃথিবীর জন্ম সম্বন্ধে আমাদের প্রাচীন পণ্ডিতেরা যাহা বলিয়া গিয়াছেন, আধুনিক পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের মতের সহিত তাহার খুব সাদৃশ্য আছে।

পৃথিবী কিরূপে ক্রমে ক্রমে বাষ্পীয় অবস্থা হইতে মনুষ্যবাসের উপযোগী হইয়াছে, তাহা রূপক দ্বারা অতি সুন্দর রূপে আমাদের

---

* আকাশাৎ বায়ুর্বায়ুরগ্নিরগ্নেরাপ অদ্ভ্যঃ পৃথিবী চোৎপদ্যতে (শ্রুতি)।

পুরাণে বিবৃত হইয়াছে। আধুনিক মতে জীব-ইতিহাসের প্রথম—মৎস্য-যুগ, দ্বিতীয়—সরীসৃপ-যুগ, তৃতীয়—স্তন্যপায়ী-যুগ ও চতুর্থ—মনুষ্য যুগ। পুরাণেও লিখিত আছে, পৃথিবী প্রথমে জলমগ্ন ছিল, সেই সময়ে এক মাত্র মৎস্যই পৃথিবীতে বাস করিত। দ্বিতীয় যুগে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কূর্ম্মের আবির্ভাব হইল। আধুনিক মতে পৃথিবীতে তখন "প্লিসিও সোরস্" ও "ইকৃথিয় সোরস্" প্রভৃতি বিরাট সরীসৃপের বাসস্থান ছিল। তৃতীয় যুগে বরাহ প্রভৃতি স্তন্যপায়ী চতুষ্পদ জন্তুগণের আবির্ভাব হইল। সর্ব্বশেষে মনুষ্য-যুগ। মনুষ্য প্রথমে নিকৃষ্টাকার ছিল। তাই, সেই সময়ের জীব ঠিক্ মনুষ্যও নয় আবার পশুও নয়, উভয়ের মাঝামাঝি—নৃসিংহ। তার পর বামনরূপী মানবের আবির্ভাব। ভগবানই সকলের স্রষ্টা, সকল জীবের দেহে তিনি আত্মারূপে বিরাজিত, সুতরাং তিনিই জীবরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন, ইহাতো যথার্থ কথাই।

পৃথিবীতে আমরা বাস করি সুতরাং উহার বিষয় অনেক কথাই আমরা জানিতে পারিয়াছি। পৃথিবীর অবস্থার সহিত তুলনা করিয়া আমাদের অন্যান্য গ্রহদের অবস্থা বুঝিতে হইবে। সূর্য্য, চন্দ্র এবং বুধ, শুক্র, মঙ্গলাদি গ্রহ যে গোল তাহা দূরবীক্ষণ দিয়াই দেখা যায়। কিন্তু পৃথিবী যে গোল, উহার পৃষ্ঠে থাকিয়া তাহা বোধ হয় না; বরং পৃথিবী সমতল বলিয়াই ধারণা হইয়া থাকে। আকাশের যখন সকল জ্যোতিষ্কই গোল, তখন পৃথিবীকেও গোল বলিয়া অনুমান করা অসঙ্গত হইত না। কিন্তু পণ্ডিতেরা কোন অনুমানের উপর নির্ভর না করিয়া পৃথিবীর গোলত্ব সপ্রমাণ করিয়াছেন। কাহারও কাহারও এরূপ ভ্রান্ত বিশ্বাস আছে যে, হিন্দুরা পূর্ব্বে পৃথিবীকে ত্রিকোণ বলিয়া জানিতেন। কিন্তু বহু প্রাচীন গ্রন্থে পৃথিবী গোলাকার বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। হিন্দু জ্যোতিষিগণ বহু সহস্র বৎসর পূর্ব্বে জানিয়াছিলেন যে, পৃথিবী

পৃথিবী গোলাকার।

'আমলকীর ন্যায় গোলাকার।' 'কদম্ব ফুলের গ্রন্থি অর্থাৎ পিণ্ডের চারিদিকে যেমন কেশর, তেমনি পৃথিবীর চারিদিকে গ্রাম পর্ব্বত, বৃক্ষলতাদি এবং প্রাণিগণ অবস্থিত।* সুতরাং পৃথিবী যে গোলাকার তাহা তাঁহারা অবগত ছিলেন।

অন্য গ্রহ হইতে পৃথিবী যেরূপ দৃষ্ট হয়।

কোন কোন পুরাণে পৃথিবী সমতল বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। সুবিখ্যাত পণ্ডিত ভাস্করাচার্য্য সেই ভ্রান্ত মত খণ্ডন করিয়াছেন।

(*) সর্ব্বতঃ পর্ব্বতারাম গ্রাম চৈত্যচয়ৈশ্চিতঃ।
কদম্ব কেশর গ্রন্থিঃ কেশর প্রসবৈরিব॥
সূর্য্যসিদ্ধান্ত। গোলাধ্যায়।

তিনি বলিয়াছেন,—"যদি পৃথিবী দর্পণাদির ন্যায় সমতল হইত, তাহা হইলে উহার বহু উচ্চে ভ্রমণশীল সূর্য্য সর্ব্বদাই মনুষ্যের দৃষ্টিগোচর হইত। অর্থাৎ তাহা হইলে কখনই দিবারাত্রিতে প্রভেদ হইত না।"§ আর একজন পণ্ডিত বলিয়াছেন,—"পৃথিবী যদি গোল না হইবে তবে তাল প্রভৃতি অত্যুচ্চ বৃক্ষসকল দূর হইতে দৃষ্টিগোচর হয় না কেন?†

পৃথিবী যদি গোল হইবে তবে উহাকে দর্পণের ন্যায় সমতল দেখায় কেন? এই প্রশ্ন স্বভাবতঃই মনে উদয় হয়। হিন্দু জ্যোতির্বিদ্‌গণ ইহারও যথার্থ মীমাংসা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। পৃথিবীর আয়তনের পক্ষে মানুষ অতি ক্ষুদ্র; এইজন্য বাস্তবিক পৃথিবী গোলাকার হইলেও ইহা চক্রাকার সমতল ক্ষেত্রের ন্যায় দেখিতে পাওয়া যায়।‡ পৃথিবী 'বলের' ন্যায় ঠিক গোল নয়, উহার উত্তর ও দক্ষিণ প্রান্ত কমলা লেবুর ন্যায় কিঞ্চিৎ চাপা। *

সেকালের কয়েক জন পণ্ডিত আপত্তি করিয়া বলিয়াছিলেন যে পৃথিবী যদি সমতল না হইয়া গোলাকার হয় তবে উহার নিম্ন

---

§ যদি সমা মুকুরোদর সন্নিভা ভগবতী ধরণী তরণিঃ ক্ষিতেঃ।
উপরি দূরগতোঽপি পরিভ্রমন্ কিমু নরৈরমরৈরিব নেক্ষ্যতে॥
গোলাধ্যায়।

† সমতা যদি বিদ্যতে ভুবস্তরবস্তালনিভাবহূচ্ছ্রয়াঃ।
কথমেব ন দৃষ্টিগোচরং নুরহো যান্তি সুদূর সংস্থিতাঃ॥
লল্লাচার্য্য।

‡ অল্প কায় তয়া লোকাঃ স্বস্থানাৎ সর্ব্বতো মুখং।
পশ্যন্তি বৃত্তামপ্যেতাম্ চক্রাকারাং বসুন্ধরাং॥
সূর্য্যসিদ্ধান্ত।

* কপিত্থ ফলবৎ বিশ্বং দক্ষিণোত্তরয়োঃ সমং।—শব্দকল্পদ্রুম।

স্থিকস্থ জীব-জন্তু স্খলিত হইয়া পড়িয়া যায় না কেন? ইহার উত্তরে ভাস্করাচার্য্য বলিয়াছেন,—"পৃথিবী গোলাকার ও আকাশে স্থিত। সুতরাং উহার ঊর্দ্ধই বা কোথায়, আর অধঃই বা কোথায়? ভূমণ্ডলে সকলেই স্ব-স্বস্থানকে উপরিস্থিত মনে করে।"§ এই বিষয়ে

আপত্তি খণ্ডন।

সুবিখ্যাত পণ্ডিত ভাস্করাচার্য্য অন্যত্র আরও পরিষ্কার করিয়া লিখিয়াছেন,—"পৃথিবীর যেখানে যে ব্যক্তি থাকে, সে সেই স্থানে থাকিয়াই ধরাতলকে স্বীয় পদতলস্থ এবং আপনাকে উহার উপরিস্থিত বলিয়া জানে। পৃথিবীর চতুর্থ ভাগস্থিত ব্যক্তি মাত্রেই ধরা মণ্ডলের উপর অধিষ্ঠিত থাকিলেও যেন বক্রভাবে আছে বলিয়া বোধ হয়। যাহারা পৃথিবীর ঠিক বিপরীত ভাগে বাস করে, জলাশয়তীরস্থ মনুষ্যের মূর্ত্তি যেমন জলে উল্‌টা অর্থাৎ মাথা নীচের দিকে দেখা যায়, তাহাদিগকেও আমরা সেইরূপ দণ্ডায়মান বোধ করি। বাস্তবিক ইহা ভ্রম মাত্র। এস্থানে আমরা যেমন আছি, তাহারাও সেইরূপ আছে।"†

কোন কোন পুরাণে উল্লিখিত হইয়াছে,—পৃথিবী হস্তীর স্কন্ধে, হস্তী কচ্ছপের পিঠে, কচ্ছপ অনন্ত নাগের মাথায় অবস্থিত। পৃথিবী

পৃথিবী শূন্যে অবস্থিত।

আশ্রয়হীন হইয়া কিরূপে শূন্যে অবস্থিতি করিবে তাহা ঐ সকল পুরাণকার ধারণা করিতে না

---

§ সর্ব্বত্রৈব মহীগোলে স্বস্থানমুপরিস্থিতং।
মন্যন্তে যে যতো গোলস্তস্য কোর্দ্ধং ক বাপ্যধঃ॥

সূর্য্যসিদ্ধান্ত।

† যো যত্র তিষ্ঠত্যবনীংতলস্থামাত্মানমস্যা উপরিস্থিতঞ্চ।
স মন্যতেঽতঃ কুচতুর্থ সংস্থামিথশ্চতে তির্য্যগিবা মনন্তি॥
অধঃ শিরস্কাঃ কুদলান্তরস্থাঃ ছায়া মনুষ্যাইব নীর তীরে।
অনাকুলাস্তির্য্যগধঃ স্থিতাশ্চ তিষ্ঠন্তি তে তত্র বয়ং যথার্থ॥

পারিয়াই এইরূপ আশ্রয়ের কল্পনা করিয়া লইয়াছেন। পণ্ডিতবর ভাস্করাচার্য্য ইহার প্রতিবাদ করিয়া বলিয়াছেন,—"পৃথিবীকে ধারণের জন্য যদি 'জানোয়ারের' মত মূর্ত্তিমান আশ্রয়ের প্রয়োজন হয়, তবে একটীর পর একটী করিয়া অনেক আশ্রয় কল্পনা করিতে হইবে, কিন্তু শেষের আশ্রয়টীকে নিজের শক্তিতেই শূন্যে অবস্থান করিতে হইবে। যদি তাই করিতে হয়, তবে মনে করনা কেন যে পৃথিবীই আপন শক্তিতে শূন্যে অবস্থিতি করিতেছে।* ইহা হইতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে, ভারতীয় প্রাচীন পণ্ডিতেরা অবগত ছিলেন যে, পৃথিবী মূর্ত্তিমান আশ্রয় হীন হইয়া নিজ শক্তিতে শূন্যে বিরাজ করিতেছে।

পৃথিবী সচলা।

আমরা দেখি যেন সূর্য্য প্রতিদিন পূর্ব্ব দিকে উদিত হইয়া পশ্চিম দিকে অস্ত যায়। বাস্তবিক তাহা নয়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, পৃথিবীরই পশ্চিম হইতে পূর্ব্ব দিকে গতি আছে। পৃথিবী আপন মেরুদণ্ডের উপর পশ্চিম হইতে পূর্ব্বাভিমুখে প্রত্যহ এক বার আবর্ত্তন করে, তাহাতেই সূর্য্যের গতি দৃষ্ট হইয়া থাকে। এই সত্যও প্রাচীন আর্য্য জ্যোতির্বিগণ অবগত ছিলেন। খৃষ্টীয় ৫ম শতাব্দীতে আর্য্যভট্ট স্বীয় গ্রন্থে লিখিয়া গিয়াছেন,—"পৃথিবী সচলা কিন্তু স্থির বলিয়া প্রতীয়মান হইয়া থাকে।"‡ তিনি অন্যস্থানে আরও পরিষ্কার করিয়া পৃথিবীর গতির কথা বলিয়াছেন,—"খুব প্রবল বেগে নৌকা চলিতে থাকিলে আরোহীদিগের নিকট বোধ হয় তীরের গাছ-সকল বিপরীত দিকে ছুটিতেছে; কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। পৃথিবীও তেমনি প্রবল বেগে ভ্রমণ করিতেছে। কিন্তু আমরা ইহার গতি অনুভব করিতে পারি না।"

---

* মূর্ত্তো ধর্ত্তা চেদ্ধরিত্র্যা স্তদন্যস্তস্যাপ্য ন্যোঽপ্যেবমত্রানবস্থা।
অন্ত্যে কল্প্যা চেৎ স্বশক্তিঃ কিমাদ্যে কিং নো ভূমিঃ সাষ্ট মূর্ত্তেশ্চ মূর্ত্তিঃ॥

‡ চলা পৃথ্বী স্থিরা ভাতি।

পৃথিবী ২৩ ঘণ্টা ৫৬ মিনিটে আপন মেরুদণ্ডের চারিদিকে এক-বার ঘুরে। উহাকে পৃথিবীর আহ্নিক গতি কহে। পৃথিবী গোল বলিয়া উহার সকল দিকে একবারে সূর্য্যের আলোক পড়ে না। যখন যে ভাগ আলোকিত হয় তখন সেই ভাগে দিবা; আর অন্ধকারময় ভাগে রাত্রি থাকে। পৃথিবী সর্ব্বদা ঘুরিতেছে, এইজন্য সকল স্থানেই পর্য্যায়ক্রমে এইরূপ দিবা-রাত্রি হইতেছে। এই তথ্যও প্রাচীন হিন্দু জ্যোতিষীরা অবগত ছিলেন।

দিবা, রাত্রি ও বৎসর।

পৃথিবী এক স্থানে থাকিয়া আপন মেরুদণ্ডের চারিদিকে আবর্ত্তন করে না। গাড়ীর চাকা যেমন আবর্ত্তন করিতে করিতে পথ অতিক্রম করে, পৃথিবীও সেইরূপ আবর্ত্তন করিতে করিতে শূন্যে বৃত্তাভাস পথে সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিয়া থাকে। পৃথিবী প্রতি সেকেণ্ডে ১৮ মাইল গতিতে চলিতেছে। সূর্য্যকে একবার প্রদক্ষিণ করিয়া আসিতে পৃথিবী আপন মেরুদণ্ডের চারিদিকে প্রায় ৩৬৫ বার আবর্ত্তন করে; অর্থাৎ ৩৬৫ দিনমানে আমাদের এক বৎসর হয়।

ঋতু প্রধানতঃ দুইটী, শীত ও গ্রীষ্ম। অন্যান্য ঋতুগুলি ইহাদেরই মাঝামাঝি অবস্থা। শৈত্য ও তাপের তারতম্য অনুসারে আমরা ঋতুর বিভাগ করিয়াছি। গ্রীষ্ম কালের প্রখর উত্তাপে অধিকতর জল বাষ্প হইয়া আকাশে উঠে, এই জন্য গ্রীষ্মের পরই সেই জল বৃষ্টিরূপে পৃথিবীতে পতিত হয়; তখন বর্ষা কাল। বর্ষার শেষ শরৎ, শীতের প্রারম্ভ ভাগ হেমন্ত, শীত ও গ্রীষ্মের মধ্যকাল বসন্ত। সূর্য্যের কিরণের ইতরবিশেষ হয় বলিয়াই ঋতু-ভেদ হইয়া থাকে।

ঋতু-পরিবর্ত্তন।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, পৃথিবী এক সময়ে জলন্ত বাষ্পপিণ্ডের ন্যায় ছিল। তখন উহা ঠিক সূর্য্যের মতই উজ্জ্বল ছিল। এখন ঠাণ্ডা হইয়া

গিয়াছে। সূর্য্যও কালে পৃথিবীর মত ঠাণ্ডা হইবে; তবে সূর্য্য খুব প্রকাণ্ড কিনা, তাই ঠাণ্ডা হইতে অনেক সময় লাগিবে। ছোট গ্রহগুলি সব ঠাণ্ডা হইয়া গিয়াছে। চন্দ্রের আগ্নেয় পর্ব্বতগুলিও নিবিয়া গিয়াছে। পৃথিবীর ভিতরে এখনও পূর্ব্বের তাপ আছে।

পৃথিবীর প্রাকৃতিক অবস্থা।

যতই ভূ-গর্ভে যাওয়া যায় ততই অধিক উত্তাপ অনুভূত হয়। আগে পৃথিবীর উপরিভাগ এত উত্তপ্ত ছিল যে তাহাতে বৃষ্টি পড়িবামাত্র তখনই বাষ্প হইয়া উড়িয়া যাইত। এখন পৃথিবীর বাহিরের কতকটা অংশ জমাট বাঁধিয়া একটা খোলার মত হইয়াছে, তথাপি মাঝে মাঝে আগ্নেয়গিরির ভিতর দিয়া ভূ-গর্ভ হইতে উত্তপ্ত বাষ্প, ধূম, অগ্নিশিখা, উষ্ণজল প্রভৃতি বাহির হইয়া থাকে। পণ্ডিতেরা বলেন, ভূ-গর্ভের ৩০ মাইল নীচে এত উত্তাপ যে এক মিনিটে সোণা, রূপা প্রভৃতি ধাতু দ্রব হইয়া যায়।

পৃথিবীর যে কঠিন আবরণের উপর আমরা আছি তাহার নাম ভূ-পৃষ্ঠ (crust)। ইহা কতকগুলি মাটি এবং পাথরের স্তর দ্বারা গঠিত। কূপ কিম্বা পুকুর কাটিবার সময় নানা বর্ণের মাটির স্তরগুলি পরিষ্কার দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ সকল স্তর একরূপ নহে, উহারা

ভূ-পৃষ্ঠ।

ভিন্ন ভিন্ন পদার্থে গঠিত। এক এক স্তর প্রস্তুত হইতে হাজার হাজার বৎসর লাগিয়াছে। ঐ সকল স্তর খুঁড়িলে প্রাচীন কালের গাছপালা ও জীব-জন্তুর চিহ্ন পাওয়া যায়। আমরা যেমন 'এল্‌বামে' আত্মীয় স্বজনের 'ফটো' রাখি, তেমনি প্রকৃতি স্থানে স্থানে স্তরে স্তরে আপন সন্তানের কঙ্কাল গুলি বেশ করিয়া সাজাইয়া রাখিয়াছে।

আমরা যে কয়লা পোড়াই মাটির নীচে তাহারও স্তর আছে। ঐ কয়লা উদ্ভিদ্‌ হইতে হইয়াছে। বড় বড় বন এককালে মাটির

নীচে পড়িয়া গিয়াছিল। সেইগুলি বহুদিনে পাথুরে কয়লা হইয়া গিয়াছে। পণ্ডিতেরা বলেন, ৬০ ফিট্ পুরু কয়লার স্তর হইতে লক্ষ বৎসরের অধিক লাগে। কয়লার খনিতে ১২০ ফিট্ পুরু কয়লার স্তরও পাওয়া গিয়াছে। এখন অনুমান কর, পৃথিবীর বয়স কত? মাটির স্তরের কথাতো ধরাই হইল না।

পৃথিবীর বয়স।

পৃথিবীর পৃষ্ঠে যে কত পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে তাহা আমরা কল্পনাও করিতে পারি না। পৃথিবীর সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ যে হিমালয় পর্ব্বত, উহার শিখরেও সমুদ্রের শম্বুকাদির অস্থি পাওয়া গিয়াছে। ইহাতে স্পষ্টই বোধ হয়, হিমালয় কোন কালে সমুদ্রগর্ভে অবস্থিত ছিল। শিবালিক পর্ব্বতে প্রকাণ্ড কচ্ছপের কঙ্কাল দেখিয়া পণ্ডিতেরা স্থির করিয়াছেন উহা পূর্ব্বে জলমগ্ন ছিল। সমগ্র সুন্দরবন এক-কালে সমুদ্র-গর্ভে ছিল। গঙ্গানদীর পলিমাটি দ্বারা ঐ ভূ-ভাগ নির্ম্মিত হইয়াছে। এসিয়ার গোবি ও আফ্রিকার সাহারা মরুভূমি, কোন সময়ে সমুদ্রে নিমগ্ন ছিল। সমগ্র ইউরুপখণ্ড সমুদ্র-গর্ভ হইতে উত্থিত হইয়াছে। অতি পূর্ব্বে পৃথিবীতে জীব-জন্তু কিছুই ছিল না। মানুষ তো দূরের কথা। প্রথম বোধ হয় গাছপালাই হইয়া ছিল। তারপর নানা প্রকার পোকা, তারপর মাছ, তারপর বড় বড় জন্তুর জন্ম হয়। মানুষের আবির্ভাব অনেক পরে হইয়াছে।

সেকালের কথা।

পৃথিবী যখন বাষ্পাকার ছিল তখন উহার আয়তন আরও অনেক বৃহৎ ছিল। তাপ হ্রাস হেতু উহার অবয়ব সঙ্কুচিত হইয়াছে।

মঙ্গল।

মঙ্গল পৃথিবীর অতি নিকটবর্ত্তী প্রতিবেশী। এই জন্যই মঙ্গল সম্বন্ধে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় জানা গিয়াছে। চন্দ্র ব্যতীত অন্য কোন জ্যোতিষ্কের অবস্থা এরূপ বিশদভাবে জানা যায় নাই।

মঙ্গলকে খালিচক্ষে একটী উজ্জ্বল নক্ষত্রের ন্যায় প্রতীয়মান হয়। কিন্তু মঙ্গলের রং লাল।* সুতরাং মঙ্গলকে দেখিয়া সহজেই চিনিতে পারা যায়। একটু গোল হইবারও সম্ভাবনা আছে; কারণ, কয়েকটী নক্ষত্র আছে উহারা দেখিতে লালচে এবং বৃহৎ ও উজ্জ্বল। উহাদিগকে মঙ্গল বলিয়া ভ্রম হইতে পারে। মঙ্গলের লাল রংএর কারণ নির্দ্ধারিত হয় নাই। কেহ বলেন, মঙ্গলের বায়ু-মণ্ডলের জন্য লাল রং দেখায়।

মঙ্গলের রং।

হর্শেল বলেন, মঙ্গলের উপাদানের জন্য উহার রং লালচে। ৮ বৎসর ৭ মাস পরে মঙ্গলের উজ্জ্বলতা খুব বৃদ্ধি পায়। তখন উহাকে সুনীল আকাশের গায় বড়ই রমণীয় দেখায়। ১৭১৯ খৃষ্টাব্দে মঙ্গলের উজ্জ্বলতা এরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছিল যে উহাকে দেখিয়া অনেকেই বিস্মিত হইয়াছিলেন।

মঙ্গল, সূর্য্য হইতে ১৪১৬৫০০০০ চৌদ্দ কোটি ষোল লক্ষ পঞ্চাশ হাজার মাইল দূরে থাকিয়া নির্দ্দিষ্ট পথে সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করে। সূর্য্যকে একবার প্রদক্ষিণ করিতে মঙ্গলের ৬৮৭ দিন লাগে। সুতরাং ৬৮৭ দিনে মঙ্গলের এক বৎসর হয়।

মঙ্গলের দূরত্ব, দিন ও বৎসর।

---

* এই রমণীয় গ্রহটী হিন্দুদিগের কিরূপ মনোরঞ্জন করিয়াছিল, মঙ্গলের ধ্যান পড়িলে বুঝা যাইবে;—"ধরণী গর্ভ সম্ভূতং বিদ্যুৎ পুঞ্জসম প্রভম্
কুমারং শক্তিহস্তঞ্চ লোহিতাঙ্গং নমাম্যহম্।
এই ধ্যান পাঠে জানা যায় যে প্রাচীনকালেও মঙ্গলের রং লোহিত ছিল।

মঙ্গল যখন পৃথিবীর খুব নিকটে আইসে তখন পৃথিবী হইতে উহার দুরত্ব তিন কোটি ছাপ্পান লক্ষ মাইলের অধিক হইবে না। অনন্ত আকাশের তুলনায় এই দুরত্ব অতি সামান্ত। এই জন্তই মঙ্গলকে পৃথিবীর অতি নিকটবর্ত্তী প্রতিবেশী বলিয়াছি।

মঙ্গল পৃথিবী অপেক্ষা অনেক ক্ষুদ্র। মঙ্গলের ব্যাস প্রায় ৪২১১ মাইল আর পৃথিবীর ব্যাস প্রায় ৭৯১৬ মাইল। সুতরাং মঙ্গলের ব্যাস পৃথিবীর ব্যাসের অর্দ্ধেক হইতে কিছু অধিক। পৃথিবী হইতে চন্দ্র যত দূরে, মঙ্গল তাহার একশত গুণ অধিক দূরে। চন্দ্রের পৃষ্ঠের গিরিগহ্বর যেমন সুস্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়, মঙ্গলের পৃষ্ঠের কোন পদার্থই তদ্রূপ দেখিতে পাওয়া যায় না।

এমন দূরবীক্ষণ আছে, যাহার সাহায্যে চন্দ্রপৃষ্ঠে হস্তীর ন্যায় বৃহৎ কোন প্রাণী থাকিলে তাহা দৃষ্টিগোচর হইবে। কিন্তু মঙ্গলের পৃষ্ঠভাগ তত স্পষ্ট দেখা যায় না। এই জন্য চন্দ্রের যেমন সুন্দর মানচিত্র প্রস্তুত হইয়াছে মঙ্গলের তেমন সুন্দর মানচিত্র তৈয়ার করা যায় নাই। তথাপি মঙ্গল সম্বন্ধে অনেক কৌতূহলজনক বিষয় অবগত হওয়া গিয়াছে।

মঙ্গল যেমন পৃথিবীর নিকটবর্ত্তী প্রতিবেশী তেমন পৃথিবীর সহিত মঙ্গলের প্রাকৃতিক সাদৃশ্য রহিয়াছে। পৃথিবী যেমন আপন মেরু-দণ্ডের চারিদিকে ঘুরিতে ঘুরিতে সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করে, মঙ্গলও সেই-রূপেই সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিয়া থাকে। সুতরাং মঙ্গলের সকল দিকই সূর্য্যকিরণে উদ্ভাসিত হয়। আপন মেরুদণ্ডের চারিদিকে এক বার ঘুরিতে মঙ্গলের ২৪ ঘণ্টা ৩৭ মিনিট সময় লাগে অর্থাৎ ২৪ ঘণ্টা ৩৭ মিনিটে মঙ্গলের এক দিন হয়। অতএব দেখা যাইতেছে, পৃথিবীর দিন হইতে মঙ্গলের দিন মাত্র আধ ঘণ্টা বড়।

অতি প্রাচীনকাল হইতেই জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ মঙ্গলের দুই মেরু প্রদেশে অতি বিস্তৃত সাদা চিহ্ন দেখিয়া আসিতে ছিলেন। কিন্তু তখন

মঙ্গলের মেরু-প্রান্তে বরফ।
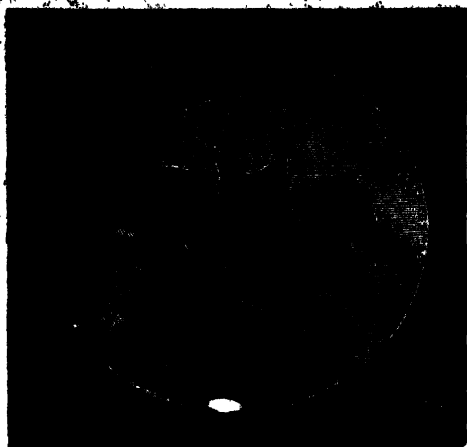
উহার কোন কারণ নির্দ্ধারিত হয় নাই। সে কালের জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ ঐ সাদা চিহ্নের কোন কারণ স্থির করিতে তো পারেনই নাই অধিকন্তু তাঁহারা একটা ব্যাপার দেখিয়া অধিকতর বিস্মিত এবং কৌতূহলাক্রান্ত হইয়াছিলেন। তাঁহারা দেখিয়াছিলেন, সাদা চিহ্নগুলি সারা বৎসর থাকে না। কয়েক মাস থাকিয়া ক্রমে ক্রমে ঐ সকল চিহ্ন অদৃশ্য হইয়া যায়। কিন্তু আবার ঠিক সময়ে দেখা দেয়। অসাধারণ পণ্ডিত স্যার উইলিয়ম্ হর্শেল খুব সূক্ষ্মরূপে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া স্থির করিয়াছেন যে, মঙ্গলের দুই মেরু-প্রান্তে বরফ জমিয়া থাকে। এই জন্যই ঐ সকল স্থান সাদা দেখায়।

মঙ্গলের মেরু-প্রান্তে বরফ।

হর্শেল এই সকল সাদা চিহ্নের নিয়মিত সময়ে আবির্ভাব এবং তিরোভাব দর্শন করিয়াই মনে করিলেন যে, পৃথিবীর ন্যায় মঙ্গলের

দুই মেরু বরফে আচ্ছাদিত হয়, এই জন্য দুই প্রান্ত বিশুভ্র দেখায়। আবার যখন গ্রীষ্মকাল ফিরিয়া আইসে, তখন উত্তাপে বরফ গলিয়া যায়। সুতরাং সে সময়ে মেরু সাদা দেখায় না।

দূরবীক্ষণে মঙ্গলের যে অংশটা নীলবর্ণ দেখা যায় পণ্ডিতেরা উহাকে সমুদ্র বলিয়া মনে করেন। কারণ, সমুদ্র দূর হইতে সুনীল দেখায়। কথিত সমুদ্র হইতে অসংখ্য রেখা জালের ন্যায় মঙ্গলের স্থলভাগ আচ্ছাদিত করিয়া রহিয়াছে। কোন কোন স্থানে ঐ রেখা প্রায় সহস্র মাইল বিস্তৃত। ইটালীর একজন জ্যোতির্ব্বিদ্ পণ্ডিত (Schiaparelli) ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে ঐ রেখাগুলি প্রথম আবিষ্কার করেন।

মঙ্গলের বিচিত্র খাল।
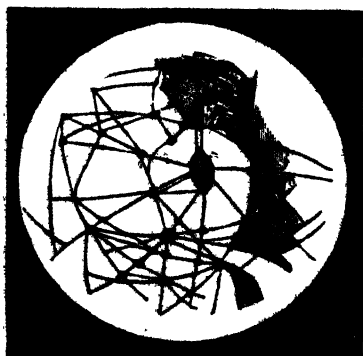
মঙ্গলের বিচিত্র খাল।

তারপর দূরবীক্ষণ দ্বারা অনেকেই সেই রেখাগুলি প্রত্যক্ষ করিলেন। অনেক গবেষণার পর স্থিরীকৃত হইল যে, ঐ রেখাগুলি মঙ্গলের পৃষ্ঠস্থ খাল। ইহার কিছুকাল পরে মঙ্গলের গায় আরও কতকগুলি খালের চিহ্ন দৃষ্টিগোচর হইল। এই গুলি পূর্ব্বে ছিল না। অধিকন্তর

আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, নূতন আবিষ্কৃত রেখাগুলি পুর্ব্বের আবিষ্কৃত রেখার সহিত ঠিক সমান্তরালভাবে অবস্থিত! একটী রেখাও একটু এদিক ওদিক যায় নাই। ঐ নূতন রেখাগুলি দেখিয়া পণ্ডিতেরা একবারে অবাক্ হইয়া গেলেন। আবার যেখানে দুই তিনটী খাল মিলিত হইয়াছে, তথায় কাল কাল দাগ দেখিতে পাওয়া যায়। পণ্ডিতেরা অনুমান করেন ঐ গুলি মঙ্গলের বড় বড় সহর।

তাঁহারা সিদ্ধান্ত করিলেন, মঙ্গলে নিশ্চয়ই মানুষ আছে। এই খালগুলি উহাদেরই কীর্ত্তি। নৈসর্গিক কারণে এইরূপ খাল নির্ম্মিত হইতে পারে না। বাস্তবিক খালগুলির অবস্থান দেখিলেই ধারণা জন্মিবার কথা যে, ঐ সকল খাল কেহ বুদ্ধি খাটাইয়া পছন্দমত কাটিয়াছে।

এক একটা খাল প্রকাণ্ড—হাজার হাজার মাইল লম্বা। আর কোনটীই প্রস্থে ৬০। ৭০ মাইলের কম হইবে না। ঐ সুবৃহৎ খাল-গুলি দেখিয়া কোন কোন পণ্ডিত অনুমান করিয়াছেন যে, মঙ্গলের লোকেরা খুব শক্তিশালী এবং বুদ্ধিমান। তথায় অনেক ভাল ভাল 'ইঞ্জিনিয়ার' আছে। আর মঙ্গলের বিচিত্র সহরগুলি নির্ম্মাণে মঙ্গলের অধিবাসীরা না জানি কত কৌশল প্রদর্শন করিয়াছে!

বাস্তবিক মঙ্গলের পৃষ্ঠস্থিত রেখাগুলি অতীব কৌতূহলজনক। কিন্তু ঐ রেখা সম্বন্ধে এ পর্য্যন্ত কোন স্থির সিদ্ধান্ত হয় নাই। কেবল অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া পণ্ডিতেরা নানারূপ ব্যাখ্যা প্রদান করিতেছেন। কেহ কেহ বলেন, ঐ রেখাগুলি কিছুই নহে, কেবল দৃষ্টি-বিভ্রম (Optical deception) মাত্র। মঙ্গলের সুবিস্তৃত সমুদ্রে আলোক-রশ্মি পতিত হইয়া এই সকল রেখা উৎপাদন করে। আবার কেহ বলেন, শীতকালে মঙ্গলের দুই প্রান্তে যে পুঞ্জীভূত বরফ জমাট বাঁধিয়া থাকে উহাই গলিয়া নানাপথে সমুদ্রে আসিয়া পতিত হয়।

পৃথিবী হইতে ঐ সকল গলিত বরফরাশিকেই রেখার ন্যায় দৃষ্টিগোচর হয়। ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে মঙ্গল পৃথিবীর খুব নিকটবর্ত্তী হইয়াছিল। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দেও মঙ্গল পৃথিবীর নিকটবর্ত্তী হয়। আবার ১৯১০ খৃঃ সেপ্টেম্বর মাসে ঐ গ্রহ পৃথিবীর যথাসম্ভব নিকটে আইসে। সুতরাং তখন ঐ গ্রহটী সুস্পষ্টরূপে পর্য্যবেক্ষণের খুব সুবিধা হইয়াছিল। শেষোক্ত বার জ্যোতির্ব্বিদেরা পরীক্ষা করিয়া বলিয়াছেন,—মঙ্গলের প্রাকৃতিক অবস্থার ভয়ানক পরিবর্ত্তন হইয়াছে। সেখানে এমন একটা নৈসর্গিক উৎপাত হইয়াছে যে, উহার তুলনায় ভীষণ ভূমিকম্পও সামান্য ব্যাপার! একটা পীতবর্ণ আবরণে মঙ্গলের পৃষ্ঠ ঢাকা দেখা যায়। খাল গুলি অদৃশ্য হইয়াছে! দক্ষিণ মেরুটা যেন ফাটিয়া গিয়াছে!

পৃথিবী অপেক্ষা মঙ্গল আয়তনে অনেক ক্ষুদ্র এবং উহার জিনিসও (mass) কম। জিনিসের অল্পতা হেতু মঙ্গলের মাধ্যাকর্ষণও পৃথিবী হইতে কম। পৃথিবীতে একটী পদার্থের যত ওজন হয় মঙ্গলে তাহার অর্দ্ধেক ওজন হইবে। যে ব্যক্তি পৃথিবীপৃষ্ঠে একমণ সামগ্রী উঠাইতে পারে, সে মঙ্গলে গেলে দুইমণ সামগ্রী উঠাইতে পারিবে।

পৃথিবীর একটী চন্দ্র আছে, মঙ্গলের পরবর্ত্তী গ্রহ বৃহস্পতির পাঁচটী চন্দ্র আছে। পৃথিবী ও বৃহস্পতির মধ্যবর্ত্তী মঙ্গল সুতরাং উহার কি একটী চন্দ্রও নাই? মঙ্গল পৃথিবী অপেক্ষা ক্ষুদ্র, বৃহস্পতি অপেক্ষা আরও বেশী ক্ষুদ্র, মঙ্গলের চন্দ্র না হয় উহাদের চন্দ্র অপেক্ষা খুব ছোটই হইল, তথাপি উহার কি চন্দ্র থাকা উচিত ছিল না? ইহা জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণের চিন্তার বিষয় হইল। কেবল অনুমানের উপর

মঙ্গলের চন্দ্রদ্বয়।

নির্ভর করিয়া বহু শতাব্দী পর্য্যন্ত তাঁহারা মঙ্গলের চন্দ্র খুঁজিতে লাগিলেন। কেহ হয়ত শুনিয়া বলিবেন, জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণের কি খেয়াল! পৃথিবী এবং বৃহস্পতির

চন্দ্র আছে বলিয়া যে মঙ্গলেরও চন্দ্র থাকিতে হইবে এরূপ সিদ্ধান্ত করা নিতান্তই হাস্যজনক। কিন্তু পণ্ডিতেরা তাঁহাদিগের খেয়াল ছাড়িলেন না। তাঁহারা কোন কথায় কর্ণপাত না করিয়া নিবিষ্টচিত্তে পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। শতাব্দী ব্যাপিয়া পরীক্ষা চলিল! কিন্তু যখন কিছুতেই মঙ্গলের চন্দ্রের সন্ধান পাওয়া গেল না, তখন তাঁহারা স্থির করিলেন, মঙ্গলের চন্দ্র নাই। এই স্থানে প্রকৃতির সুশৃঙ্খলা ভঙ্গ হইয়াছে।

বহু বর্ষ চলিয়া গেল আর কেহ মঙ্গলের চন্দ্রের অনুসন্ধান করিলেন না। অবশেষে ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে আমেরিকার ওয়াশিংটন মানমন্দিরের সুপ্রসিদ্ধ জ্যোতির্বিদ্ পণ্ডিত মিঃ হল (Hall) মঙ্গলের দুইটী চন্দ্র আবিষ্কার করেন। 'হলে'র দূরবীক্ষণ খুব উৎকৃষ্ট ছিল, এবং তিনি যে বৎসর চন্দ্র আবিষ্কার করেন, সেই বৎসর মঙ্গল পৃথিবীর খুব নিকটবর্ত্তী হইয়াছিল। এই দুই কারণেই তাঁহার সুবিধা হইয়াছিল।

মঙ্গল স্বয়ংই ক্ষুদ্র; সুতরাং উহার উপগ্রহ বা চন্দ্র যে খুবই ক্ষুদ্র হইবে সে বিষয় আর সন্দেহ কি? যদি মঙ্গলের চন্দ্র পৃথিবীর চন্দ্রের শতভাগের এক ভাগও হইত তাহা হইলে উহা বহু পূর্ব্বেই ধরা পড়িত।

মঙ্গলের একটী চন্দ্র খুব নিকটে আর একটী কিছু দূরে। নিকট-বর্ত্তী চন্দ্রের নাম ফোবস্ (Phobos), আর দূরবর্ত্তী চন্দ্রের নাম ডিমস্ (Deimos)। পূর্ব্বকালের গ্রীসের লোকেরা মঙ্গলকে রণ-দেবতা (Mars) বলিত। মঙ্গল রথে চড়িয়া আকাশে ভ্রমণ করেন। ডিমস্ ও ফোবস্ নামক তাঁহার দুইটী ভৃত্য রথের ঘোড়া দুইটী জুড়িয়া দেয় এবং প্রভুর সঙ্গে সঙ্গে থাকে। আধুনিক পণ্ডিতেরা সেই জন্যই মঙ্গলের চন্দ্র দুইটীর নাম ডিমস্ ও ফোবস্ রাখিয়াছেন।

মঙ্গলের নিকটবর্ত্তী ফোবস্ (Phobos) নামক চন্দ্রটী একবারে সৃষ্টিছাড়া। আর কোন চন্দ্রের সহিত উহার গতির সাদৃশ্য নাই।

পৃথিবী সাতাইশ বার নিজ মেরুদণ্ডের চারিদিকে ঘুরিলে উহার চন্দ্র একবার পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে। বৃহস্পতি ও শনির চন্দ্রের গতিও প্রায় তদ্রূপ। মঙ্গলের উপগ্রহ ভিন্ন অন্য কোন উপগ্রহের গতি গ্রহের গতি অপেক্ষা অধিকতর দ্রুত দেখা যায় নাই। মঙ্গলের একবার পাক দিতে যে সময় লাগে সেই সময়ের মধ্যে তাহার নিকটবর্ত্তী চন্দ্রটী মঙ্গলের চারিদিকে তিনবার ঘুরিয়া আইসে।

আবার চন্দ্র দুইটীর গতি পরস্পরের বিপরীত। ফোবস্ পশ্চিমে উদিত হইয়া পূবে অস্ত যায়। মঙ্গলের ডিমস্ নামক দ্বিতীয় চন্দ্রটী পূর্ব্ব দিকে উদিত হয় এবং পশ্চিম দিকে অস্ত যায়। ডিমস্ ৩০ ঘণ্টা ১৮ মিনিটে মঙ্গলকে প্রদক্ষিণ করে। আমাদের চন্দ্রের হ্রাস-বৃদ্ধি ২৮ দিনের মধ্যে হয় কিন্তু মঙ্গলের নিকটের চন্দ্রটী প্রতি রাত্রেই ষোলকলায় পূর্ণ হয়, আবার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই অদৃশ্য হইয়া পুনরায় বাড়িতে থাকে। আমাদের চন্দ্র ২৮ দিনে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করে, মঙ্গলের কাছের চন্দ্রটী মাত্র ৭ ঘণ্টা ৩৯ মিনিটে মঙ্গলকে একবার প্রদক্ষিণ করে।

তোমরা হয়তো মনে করিতেছ, তোমরা মঙ্গলের লোক হইলে রাত্রিতে দুইটী চন্দ্র একথারে আকাশে দেখিতে পাইতে, আর সেখানের আকাশের রমণীয় শোভা দেখিয়া সুখী হইতে। কিন্তু মঙ্গলের দূরের চন্দ্রটী মঙ্গল হইতে তারার মত দেখা যাইবে, আর কাছের চন্দ্রটীর আলোকও আমাদের চন্দ্রের তুলনায় খুবই কম। মঙ্গলের দুইটী চন্দ্র একত্র উদিত হইলেও আমাদের চন্দ্রের ন্যায় এত উজ্জ্বল আলোক বিকীরণ করিবে না। কারণ চন্দ্র দুইটীই অতি ক্ষুদ্র।

মঙ্গলে লোক আছে কি? সুনীল অনন্ত আকাশের জ্যোতিষ্করাজি কি সকলই জন-শূন্য? কেবল কি এক পৃথিবীতেই লোক বাস করিতেছে? এ সকল প্রশ্নের উত্তর এ পর্য্যন্ত কেহ দিতে সমর্থ

হয় নাই। হয় ত প্রত্যেক গ্রহেই উহার প্রাকৃতিক অবস্থার উপযোগী করিয়া ভগবান্ লোক সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছেন; আমরা উহাদের কোন তত্ত্বই রাখি না।

মঙ্গলের অধিবাসী।

অধ্যাপক পিকারিং সঙ্কেতে মঙ্গলের অধিবাসীদিগের সহিত আলাপ করিবার জন্ম নানা প্রকার উপায় উদ্ভাবন করিতেছেন। কিন্তু এ পর্য্যন্ত কোন ফল হয় নাই। কেহ কেহ তার-হীন (wireless) টেলিগ্রাফীতে মঙ্গলের লোকের সহিত আলাপ সম্ভব হইবে মনে করিতেছেন!

মঙ্গলে পৃথিবীর ন্যায় জল আছে, বায়ু আছে, মেঘ হয়, বারিপাত হয়, বরফ জন্মে। সুতরাং এরূপ নৈসর্গিক অবস্থায় আমাদের ন্যায় লোক মঙ্গলে থাকা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। আমাদের পৃথিবীর তিনভাগ জল একভাগ স্থল, কিন্তু মঙ্গলের তিনভাগ স্থল এক ভাগ জল। এই জন্ম কেহ কেহ বলেন, মঙ্গলের লোকেরা বড় বড় খাল কাটিয়া জলের অভাব দূর করিতেছে।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রহ।

(সিরিস্, পেলাস্, যুনো, ভেষ্টা প্রভৃতি।)

আমাদের প্রাচীন জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ দূরবীক্ষণের সাহায্য ছাড়া কেবল অধ্যবসায়ের সহিত পর্য্যবেক্ষণ করিয়াই অনেকগুলি গ্রহ ও নক্ষত্র আবিষ্কার করিয়াছিলেন। গ্রহ ও নক্ষত্র আবিষ্কার করিয়াই তাঁহারা নিশ্চেষ্ট থাকেন নাই; উহাদের স্থান, গতি ও প্রকৃতি সম্বন্ধেও অনেক তথ্য তাঁহারা অভ্রান্তরূপে নির্ণয় করিয়াছিলেন।

গ্রহদিগের মধ্যে বুধ, শুক্র, পৃথিবী, মঙ্গল, বৃহস্পতি ও শনি এই কয়টী গ্রহই তাঁহাদের পরিচিত ছিল। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ দূরবীক্ষণের আবিষ্কারের পর নূতন অনেকগুলি গ্রহ আবিষ্কার করিয়াছেন। চিরপরিচিত গ্রহগুলি ব্যতীত সৌর-জগতে আরও গ্রহ থাকিতে পারে; বহু শতাব্দী পর্য্যন্ত একথা কাহারও মনে উদয় হয় নাই।

যেরূপে ঐ সকল গ্রহ আবিষ্কৃত হইয়াছে, সেই ইতিহাস শুধু কৌতূহলপ্রদ নহে, উহা মানবের অপরিসীম জ্ঞান ও বুদ্ধির প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

পণ্ডিত কেপ্‌লার (Kepler) সৌর-জগতের গ্রহসংস্থান নিবিষ্ট-চিত্তে পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলেন যে, মঙ্গল ও বৃহস্পতির মধ্যে যে ব্যবধান তাহা অন্যান্য গ্রহগণের ক্রমিক দূরত্বের তুলনায় অত্যন্ত অধিক। যদি উহাদের মধ্যে একটী গ্রহ থাকিত তাহা হইলে সূর্য্য হইতে সকল গ্রহের ক্রমিক দূরত্বের অনুপাত ঠিক হইত। মঙ্গল ও বৃহস্পতির মধ্যের ব্যবধান অধিক হওয়ায় গ্রহগণের দূরত্বের শৃঙ্খলা ভঙ্গ হইয়াছে। নতুবা আর সকল গ্রহের দূরত্বই সাধারণ অনুপাতের অনুযায়ী। এই ব্যতিক্রম দেখিয়া কেপ্‌লার প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, "এই দুই গ্রহের মধ্যে আর একটী গ্রহ অদৃশ্য রহিয়াছে। একদিন না একদিন সেই গ্রহ ধরা দিবে।" কেপ্‌লারের এই উক্তির পর দুই শতাব্দী অতিবাহিত হইয়া গেল; তাঁহার ভবিষ্যদ্বাণী সত্য বলিয়া প্রমাণিত হইল না। তখন অনেকেই কেপলারের কথা কল্পনা বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন।

কেপলারের ভবিষ্যদ্বাণী।

১৭৮১ খৃষ্টাব্দে ইউরেনাস্ আবিষ্কৃত হইলে দেখা গেল, গ্রহদিগের ক্রমিক দূরত্বের যে অনুপাত আছে, সেই অনুপাত অনুসারে শনি হইতে আর একটী গ্রহ যত দূরে থাকা উচিত, ইউরেনাস্ ঠিক তত

দূরেই আছে ; অর্থাৎ শনি হইতে ইউরেনাসের দূরত্ব সাধারণ নিয়মের অনুরূপ;—কোনই ব্যতিক্রম ঘটে নাই।* এই দূরত্বের শৃঙ্খলা দেখিয়া মঙ্গল হইতে বৃহস্পতির অসাধারণ ব্যবধানের কথা জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণের আবার মনে পড়িল।

বোডের নিয়ম।

অধ্যাপক বোড্ (Bode) গ্রহদিগের ক্রমিক দূরত্ব নির্দ্ধারণের একটী সাধারাণ নিয়ম বাহির করিলেন, নিয়মটী এই—

প্রথমে এই সংখ্যাগুলি সাজাও—	০, ৩, ৬, ১২, ২৪, ৪৮, ৯৬, ১৯২, ৩৮৪, ইত্যাদি।
প্রত্যেক সংখ্যার সহিত ৪ যোগ কর-	৪ ৪ ৪ ৪ ৪ ৪ ৪ ৪ ৪
যোগফল—	৪, ৭, ১০, ১৬, ২৮, ৫২, ১০০, ১৯৬, ৩৮০

যদি ১০ সংখ্যা সূর্য্য হইতে পৃথিবীর দূরত্ব বলিয়া ধরা যায়, তাহা হইলে অপর সংখ্যাগুলি সূর্য্য হইতে অন্যান্য গ্রহের দূরত্বের অনুপাত প্রায় যথাযথ নির্দ্দেশ করিবে, যথা—

বুধ,	শুক্র,	পৃথিবী,	মঙ্গল,	—	বৃহস্পতি,	শনি,	ইউরেনাস্,
৪	৭	১০	১৬	২৮	৫২	১০০	১৯৬

উপরে প্রদত্ত সংখ্যাগুলি সূর্য্য হইতে প্রত্যেক গ্রহের দূরত্বের অনুপাত নির্দ্দেশ করিতেছে।

কিন্তু পঞ্চম স্থান অর্থাৎ ২৮ যে স্থানের দূরত্বের অনুপাত, সেই স্থানটী শূন্য। সৌর-জগতের গ্রহসকলের দূরত্বের সুশৃঙ্খলা রক্ষার জন্য এই স্থানে একটী গ্রহ থাকা উচিত ছিল। এই স্থানে অর্থাৎ মঙ্গল ও বৃহস্পতির মধ্যে একটী গ্রহ আছে, ইহা গণিতশাস্ত্র বিশারদ কেপ্‌লার বহু পূর্ব্বেই বলিয়াছিলেন। কিন্তু উহার সন্ধান কেহ পায় নাই।

ইউরেনাস্ আবিষ্কারের কয়েক বৎসর পর জ্যোতির্ব্বিদ্ পণ্ডিতেরা

---

* ইউরেনাস্ দেখ।

আবার কেপ্‌লারকথিত গ্রহের অনুসন্ধানে মনোনিবেশ করিলেন। নানা দেশের পণ্ডিতগণ এই কার্য্যে যোগ দিলেন।

গ্রহ আবিষ্কারের ইতিহাস।

প্রথমে তাঁহারা সেই গ্রহটী যে পথ দিয়া বিচরণ করা সম্ভব তাহা নির্দ্ধারণ করিলেন। তৎপর সেই পথটীকে বহু ভাগে বিভক্ত করিয়া এক এক ভাগ এক এক জন পণ্ডিত সূক্ষ্মভাবে পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। অনেকেই তাঁহাদের উদ্যম দেখিয়া পরিহাস করিতে ত্রুটি করিল না, কিন্তু তাঁহারা কেহই ভগ্নোৎসাহ হইলেন না।

সিসিলি দ্বীপের 'পিয়েজি' (Piazzi) নামক জ্যোতির্ব্বিদ্ পণ্ডিত জ্যোতিষ্ক পর্য্যবেক্ষণ-কার্য্যে অতিশয় পারদর্শী ছিলেন। তিনিও কেপ্‌লার কথিত গ্রহের অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। পিয়েজি অচল নক্ষত্ররাজির একটী সুন্দর মানচিত্র প্রস্তুত করিলেন এবং কেপ্‌লার-নির্দ্দিষ্ট স্থানে উক্ত গ্রহের অন্বেষণ আরম্ভ করিলেন।

প্রথম দিনের (১লা জানুয়ারী, ১৮০১ খৃষ্টাব্দ) পরীক্ষায়ই একটী ক্ষুদ্র জ্যোতিষ্ক তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। তিনি স্থির নক্ষত্ররাজির মানচিত্র আলোচনা করিয়া দেখিলেন, যে স্থানে তিনি জ্যোতিষ্কটী দেখিয়াছেন সেই স্থানে নক্ষত্রের কোন চিহ্ন নাই। ইহাতে তাঁহার কৌতূহল উদ্দীপ্ত হইল। তিনি পরদিনও সেই স্থানে দূরবীক্ষণের দৃষ্টি স্থাপন করিলেন। কিন্তু কি আশ্চর্য্য, সে স্থান শূন্য! পূর্ব্বোক্ত স্থানে কোন জ্যোতিষ্কই তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইল না। পিয়েজি তাঁহার দূরবীক্ষণের দৃষ্টি একটু দূরে সরাইয়া ফেলিলেন, আবার সেই জ্যোতিষ্কটী ধরা পড়িল। তখন তিনি বুঝিলেন, এই জ্যোতিষ্কটী নক্ষত্র নহে, একটী গ্রহ হইবে। পিয়েজি নীরবে বহুদিন সেই জ্যোতিষ্কটীকে পর্য্যবেক্ষণ করিলেন। কিন্তু তাঁহার আবিষ্কারের

কথা তিনি প্রকাশ করিয়া বলিতে সাহস পাইলেন না। বহু পণ্ডিত, বহুবর্ষ-ব্যাপী অন্বেষণ করিয়াও যে গ্রহটীকে বাহির করিতে সমর্থ হন নাই, তিনি তাহা এত সহজে আবিষ্কার করিয়াছেন, এই কথা জনসাধারণের নিকট প্রকাশ করিতে তাঁহার হৃদয়ে স্বভাবতঃই সন্দেহ হইতে লাগিল। কিন্তু বারংবার পরীক্ষা করিয়া যখন দেখিলেন যে, উহা গ্রহ ভিন্ন আর কিছুই হইতে পারে না, তখন তিনি সকলের নিকট জ্ঞাপন করিলেন।

এই সংবাদে পণ্ডিতসমাজে মহান্দোলন উপস্থিত হইল। সকলেই দূরবীক্ষণ লইয়া বসিয়া গেলেন। বহু পরীক্ষার পর সকলেই স্বীকার করিলেন, পিয়েজি বাস্তবিকই কেপ্‌লার-উল্লিখিত গ্রহটী আবিষ্কার করিয়াছেন। এতদিনে কেপ্‌লারের ভবিষ্যদ্বাণী সফল হইল! গণিতের গবেষণা জয়যুক্ত হইল!

জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ এই নূতন গ্রহ আবিষ্কারের কথা প্রকাশ করিবার অব্যবহিত পরেই সেই গ্রহটী অদৃশ্য হইয়া গেল! উহাকে খুঁজিয়া আর কোথাও পাওয়া গেল না। গ্রহটীর ভ্রমণ-পথ তখনও নির্দ্দিষ্ট হয় নাই। সুতরাং উহাকে সহজে ধরিবার আর উপায় ছিলনা। ক্ষুদ্র জ্যোতিষ্কটী অগণিত গ্রহ-নক্ষত্রের ভিতর কোথায় লুকাইল আর কেহ তখন তাহার সন্ধান পাইল না। সাধারণ লোকে পণ্ডিতদিগকে বায়ুরোগগ্রস্ত মনে করিয়া উপহাস করিতে লাগিল। কিন্তু এক বৎসর পর আর একজন পণ্ডিত (Gauss) সেই গ্রহটীকে আবার ধরিয়া ফেলিলেন। তখন উহার গতি ও ভ্রমণ-পথ নির্দ্ধারিত হইল। পণ্ডিতেরা এই গ্রহটীর নাম রাখিলেন সিরিস্ (Ceres)।

এই গ্রহটী ঠিক মঙ্গল এবং বৃহস্পতির মধ্যবর্ত্তী। উহা অতিশয় ক্ষুদ্র। ইহার কিছুকাল পর আর একজন পণ্ডিত (Dr. Olbers of-Bremen) পলাস্ (Pallas) নামক সিরিসের সমকক্ষ আর একটী

গ্রহ আবিষ্কার করিয়া সকলকে চমকিত করিলেন। তারপর জ্যোতির্বিদ পণ্ডিতগণ মঙ্গল এবং বৃহস্পতির মাঝে বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র গ্রহ আবিষ্কার করিয়াছেন। এ পর্য্যন্ত এই দুই গ্রহের মাঝে প্রায় সাড়ে চারিশত গ্রহ আবিষ্কৃত হইয়াছে। ভবিষ্যতে হয় তো আরও গ্রহ ধরা পড়িবে।
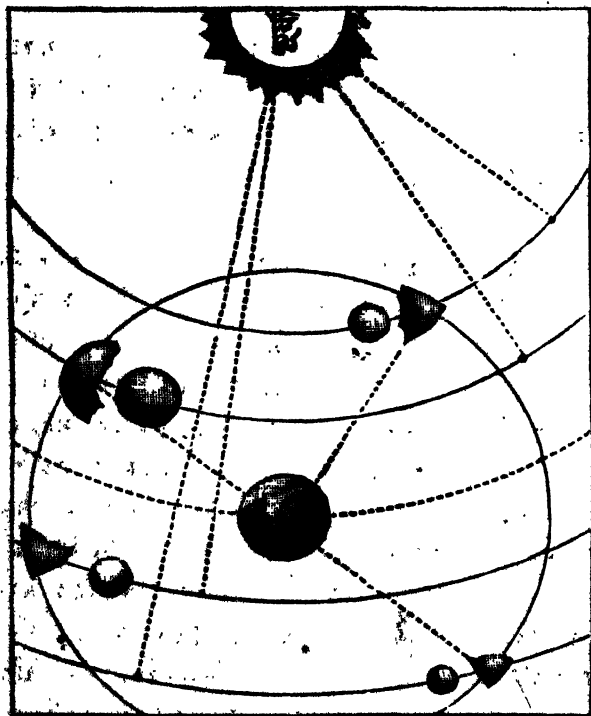
বড় গ্রহটা ভাঙ্গিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রহে পরিণত হইয়াছে।

গ্রহের ধ্বংসাবশেষ।

কেহ কেহ অনুমান করেন, পূর্ব্বে মঙ্গল ও বৃহস্পতির মাঝে একটী বড় গ্রহ ছিল, কোন অপরিজ্ঞাত কারণে ঐ গ্রহটী ফাটিয়া খণ্ড খণ্ড হইয়া যায়। উহার অংশগুলি মাধ্যাকর্ষণ বলে প্রত্যেকেই এক একটী নির্দ্দিষ্ট পথে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রহের ন্যায় সূর্য্যের চারিদিকে পরিভ্রমণ করিতেছে। যদি তাহাই হয় তবে উক্ত গ্রহটী যে নিতান্ত সামান্য ছিল না তাহা তাহার ধ্বংসাবশেষ দেখিয়াই অনুমান করিতে পারা যায়।

ক্ষুদ্র গ্রহ সকলের মধ্যে যে গুলি অপেক্ষাকৃত বৃহৎ উহাদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

গ্রহের নাম	আবিষ্কারক	আবিষ্কার কাল	যত সময়ে সূর্য্য প্রদক্ষিণ করে।
			বৎসর-মাস-দিন
সিরিস্ (Ceres)	পিয়াজি	১৮০১ খৃঃ	৪, ৭, ১১,
পলাস্ (Pallas)	অল্‌বার্স	১৮০১ „	৪, ৭, ১২,
জুনো (Juno)	হার্ডিং	১৮০৪ „	৪, ৪, ১২,
ভেষ্টা (Vesta)	অল্‌বার্স	১৮০৭ „	৩ ৭, ২১,

বৃহস্পতি।

বৃহস্পতি (Jupiter) নামটী পণ্ডিতেরা বড়ই বিবেচনা করিয়া রাখিয়াছিলেন। হিন্দু শাস্ত্রে বৃহস্পতি দেবগুরু, তাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং সর্ব্বাপেক্ষা উজ্জ্বল গ্রহটীর নাম বৃহস্পতি। অন্যান্য গ্রহ অপেক্ষা বৃহস্পতি আয়তনে কত বৃহৎ তাহার আভাস দিতেছি। সৌর-জগতের অপর সকল গ্রহগুলিকে একত্র করিয়া একটী পিণ্ড প্রস্তুত করিলে উহা বৃহস্পতি অপেক্ষা আয়তনে ক্ষুদ্র হইবে। সুবিস্তৃত মহাসাগর, অসংখ্য নদ-নদী ও বিশাল পর্ব্বত-শোভিতা পৃথিবীর ন্যায় সাড়ে বার শত পৃথিবী একত্র করিলেও বৃহস্পতির সমান হইবে না।

বৃহস্পতির আয়তন ও দূরত্ব।

বৃহস্পতি ৪৮৩৬৭৮০০০ আট চল্লিশ কোটী ছয়ত্রিশ লক্ষ আটাত্তর হাজার মাইল দূরে থাকিয়া বৃত্তাভাস পথে সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিতেছে। বৃহস্পতি যখন পৃথিবীর খুব নিকটে আইসে তখনও উহা পৃথিবী হইতে সূর্য্য যতদূরে প্রায় উহার চারি গুণ দূরে থাকে। অর্থাৎ বৃহস্পতি সর্ব্বদাই পৃথিবী হইতে চল্লিশ কোটী মাইলের অধিক দূরে অবস্থিতি করে। এই জন্যই এত বৃহৎ বৃহস্পতিকে দূরস্থিত নক্ষত্রের ন্যায় ক্ষুদ্র দেখায়।

বৃহস্পতির গতি, দিন ও বৎসর।

সূর্য্য হইতে যে গ্রহ যত দূরে সেই গ্রহের গতি তত মৃদু। বুধ সূর্য্যের নিকটতম গ্রহ, উহার গতি সর্ব্বাপেক্ষা দ্রুত। বুধের পর শুক্র, তারপর পৃথিবী ও মঙ্গল; ইহাদের গতি ক্রমশঃ হ্রাস হইয়াছে। বৃহস্পতির গতি উহাদিগের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা মৃদু। পৃথিবী প্রতি সেকেণ্ডে ১৮ মাইল হিসাবে চলে, বৃহস্পতির গতি সেকেণ্ডে ৮ মাইল মাত্র।

বৃহস্পতি পূর্ব্বোল্লিখিত গ্রহসমূহের তুলনায় অধিকতর দূরবর্ত্তী এইজন্য উহার ভ্রমণ-পথও বড় এবং উহার গতিও দূরত্বের অনুপাতে মৃদু। এই দুই কারণেই সূর্য্যকে একবার প্রদক্ষিণ করিয়া আসিতে বৃহস্পতির প্রায় আমাদের ১২ বৎসর সময় লাগে। অর্থাৎ আমাদের ১২ বৎসরে বৃহস্পতির এক বৎসর হয়।

বৃহস্পতির গতি খুব মৃদু বলিয়াছি, কিন্তু উহা আপন মেরুদণ্ডের চারিদিকে অতিশয় দ্রুত পরিভ্রমণ করে। পৃথিবী ২৪ ঘণ্টায় একবার আবর্ত্তন করে অর্থাৎ ২৪ ঘণ্টায় পৃথিবীর এক দিবস হয়; বৃহস্পতি ১০ ঘণ্টায় একবার আপন মেরুদণ্ডের চারিদিকে আবর্ত্তন করে। সেইজন্য বৃহস্পতির দিবস আমাদের ১০ ঘণ্টা দীর্ঘ। এত তাড়াতাড়ি ঘুরিবার দরুণ বৃহস্পতির মধ্যভাগটা ফুলিয়া গিয়াছে এবং উহার দেহটী কিছু বাদামী ধরণের হইয়াছে।

বৃহস্পতির মধ্যভাগ এতটা স্ফীত হইবার কারণ তোমরা অতি সহজেই বুঝিতে পারিবে। কাদার ন্যায় নরম পদার্থ নির্ম্মিত একটী 'বলের' ভিতর দিয়া একটী শলাকা ঢুকাইয়া যদি দ্রুত ঘুরাণ যায়, তাহা হইলে সেই বল্‌টার দুই প্রান্ত ক্রমেই চাপা হইয়া যাইবে এবং মধ্য ভাগ স্ফীত হইবে। কেন্দ্রাপসারিণী গতিই (centrefugal force) ইহার একমাত্র কারণ। পূর্ব্বে বলিয়াছি, আমাদের পৃথিবী ও অপরাপর গ্রহ-উপগ্রহ এক সময়ে কোমল ছিল এবং এখনকার ন্যায় সেই সময়েও উহারা আপন মেরুদণ্ডের চারিদিকে ঘুরিত। এইজন্য সকল গ্রহ-উপগ্রহের মধ্যভাগই ফুলিয়া উঠিয়াছে এবং দুই প্রান্ত চাপা হইয়া গিয়াছে। যে বস্তু যত দ্রুত ঘুরে সেই বস্তুর মধ্যে কেন্দ্রাপসারিণী গতি তত প্রবল হয়। পৃথিবী অপেক্ষা বৃহস্পতি অধিকতর দ্রুত ঘুরিতেছে, এইজন্য

গ্রহদিগের মধ্যভাগ স্ফীত ও প্রান্ত চাপা হইবার কারণ।

বৃহস্পতির মধ্যভাগ পৃথিবীর মধ্যভাগ অপেক্ষা অধিকতর স্ফীত হইয়াছে। বৃহস্পতির স্ফীত অংশে অর্থাৎ বিষুব রেখার নিকটবর্ত্তী স্থানে উহার ব্যাসের পরিমাণ ৮৯৬০০ মাইল, কিন্তু দুই প্রান্তের নিকট ব্যাস ৮৬৬০০ মাইল। মধ্যভাগটা অতিশয় ফুলিয়া উঠাতে ঐ স্থানের ব্যাস অধিক হইয়াছে।

পণ্ডিতেরা অনুমান করেন, বৃহস্পতি পৃথিবীর ন্যায় কোন কঠিন পদার্থে গঠিত নয়। পৃথিবী যেমন পূর্ব্বে কোমল বাষ্পাকারে ছিল বৃহস্পতিও এখন সেই অবস্থায় আছে। হয়তো ভবিষ্যতে বৃহস্পতিও পৃথিবী এবং অপরাপর গ্রহের ন্যায় কঠিন হইবে। বৃহস্পতির দেহ যে কঠিন নয় এরূপ অনুমান করিবার কারণ আছে। পূর্ব্বে বলিয়াছি, প্রায় তের শত পৃথিবী একত্র করিলে আয়তনে বৃহস্পতির সমান হইবে। যদি বৃহস্পতি পৃথিবীর ন্যায় কোন কঠিন পদার্থে নির্ম্মিত হইত, তাহা হইলে বৃহস্পতির ওজন পৃথিবীর ওজন হইতে তের শত গুণ অধিক হইত। কিন্তু বাস্তবিক বৃহস্পতির ওজন পৃথিবীর ওজন হইতে মাত্র তিন শত গুণ অধিক।

বৃহস্পতির প্রাকৃতিক অবস্থা।

আমাদের আবাস-ভূমি পৃথিবী যখন বাষ্প-পিণ্ডাকারে শূন্য পথে পরিভ্রমণ করিত তখন উহার আয়তন বর্ত্তমান আয়তনের শত গুণ বৃহৎ ছিল। কিন্তু ওজন এখন যাহা আছে তখনও তাহাই ছিল। সুতরাং সেই বৃহদায়তনের তুলনায় তখন পৃথিবীর ওজন যে খুব কম বলিয়া বিবেচিত হইত সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

বৃহস্পতি যে এখনও বাষ্পাকারে আছে একটী ঘটনায় এই অনুমান সত্য বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছে। বৃহস্পতির প্রাকৃতিক অবস্থা বড়ই পরিবর্ত্তনশীল। দূরবীক্ষণ দ্বারা উহার উপরিভাগের

যে দৃশ্য দৃষ্টিগোচর হয়, তাহা এক এক সময় এক এক রকম দেখায়। ইহার এক কারণ এই হইতে পারে যে, বৃহস্পতি অতি দ্রুত আবর্ত্তন করে বলিয়া উহার পৃষ্ঠের অবস্থার এত দ্রুত পরিবর্ত্তন হয়। কিন্তু উহাই একমাত্র কারণ হইতে পারে না। দূরবীক্ষণ দিয়া দেখিলে বৃহস্পতির পৃষ্ঠে যে সকল কৃষ্ণ দাগ দৃষ্টিগোচর হয়, ঐ সকল দাগ ঠিক নির্দ্দিষ্ট সময়ে ঘুরিয়া আসিবার কথা। কেননা, বৃহস্পতির
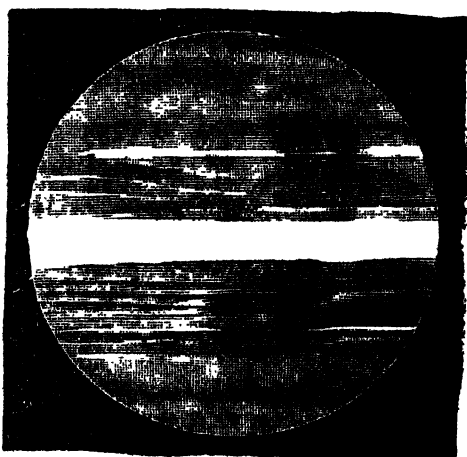
বৃহস্পতি।

গতি পরিবর্ত্তিত হয় না, সর্ব্বদা এক প্রকার থাকে। কিন্তু ঐ দাগগুলি কখন দ্রুত, কখন বা বিলম্বে প্রকাশ পায়। পণ্ডিতেরা দীর্ঘকাল সূক্ষ্ম পরীক্ষাদ্বারা স্থির সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, ঐ সকল দাগ আর কিছুই নহে, কেবল বৃহস্পতির আকাশের মেঘ-মালা। বিস্তৃত মেঘ-রাশি উৎপন্ন হইয়া বৃহস্পতির দেহকে সর্ব্বদা সমাচ্ছন্ন করিয়া রাখে। বৃহস্পতির পৃষ্ঠে অনবরত প্রবল ঝড় বহিতেছে। সেই ভীষণ ঝটিকায়

মেঘসমূহ একস্থান হইতে অন্যস্থানে বিস্তারিত হইয়া থাকে। বৃহস্পতির বায়ু-মণ্ডলী এক মুহূর্ত্তের জন্যও স্থির থাকিতে পারে না। মেঘসমূহও সেইজন্য সর্ব্বদা আকার পরিবর্ত্তন করে, অথবা বারি বর্ষণ করিয়া একবারে নিঃশেষিত হইয়া যায় এবং আবার নূতন মেঘ উৎপন্ন হয়।

বৃহস্পতির পৃষ্ঠে ভীষণ ঝড় বহিয়া থাকে। সেই ঝড়ের মত প্রবল ঝড় যদি পৃথিবী-পৃষ্ঠে হইত তাহা হইলে গাছ-পালা বাড়ী-ঘর কিছুই থাকিত না—সকলই উড়িয়া যাইত! বৃহস্পতির ঝড়ের গতি প্রতি ঘণ্টায় দুই শত মাইল! আবার সেই ঝড় দুই মাস আড়াই মাস কাল স্থায়ী হয়!

বৃহস্পতি-পৃষ্ঠে এমন ঝড় হয় কেন এবং এত মেঘই বা জন্মে কেন ইহার কারণ নির্দ্ধারণ করা কঠিন নহে। সূর্য্যের উত্তাপই পৃথিবীর ঝড়ের একমাত্র কারণ। এবং সূর্য্যোত্তাপেই পৃথিবী-পৃষ্ঠস্থ জল বাষ্পে পরিণত হইয়া আকাশে উঠে ও তাহাতে মেঘের উৎপত্তি হয়। সূর্য্যে ভয়ানক ঝড় হয়, তাহার কারণ সূর্য্যে অচিন্তনীয় উত্তাপ। সুতরাং বৃহস্পতি-পৃষ্ঠেও অসাধারণ তাপাধিক্য বশতঃই প্রচণ্ড ঝড়, মেঘ ও প্রবল বৃষ্টি হইয়া থাকে।

দূরবীক্ষণ দ্বারা পরীক্ষা করিয়া জানা গিয়াছে, বৃহস্পতি-পৃষ্ঠ হইতে বাষ্প অনবরত আকাশে উঠিতেছে এবং সেই বাষ্প আবার বৃষ্টিরূপে বৃহস্পতির পৃষ্ঠেই পতিত হইতেছে। বৃহস্পতি এখনও এত উত্তপ্ত যে জল উহার দেহ স্পর্শ করিবামাত্রই পুনরায় বাষ্প হইয়া উর্দ্ধে উঠে। এখন এই প্রশ্ন হইতে পারে যে, বৃহস্পতি এত উত্তাপ কোথা হইতে প্রাপ্ত হয়? নিশ্চয়ই সূর্য্য হইতে এই তাপ আইসে না। যদি সূর্য্য হইতে উত্তাপ আসিয়া বৃহস্পতির দেহ এরূপ উত্তপ্ত করিত তাহা হইলে পৃথিবীতে সূর্য্যের উত্তাপ আরও কত ভীষণ হইত। যেহেতু পৃথিবী সূর্য্যের অধিকতর নিকটবর্ত্তী। সূর্য্য হইতে
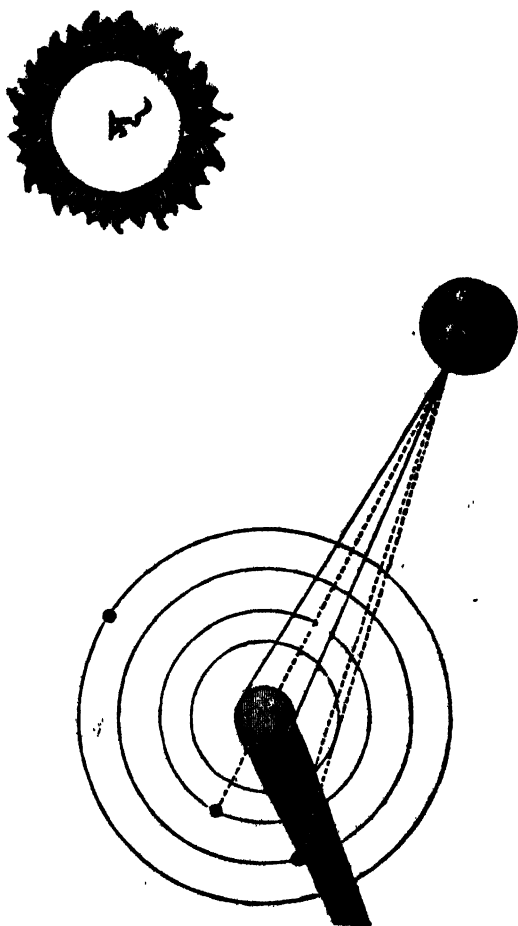
বৃহস্পতির চন্দ্রগ্রহণ।

পৃথিবী যে উত্তাপ পায় বৃহস্পতি তাহার পঁচিশ ভাগের এক ভাগ মাত্র উত্তাপ পাইয়া থাকে। বৃহস্পতির আভ্যন্তরিক উত্তাপই

অতিশয় প্রখর। বৃহস্পতি এখনও খুব উত্তপ্ত রহিয়াছে। সেই উত্তাপেই জল এত দ্রুত বাষ্প হইয়া আকাশে উঠে।

পৃথিবীর একটী চন্দ্র; পৃথিবীর পরবর্ত্তী গ্রহ মঙ্গল, উহার দুইটী চন্দ্র। মঙ্গলের পরবর্ত্তী গ্রহ বৃহস্পতি, উহার পাঁচটী চন্দ্র। * বৃহস্পতি-পৃষ্ঠ হইতে তাহার চন্দ্র সর্ব্বদা দৃষ্টিগোচর হইবার কোনই সম্ভাবনা নাই; যেহেতু, বৃহস্পতির আকাশ সর্ব্বদাই নিবিড় বাষ্পরাশি ও ঘনকৃষ্ণ মেঘ-মালাদ্বারা সমাচ্ছন্ন থাকে। তারপর আমাদের চন্দ্র হইতে বৃহস্পতির চন্দ্র অনেক বৃহৎ হইলেও অধিকতর উজ্জ্বল নহে। আমাদের চন্দ্রের ন্যায় বৃহস্পতির চন্দ্রও সূর্য্যকিরণে সমুদ্ভাসিত হইয়া থাকে। কিন্তু সূর্য্য এত দূরে যে, ঐ সকল চন্দ্র অতি সামান্য আলোক প্রাপ্ত হইয়া থাকে। বৃহস্পতির পাঁচটী চন্দ্রের আলোক একত্র

বৃহস্পতির চন্দ্র ও চন্দ্রগ্রহণ।

হইলেও আমাদের একমাত্র চন্দ্রের আলোকের সমান উজ্জ্বল হয় না। ঐসকল চন্দ্র এক সময়ে আকাশে উদিত হইলেও একবারে ষোল কলায় পূর্ণ হয় না। তারপর যে চন্দ্রটী যখন সূর্য্যের বিপরীত দিকে সমসূত্রে থাকে, সেইটী তখন বৃহস্পতির ছায়ায় ঢাকা পড়িয়া যায়। তখনই বৃহস্পতির চন্দ্রের গ্রহণ হয়। আবার যে চন্দ্রটী বৃহস্পতির পিছনেতে পৃথিবী ও বৃহস্পতির সহিত সমসূত্রে থাকে সেইটী বৃহস্পতির দ্বারাই ঢাকা পড়ে।

বৃহস্পতির চন্দ্রগুলি স্থূল দৃষ্টিতে কোন কাজে আসে বলিয়াই মনে হয় না। কিন্তু ভগবান্ তাহাদিগের দ্বারা কোন্ কার্য্য সম্পন্ন করিতেছেন তাহা আমাদের কল্পনারও অতীত।

---

* বৃহস্পতির চারিটী চন্দ্র গ্যালিলিও আবিষ্কার করিয়াছিলেন। পঞ্চম চন্দ্রটী ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে আমেরিকার একজন অধ্যাপক (Pof. Barnard) আবিষ্কার করিয়াছেন।

বৃহস্পতি-পৃষ্ঠে যেরূপ ভয়ানক ঝটিকা প্রবাহিত হইয়া থাকে এবং তথায় যেরূপ ভীষণ উত্তাপ, তাহাতে তথায় কোন প্রাণী বাস করিতে পারে বলিয়া কিছুতেই মনে হয় না। কিন্তু ভগবান্ সেই স্থানের উপযোগী কোন প্রাণী সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছেন কি না তাহা কে বলিতে পারে? ভগবান্ কি কেবল পৃথিবীতেই প্রাণী সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছেন? জগতের অপর জ্যোতিষ্কসমূহ কি শূন্য? ইহা বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা হয় না। পৃথিবীতো জগতের তুলনায় সামান্য ধূলিকণা মাত্র! কিসে ইহা ভগবানের অধিকতর প্রিয় হইল?

জ্যোতির্ব্বিদ্ প্রক্টার (Proctor) বলেন, বৃহস্পতি-পৃষ্ঠ অপেক্ষা উহার চন্দ্রগুলি প্রাণি-বাসের অধিক অনুকূল। সমুজ্জ্বল সুবিশাল বৃহস্পতি, সূর্য্যের ন্যায় মধ্যস্থলে বিরাজিত; তাহার চারিদিকে চন্দ্রসমূহ গ্রহের ন্যায় পরিভ্রমণ করিতেছে। চন্দ্রগুলিতে প্রাণী বাস করা বিচিত্র নহে। বাস্তবিক চন্দ্র-পরিবৃত বৃহস্পতি অনেকটা সূর্য্যস্থানীয় এবং বৃহস্পতির রাজ্যটা যেন আর একটা সৌর-জগৎ। বৃহস্পতির পাঁচটী চন্দ্র পাঁচটী গ্রহের ন্যায় বৃহস্পতিকে প্রদক্ষিণ করিতেছে। সূর্য্য ঐ সকল গ্রহের অনুপাতে যত বড়, বৃহস্পতিও উহার চন্দ্রগুলির অনুপাতে তত বড়।

শনি।

শনি (Saturn) নামটী হিন্দুর নিকট সুপরিচিত। শনির নাম শুনিলে হিন্দুমাত্রই কিছু বিচলিত হইয়া থাকেন! আমাদের পুরাণেতিহাসে শনি-দৃষ্টি সম্বন্ধে অতি ভীষণ কাহিনীসকল লিখিত আছে। শনি কত জনকে কত লাঞ্ছনাই না করিয়াছে! শৈশবে

শ্রীবৎস রাজার উপাখ্যান শুনিয়া নীরবে কত অশ্রুপাত করিয়াছি। শনির কোপদৃষ্টিতে পড়িয়া পরম সাধু শ্রীবৎস কি নিদারুণ কষ্ট, কি কঠোর মর্ম্মপীড়াই না ভোগ করিয়াছিলেন। এমন নির্য্যাতন কি কাহারও ভাগ্যে ঘটিয়াছে? শনিই নাকি যত অমঙ্গলের নিদান। নূতন পঞ্জিকায় যে বৎসর শনি রাজা হইয়াছেন জানা গেল, সে বৎসর মনে কত আশঙ্কা হয়, শনির এই নির্ম্মম নিষ্ঠুরতার কথা এককালে পৃথিবীর প্রায় সকল জাতির মধ্যেই প্রচলিত ছিল। ইউরোপেও শনির অত্যাচার সম্বন্ধে অনেক কুসংস্কারপূর্ণ গল্প প্রচলিত আছে।

শনির দৃষ্টি।

দূরবীক্ষণ ব্যতীত শনির অসাধারণ সৌন্দর্য্য প্রত্যক্ষ করা যায় না। শনিকে খালি চক্ষুতে দেখিলে একটী প্রথমশ্রেণীর নক্ষত্রের ন্যায় বোধ হয়। প্রাচীন জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ শনির অত্যদ্ভুত দেহটী প্রত্যক্ষ করিতে পারেন নাই। সুতরাং তাঁহারা উহার অঙ্গ-সৌষ্ঠবেরও পরিচয় পান নাই। আকৃতিগত বৈচিত্র্যে শনি সকল গ্রহের শ্রেষ্ঠ।

শনির বৈচিত্র্য।

শনি।
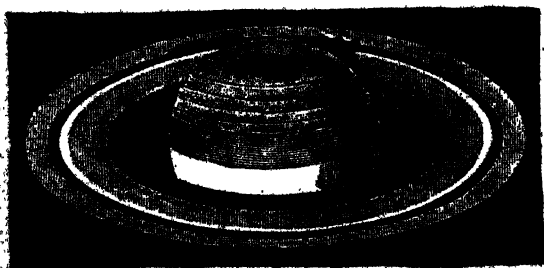
গ্যালিলিওই সর্ব্বপ্রথম দূরবীক্ষণদ্বারা শনি গ্রহটী পর্য্যবেক্ষণ করেন। গ্যালিলিও তাঁহার দূরবীক্ষণ যন্ত্রটী শনির দিকে নির্দেশ করিয়া

এক অশ্রুতপূর্ব্ব ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিলেন। তিনি দেখিলেন, শনির দুই পার্শ্বে দুইটী ক্ষুদ্র এবং মধ্যস্থলে একটী সুবৃহৎ পিণ্ড রহিয়াছে! গ্যালিলিও এই অসীম রহস্যপূর্ণ ব্যাপার অবলোকন করিয়া ইহার কথা সাধারণের নিকট প্রকাশ করিলেন।

ইহার কিছুদিন পর তিনি আবার দূরবীক্ষণ দ্বারা শনির দেহটী ভাল করিয়া পরীক্ষা করিতে বসিলেন। তখন দেখিলেন, দুই পার্শ্বের পিণ্ডদ্বয় ক্রমে ক্রমে ছোট হইয়া যাইতেছে। এই অভিনব ব্যাপার দর্শন করিয়া তিনি আরও বিস্মিত এবং কৌতূহলাক্রান্ত হইলেন। আবার কয়েকদিন পর তিনি দূরবীক্ষণ লইয়া বসিলেন। সেই দিন তিনি দেখিলেন দুই পার্শ্বের পিণ্ড দুইটী একবারে অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে। সেই নূতন কাণ্ড দেখিয়া গ্যালিলিও অবাক্ হইলেন! তিনি ব্যাকুল হৃদয়ে বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন "হায়! এ কি হইল! পিণ্ড দুইটী কোথায় অদৃশ্য হইয়া পড়িল। আমি যে দুইটী পিণ্ড আবিষ্কারের কথা সকলের নিকট প্রচার করিয়াছি, এখন উঁহাদিগকে দেখাইতে না পারিলে লোকে তো মিথ্যাবাদী বলিবে।" তিনি এই চিন্তায় অতিশয় অধীর হইয়া পড়িলেন। এবং এই অভাবনীয় ব্যাপারের কারণ নির্দ্দেশের জন্য অতি নিবিষ্টচিত্তে শনিকে পরীক্ষা করিতে আরম্ভ করিলেন। আশ্চর্য্যের বিষয়, কিছুদিন পর সেই দুইটী পিণ্ড আবার দুই পার্শ্বে দেখা দিল! গ্যালিলিও ভাবিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না।

গ্যালিলিও যাহা দেখিয়াছিলেন তাহা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু তিনি শনিকে কেন এরূপ দেখিয়াছিলেন এবং উহার দেহ-গঠন কিরূপ তাহা নির্দ্ধারণ করিতে সমর্থ হন নাই। না পারিবার কারণ এই যে, তিনি যে দূরবীক্ষণ ব্যবহার করিতেন, তাহা অতি সাধারণ রকমের ছিল, তদ্রূপ নিকৃষ্ট দূরবীক্ষণ আজকাল কোন জ্যোতির্ব্বিদ

পত্তিতই ব্যবহার করেন না। সুতরাং তাঁহার যন্ত্রদ্বারা বহু দূরবর্ত্তী শনিকে তিনি ভাল করিয়া দেখিতে পারেন নাই।

গ্যালিলিওর মৃত্যুর প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দীর পর ১৬৬৫ খৃষ্টাব্দে জ্যোতির্ব্বিদ্ পণ্ডিত হিউগেন্ (Huyghen) শনির আকৃতির যথার্থ বিবরণ আবিষ্কার করেন। শনি একটী প্রকাণ্ড গোল পিণ্ড। একটী বিশাল বলয় (Ring) ঐ পিণ্ডকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে।

শনির বলয় আবিষ্কার।

শনির বৃত্তাভাস কক্ষ

শনি-দেহে গ্যালিলিও কেন তিনটী গোলাকার পিণ্ড দেখিয়াছিলেন তাহাই এখন বলিতেছি। যদি একটী লোক "উকিলের শাম্‌লা" মাথায় পরিয়া দাঁড়ায়, আর আমরা খুব দূর হইতে তাহার একপার্শ্বে দাঁড়াইয়া দেখি, তাহা হইলে মাঝখানে গোল মস্তকটী বৃহৎ পিণ্ডের ন্যায় দৃষ্টিগোচর হইবে; আর শাম্‌লার বাদামী দুই প্রান্ত ও দুইটী ক্ষুদ্র পিণ্ডের ন্যায় বোধ হইবে। গ্যালিলিও বহুদূরস্থিত শনির বলয়টী নিকৃষ্ট দূরবীক্ষণ দ্বারা স্পষ্ট দেখিতে পান নাই। তাই দুই বিস্তৃত প্রান্তকে পার্শ্ববর্ত্তী দুই টী পিণ্ড বলিয়া ভ্রম করিয়াছেন। আবার যদি শাম্‌লা

মাথায় সেই লোকটী সম্মুখ দিয়া দাঁড়ায় তাহা হইলে দুই পার্শ্বের বর্দ্ধিত অংশ দুইটী দূর হইতে দৃষ্টিগোচর হইবে না। গ্যালিলিও যখন দেখিয়াছিলেন, দুই পার্শ্বের পিণ্ডদ্বয় অদৃশ্য হইয়াছে, তখন শনি ঘুরিয়া গিয়াছিল। 'হিউগেন'ই সর্ব্বপ্রথম আবিষ্কার করেন, একটী বিশাল বলয় শনিকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে; সেই বলয়টী দেখিতে শাম্‌লার মত বাদামী।

এই সকল অত্যদ্ভুত ব্যাপার প্রচারিত হইবার পর বৈজ্ঞানিক জগতে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হইল। সকলেই দূরবীক্ষণ দ্বারা সুক্ষ্ম পরীক্ষা আরম্ভ করিলেন। পরিশেষে আবিষ্কৃত হইল বাস্তবিকই একটী বলয় শনিকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে।

সার্ উইলিয়ম্ হর্শেল্ দশ বৎসর কাল কঠোর অধ্যবসায়ের সহিত তাঁহার উৎকৃষ্ট দূরবীক্ষণ দ্বারা পরীক্ষা করিয়া স্থির করেন যে, শনির বলয় একটী নহে, দুইটী। বাহিরের বলয়টীর ভিতরে আর একটী উজ্জ্বল বলয় সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে। বাহিরের বড় বলয়টী ভিতরের বলয় হইতে একটী কাল রেখা দ্বারা বিচ্ছিন্ন। এই সকল ব্যাপারও সকলে পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন এবং অতিশয় বিস্মিত হইলেন।

ইহার কিছুকাল পরে আবার জ্যোতির্ব্বিদ্ পণ্ডিত বণ্ড্ (Prof-Bond) আবিষ্কার করিলেন, পূর্ব্বোক্ত বলয় দুইটীর ভিতর আরও একটী বলয় আছে। এই তৃতীয় বলয়টীও অভ্রান্তরূপে স্থিরীকৃত হইল। ইহার পরও আবার অনেক জ্যোতির্ব্বিদ্ পণ্ডিত বলিতেছেন, ঐ বলয়গুলির ভিতর আরও অনেকগুলি বলয় আছে। এই সকল কথা শুনিয়া মনে হয়, পেঁয়াজের খোসার মত বুঝি শনির কেবল বলয়ই বাহির হইবে! এই তো গেল বলয়ের সংখ্যার কথা; এখন বলয় পদার্থটা কি বুঝিতে হইবে।

বলয়গুলি সম্বন্ধে স্থির হইয়াছে, উহারা কঠিন পদার্থও নয় এবং তরল পদার্থও নয়—এই দুই এর মধ্য স্থানীয়। শনির বলয় এবং শনি স্বয়ং, এই উভয়ই সূর্য্যোলোকে আলোকিত হয়; কাহারও নিজের আলোক নাই।

শনির বলয়ের বিবরণ।

একজন জ্যোতির্ব্বিদ্ পণ্ডিত (Prof. Kuler) বর্ণ-বীক্ষণ যন্ত্রদ্বারা শনির বলয়গুলি পরীক্ষা করিয়া স্থির করিয়াছেন, উহারা শত শত ক্ষুদ্র চন্দ্র দ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছে। ঐ সকল ঘন-দল-বদ্ধ-চন্দ্ররাজি নিজ নিজ নির্দ্দিষ্ট পথে শনিকে প্রদক্ষিণ করিতেছে। এই মত এখন পণ্ডিতেরা গ্রহণ করিয়াছেন। শনির কটিদেশে বিনা সূত্রে গাঁথা চন্দ্রহার শোভা পাইতেছে! ভগবান্ কত সম্পদ দিয়া শনির সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিয়াছেন! বলয়গুলির উপর শনির গোল পিণ্ডের ছায়া পতিত হয়। এবং বলয়ের ছায়াও শনির উপর পতিত হয়। আরও বিস্ময়ের কথা এই যে, ঐ বলয়গুলি শনিকে কেবল বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে তাহা নয়; বলয়গুলি নিশ্চল নহে। উহাদেরও গতি আছে। বলয়গুলি অবিরাম ঘুরিতেছে, আবার শনিও ঘুরিতেছে।

বাহিরের বলয়টী	প্রতি	সেকেণ্ডে	১০	মাইল	বেগে	ঘুরে
মধ্যের বলয়টী	”	”	১১	”	”	”
ভিতরের তৃতীয় বলয়টি		”	১৩	”	”	”
শনি গ্রহ	”	”	৬	”	”	”

এই অসামান্য রহস্যপূর্ণ গ্রহটীর আকার ও গতির বিষয় একবার চিন্তা করিলে বিশ্বনিয়ন্তার সৃষ্টি-বৈচিত্র্য কথঞ্চিৎ উপলব্ধি হইবে।

প্রাচীন আর্য্য-জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ শনির আকৃতিগত অভাবনীয় বৈচিত্র্যের কথা অবগত ছিলেন না। কারণ, তখন দূরবীক্ষণ ছিল না। কিন্তু খালি চক্ষুতেই তাঁহারা ৮৮৬৭৭৯০০০ অষ্টাশি কোটী

সাতষট্টি লক্ষ উনআশি হাজার মাইল দূরস্থিত জ্যোতিষ্ককে চিনিয়াছিলেন। শনিকে দেখা এবং গ্রহ বলিয়া স্থির করা অতিশয় দুরূহ ব্যাপার। অধ্যবসায় সহকারে বহুবর্ষ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া যে আর্য্য জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ শনির গতি ও ভ্রমণ-পথ স্থির করিয়াছিলেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

শনির দূরত্ব, দিন ও বৎসর।

প্রথমতঃ শনি খুব উজ্জ্বল গ্রহ নহে। বুধ, শুক্র ও বৃহস্পতি, শনি অপেক্ষা অনেকটা বড় দেখায়। আবার উজ্জ্বলতায় বুধ ও মঙ্গল শনি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

দ্বিতীয়তঃ শনির গতি অতি মৃদু। শনৈঃ শনৈঃ অর্থাৎ ধীরে ধীরে গমন করে বলিয়াই হিন্দু জ্যোতিষীরা উহার নাম **শনৈশ্চর** রাখিয়াছিলেন। নামটীতেই বুঝা যাইতেছে যে, প্রাচীনকালের আর্য্য জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ উহার গতি বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিয়াছিলেন।

শনি প্রতি সেকেণ্ডে ছয় মাইল মাত্র গমন করে। পৃথিবীর গতি ইহার তিনগুণ অধিক, সুতরাং শনির গতি দেখিয়া উহাকে গ্রহ বলিয়া চিনিয়া লওয়া কষ্টসাধ্য।

শনি ১০ ঘণ্টা ১৪ মিনিটে আপন মেরুদণ্ডের চারিদিকে একবার ঘুরিয়া থাকে। অর্থাৎ ১০ ঘণ্টা ১৪ মিনিটে শনির এক দিন হয়। শনি ১০৭৫৯ দিন ৫ ঘণ্টা ১৬ মিনিটে একবার সূর্য্য প্রদক্ষিণ করে অর্থাৎ আমাদের প্রায় ৩০ বৎসরে শনির একবৎসর হয়। পৃথিবীতে যে পদার্থের ওজন ১ মণ শনিতে সেই পদার্থের ওজন মাত্র ৫ সের হইবে। সমায়তন জল অপেক্ষাও শনি ওজনে লঘু। শনিকে যদি সমুদ্রে নিক্ষেপ করা যাইত তাহা হইলে উহা ভাসিয়া থাকিত। কিন্তু শনিকে বক্ষে ধারণ করিতে পারে এমন বৃহৎ সমুদ্র বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে আছে কি না জানা যায় নাই। শনি পৃথিবী

শনির ওজন ও আয়তন।

অপেক্ষা আয়তনে ৭০০ গুণ বড় কিন্তু ওজনে মাত্র ৯০ গুণ অধিক ভারী। সুতরাং পৃথিবীর উপাদান অপেক্ষা শনির উপাদান যে লঘু তাহাতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই। তাই অনেকে অনুমান করেন যে, শনির উপাদান কোন কঠিন পদার্থ নহে।

শনির চতুষ্পার্শ্বস্থ বায়ু-মণ্ডল সর্ব্বদা মেঘে আচ্ছন্ন থাকে। স্তরে স্তরে মেঘ শনির দেহকে আবৃত করিয়া রাখিয়াছে। এক স্তর অদৃশ্য হইতে না হইতে আর এক স্তর দৃষ্টিগোচর হয়।

প্রাকৃতিক অবস্থা। ইহাতে প্রতীয়মান হয় বৃহস্পতির ন্যায় শনিও উত্তপ্ত রহিয়াছে এবং স্বীয় দেহ হইতে তাপ বিকীরণ করিতেছে। সেই তাপে জল বাষ্প হইয়া মেঘ হয়। মেঘ বৃষ্টিরূপে পরিণত হয়। বৃষ্টিধারা পতিত হইতে না হইতেই আবার বাষ্প হইয়া ঊর্দ্ধে উঠে।

পৃথিবীর এক চন্দ্র, মঙ্গলের দুই চন্দ্র, বৃহস্পতির পাঁচ চন্দ্র, কিন্তু শনির নয়টী চন্দ্র। ভগবান্ সকল বিষয়েই শনিকে অধিক সম্পদ-শালী করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। কিন্তু মানুষ তবু সকল দোষ তাহার স্কন্ধে চাপায়।

১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে অধ্যাপক পিকারিং (W. H. Pickering) ফটোগ্রাফীর সাহায্যে শনির নবম চন্দ্রটী আবিষ্কার করিয়াছেন। চন্দ্রটী যে নিতান্তই ক্ষুদ্র তাহা বলাই বাহুল্য। ইহা হইতে জ্যোতিষ শাস্ত্রানুশীলনে ফটোগ্রাফীর প্রয়োজনীয়তা সম্যক্ উপলব্ধি হইবে।

ইউরেনাস্।

ইউরেনাস্ (Urauns) এবং নেপ্‌চ্যুন্ (Neptune) এই দুইটী গ্রহ আধুনিক কালে আবিষ্কৃত হইয়াছে। দূরবীক্ষণের সাহায্য ব্যতীত এই দুইটী গ্রহ চিনিবার সাধ্য নাই। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বহু বৎসরের চেষ্টায় অত্যুৎকৃষ্ট দূরবীক্ষণ-সাহায্যে পরীক্ষা করিয়া এই গ্রহ দুইটী আবিষ্কার করিয়াছেন। এইজন্য প্রাচীন জ্যোতিষ শাস্ত্রে ইউরেনাস্ ও নেপ্‌চ্যুনের নাম নাই।

১৭৮১ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসে হর্শেল (Sir William Herschel) তাঁহার দূরবীক্ষণের সাহায্যে আকাশ পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিলেন, তখন হঠাৎ তাঁহার দূরবীক্ষণের দৃষ্টিতে একটী বৃহৎ তারা দেখা দিল। হর্শেল সেই তারাটীকে বিশেষরূপে পরীক্ষা করিলেন এবং পরিচিত নক্ষত্রমণ্ডলীর মধ্যে উহার স্থান নির্দ্দেশ করিয়া রাখিলেন। পর দিবস রাত্রিতে হর্শেল আবার তাঁহার দূরবীক্ষণ লইয়া বসিলেন। সে রাত্রিতে দেখিলেন, পূর্ব্বরাত্রির দৃষ্ট তারাটী আর সেই স্থানে নাই।

হর্শেলের কৃতিত্ব।

হর্শেল এই ব্যাপার দর্শন করিয়া কিছু বিস্মিত হইলেন। যখন কয়েক রাত্রি ক্রমান্বয়ে পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন, ঐ অপরিচিত জ্যোতিষ্কটী অতি দ্রুত স্থান পরিবর্ত্তন করিতেছে, তখন হর্শেল বুঝিতে পারিলেন উহা নক্ষত্র নহে। তিনি প্রচার করিলেন, একটী অসাধারণ ধূমকেতু দর্শন করিয়াছেন। হর্শেলের মনে একবিন্দুও ধারণা হয় নাই যে, তিনি একটী নূতন গ্রহ আবিষ্কার করিয়াছেন। পরিশেষে অনেক পরীক্ষাদ্বারা হর্শেল স্থির করিলেন যে, তিনি যে জ্যোতিষ্কটীর অনুসরণ করিয়াছেন উহা নক্ষত্রও নয়, ধূমকেতুও নয়; উহা একটী গ্রহ। পৃথিবীর ন্যায়

৬৫টী গ্রহ একত্র করিলে এই নূতন গ্রহের সমান হইবে। এই গ্রহটী ইউরেনাস্ নামে পরিচিত। হর্শেলের স্মৃতি রক্ষার্থ পণ্ডিতেরা ইহার নাম হর্শেল গ্রহ রাখিয়াছিলেন।

হর্শেল বা ইউরেনাস্ সূর্য্য হইতে ১৭৮৩৩৮৩০০০ মাইল দূরে অবস্থিত। ইউরেনাস্ আবিষ্কারের পূর্ব্বে শনিই সৌর-জগতের শেষ গ্রহ বলিয়া সকলে জানিত। শনি পাগড়ী মাথায় দিয়া পাহাড়াওয়ালার ন্যায় সৌর-জগতের সীমান্ত প্রদেশ রক্ষা করিতেছে। কিন্তু ইউরেনাস্ আবিষ্কারের পর জানা গেল, সৌর-জগৎ আরও বিস্তৃত।

হর্শেল যদিও ইউরেনাস্ গ্রহটী হঠাৎ আবিষ্কার করিয়াছিলেন, তথাপি ইহাতে তাঁহার কম কৃতিত্ব প্রকাশ পায় নাই।

ইউরেনাস্ আবিষ্কৃত হইলে পর যখন তাহার গতি ও ভ্রমণ-পথ নির্দ্দিষ্ট হইল, তখন জানা গেল যে, এই গ্রহটীকে ইতঃপূর্ব্বে জ্যোতির্ব্বিদ্ পণ্ডিতেরা উনিশ বারের কম প্রত্যক্ষ করেন নাই। তথাপি কেহ তাহাকে ধরিতে পারেন নাই। ইউরেনাস্ তাঁহাদের নিকট আত্মগোপন করিয়া ছদ্মবেশে ভ্রমণ করিয়াছে। 'ফ্লেমষ্টিড্' (Flamstead) নামক একজন জ্যোতির্ব্বিদ এই ইউরেনাস্‌কে পাঁচবার দেখিয়াছিলেন কিন্তু তিনি ইহাকে পঞ্চম শ্রেণীর নক্ষত্র বলিয়া ভ্রম করিয়াছেন। 'লিমোনিয়ার' (Lemonnier) দ্বাদশবার ইহাকে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, তথাপি চিনিতে পারেন নাই। ইউরেনাস্ সকলকে ফাঁকি দিয়াছিল কিন্তু সূক্ষ্মদর্শী হর্শেলের নিকট ধরা পড়িল!

ওজন ও আয়তন।

পৃথিবী হইতে ইউরেনাস্ খুব দূরে অবস্থিত। বর্ত্তমান সময়ের উৎকৃষ্ট দূরবীক্ষণ দ্বারাও ইউরেনাস্‌কে খুব বড় দেখায় না। ইউরেনাস্ পৃথিবী হইতে প্রায় ৬৩ গুণ বড় বলিয়াছি কিন্তু আয়তনের তুলনায় তাহার ওজন খুব কম। ইউরেনাস্ পৃথিবী হইতে মাত্র পনর গুণ অধিক

ভারী। সুতরাং দেখা যাইতেছে, ইউরেনাসের উপাদান অতিশয় হাল্‌কা।

ইউরেনাসের চারিটী চন্দ্র আছে। ঐ সকল চন্দ্র দূরবীক্ষণ-সাহায্যেও প্রত্যক্ষ করা কঠিন। যাঁহারা জ্যোতিষ্ক-পর্য্যবেক্ষণে সুপণ্ডিত এবং যাঁহাদের অত্যুৎকৃষ্ট দূরবীক্ষণ যন্ত্র আছে, তাঁহারাই ইউরেনাসের চন্দ্র দেখিতে পারেন। হর্শেল ইউরেনাস্ আবিষ্কার করিয়াছিলেন এবং তিনি উহার দুইটী চন্দ্রও আবিষ্কার করেন। অতঃপর লেসেল (Lassell) নামক একজন পণ্ডিত আর দুইটী চন্দ্র আবিষ্কার করিয়াছেন। আমাদের চন্দ্রের গতি পশ্চিম হইতে পূর্ব্বদিকে, কিন্তু ইউরেনাসের চন্দ্রের গতি ইহার বিপরীত।

ইউরেনাসের চন্দ্র।

সূর্য্য হইতে ইউরেনাসের দূরত্ব খুব বেশী, এইজন্য উহার ভ্রমণ-পথ সেই পরিমাণে অধিক বড় এবং গতিও সেই পরিমাণে মৃদু। ইউরেনাস্ ৩০৬৮৮ দিন ১৭ ঘণ্টা, ২১ মিনিটে, অর্থাৎ আমাদের প্রায় ৮৪ বৎসর, ২৮ দিনে সূর্য্যকে একবার প্রদক্ষিণ করিয়া থাকে। সুতরাং ৮৪ বৎসর ২৮ দিনে উহার এক বৎসর হয়। ইউরেনাসের একবৎসরও মানুষ সচরাচর বাঁচে না। ইউরেনাস্ আমাদের প্রায় ১০ ঘণ্টায় একবার আপন মেরুদণ্ডের চারিদিকে আবর্ত্তন করে। অতএব আমাদের ১০ ঘণ্টায় উহার এক দিনমান হয়।

ইউরেনাসের দিন ও বৎসর।

নেপ্‌চ্যুন্।

ইউরেনাসের যে ভ্রমণ-পথ পণ্ডিতেরা নির্দ্ধারণ করিয়াছিলেন, পরীক্ষাদ্বারা দেখা গেল, ইউরেনাস্ সেই পথে বিচরণ করে না। ইউরেনাস্ সেই নির্দ্ধারিত পথ হইতে কিছু দূরে থাকিয়া সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিয়া থাকে। পণ্ডিতেরা তখন স্থির করিলেন, ইউরেনাস্ নিশ্চয়ই কোন অপরিজ্ঞাত গ্রহকর্ত্তৃক আকৃষ্ট হইতেছে, নতুবা উহার এইরূপ দূরে সরিয়া যাওয়ার অন্য কারণ থাকিতে পারে না। গণিত জ্যোতিষশাস্ত্রে যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছে। অজানিত গ্রহের ওজন, উহার গতি এবং ভ্রমণ-পথ নির্দ্দেশ করা গণিতের কার্য্য। গণিতশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতেরা তখন সেই অদৃশ্য গ্রহ-আবিষ্কারে নিযুক্ত হইলেন।

গণিতের আভাস।

যে গ্রহটী অদৃশ্য থাকিয়া ইউরেনাসের ভ্রমণ-পথ পরিবর্ত্তন করিয়া দিতেছে, উহাকে খুঁজিয়া বাহির করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে উহার স্থান নির্দ্দেশ করা প্রয়োজন। পরীক্ষাদ্বারা দেখা গেল ইউরেনাস্ যে পথে ভ্রমণ করিবার কথা সেই পথ হইতে সূর্য্যের দিকে না সরিয়া সূর্য্য হইতে দূরে সরিয়া ভ্রমণ করিতেছে। সুতরাং বৃহস্পতি অথবা শনির আকর্ষণে ইউরেনাসের এই পরিবর্ত্তন হইতে পারে না। নিশ্চয়ই সূর্য্য হইতে দূরতর কোন গ্রহ ইউরেনাস্‌কে আকর্ষণ করিয়া নির্দ্দিষ্ট স্থান হইতে দূরে টানিয়া লইতেছে।

এখন সেই গ্রহ কোন স্থানে অবস্থিত তাহা সূক্ষ্মরূপে নির্দ্ধারণ করা প্রয়োজন। "বোডের" (Prof-Bode) প্রচারিত গ্রহ সংস্থানের বিধানানুসারে দেখা গিয়াছে, বৃহস্পতি সূর্য্য হইতে যত দূরে, শনি

প্রায় তাহার দ্বিগুণ দূরে, আবার শনি যত দূরে ইউরেনাস্‌ প্রায় তাহার দ্বিগুণ দূরে অবস্থিত। এই শৃঙ্খলা সৌর-জগতে সর্ব্বত্র বিদ্যমান থাকিলে অদৃশ্য গ্রহটী ইউরেনাসের দ্বিগুণ দূরে থাকিবার কথা।

যে গ্রহটীর অনুসন্ধান করা হইবে সূর্য্য হইতে উহার আনুমানিক দূরত্ব ৩৮০ তিন শত আশী কোটি মাইলের ন্যূন হইবে না। সুবিশাল সৌর-জগতের সুদূর প্রান্তে অবস্থিত অদৃশ্য গ্রহের স্থান নির্দ্দেশ করিয়া উহার অনুসন্ধান করা কিরূপ অসাধারণ সূক্ষ্ম বিচার ও পর্য্যবেক্ষণের প্রয়োজন তাহা অনুমান করাও দুঃসাধ্য।

সুপ্রসিদ্ধ ফরাসী পণ্ডিত 'লেবেরিয়ার' (Leverrier) সেই সুকঠিন কার্য্য সম্পন্ন করিলেন। তিনি সেই প্রচ্ছন্ন গ্রহের স্থান ও ভ্রমণ-পথ সূক্ষ্মরূপে নির্দ্ধারণ করিলেন এবং তাঁহার গণনার ফল সর্ব্বসাধারণের গোচরার্থে প্রকাশ করিলেন। ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট

লেবেরিয়ার।

মাসে লেবেরিয়ার ফরাসীরাজ্যের সুপ্রসিদ্ধ বিজ্ঞানসভায় (Academy of Sciences) ঐ গ্রহের দূরত্ব, উহার কক্ষ, উহা কত বৃহৎ এবং সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিতে উহার কত সময় লাগে ইত্যাদি যাবতীয় বিবরণ সূক্ষ্মরূপে প্রকাশ করেন!

ঐ বৎসর ১৮ই সেপ্টেম্বর তারিখ 'লেবেরিয়ার' বার্লিন সহরস্থ তাঁহার বন্ধু ডাক্তার "গেলের" (Dr. Galle) নিকট একখানি চিঠি লিখিয়া তাঁহার নির্দ্দিষ্ট স্থানে অদৃশ্য গ্রহের অনুসন্ধান করিতে অনুরোধ করেন। ২৩শে তারিখ 'গেলে' চিঠি পাইলেন। লেবেরিয়ারের পত্র পাঠ করিয়া 'গেলে' অনিবার্য্য কৌতূহলসহকারে সেই রাত্রেই লেবেরিয়ার-নির্দ্দিষ্ট স্থানটী দূরবীক্ষণ দ্বারা পরীক্ষা করিলেন। বহুসংখ্যক জ্যোতিষ্ক দৃষ্টিগোচর হইল। ঐ সকল জ্যোতিষ্ককে নক্ষত্র-

মানচিত্রের সহিত মিলাইতে লাগিলেন। যে সকল জ্যোতিষ্ক নক্ষত্র-মানচিত্রে পাওয়া গেল সেই গুলি পরিত্যক্ত হইতে লাগিল। অবশেষে আয়তনে অষ্টম শ্রেণীর একটী নক্ষত্র দৃষ্টিগোচর হইল, কিন্তু ঐ নক্ষত্রটীকে মানচিত্রে পাওয়া গেল না। 'গেলে' অতিশয় বিস্মিত ও আনন্দিত হইলেন। এই জ্যোতিষ্কটী-ই সেই অদৃশ্য গ্রহ হইবে। কিন্তু তখনও তাঁহার মনে সন্দেহ রহিয়া গেল। ভুলে এই নক্ষত্রটীর স্থান মানচিত্রে না দেওয়া অসম্ভব কি? অথবা উহা মঙ্গল ও বৃহস্পতির মধ্যবর্ত্তী অসংখ্য গ্রহের একটী গ্রহও হইতে পারে। পরদিন রাত্রে তিনি আবার দূরবীক্ষণ লইয়া বসিলেন। কি আশ্চর্য্য! সে জ্যোতিষ্ক আর পূর্ব্বস্থানে নাই। 'লেবেরিয়ারের' নির্দ্ধারিত পথে এবং তাঁহার নির্দ্দিষ্ট গতিতে সেই জ্যোতিষ্ক পূর্ব্ব স্থান হইতে অগ্রসর হইতেছে। তখন আর কোন সন্দেহ রহিল না। বহু বৎসরের চেষ্টায় এই নূতন গ্রহ আবিষ্কৃত হইল। এই সংবাদ তড়িত গতিতে সর্ব্বত্র প্রচারিত হইল। 'লেবেরিয়ারের'ও শ্রম সার্থক হইল। তিনি জগতে চিরস্মরণীয় হইয়া রহিলেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই, 'লেবেরিয়ার' যে স্থান নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন প্রায় সেই স্থানেই গ্রহটী পাওয়া গিয়াছিল। কি অভ্রান্ত গণনা! এই গ্রহটীর নাম নেপ্‌চ্যুন্ (Naptune)। নেপ্‌চ্যুন্ আবিষ্কারের

এডাম্‌স্।

ইতিহাসে আর একজন গণিত বিশারদ পণ্ডিতের নাম উল্লেখ করা উচিত। ইনি ইংলণ্ডের মিঃ এডাম্‌স্ (Adams)। এডাম্‌স্ যখন কেম্ব্রিজ বিদ্যালয়ে বি,এ পড়িতেন তখন হইতেই তিনি, ইউরেনাস্ যে পথে ভ্রমণ করা উচিত সেই পথ হইতে কেন দূরে থাকিয়া সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিতেছে, তাহার কারণ অন্বেষণ করিতেছিলেন। এই অসাধারণ যুবক বি, এ উপাধি লাভ করিয়া পূর্ব্বকথিত অসামঞ্জস্যের মীমাংসায় মনোনিবেশ করেন।

এডাম্‌স্‌ লেবেরিয়ারের গণনার ফল প্রকাশ করিবার পূর্ব্বে স্বতন্ত্র ভাবে অপরিজ্ঞাত গ্রহের স্থান ও গতি নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন।

এখন নেপ্‌চ্যুন্‌ সম্বন্ধে যে সকল তথ্য জানা গিয়াছে তাহা সংক্ষেপে বলিতেছি। নেপ্‌চ্যুন্‌ অতিশয় দূরবর্ত্তী বলিয়া উহার বিবরণ অতি সামান্যই জানিতে পারা গিয়াছে। নেপচ্যুনের ব্যাস ৩৪৫০০ মাইল অর্থাৎ পৃথিবীর ব্যাসের চারিগুণ হইতেও বৃহৎ। বৃহস্পতি ও শনির ন্যায় নেপচ্যুন্‌ও বাষ্পাবৃত। নেপ্‌চ্যুন ২৭৯৪০০০০০০ মাইল দূরে থাকিয়া সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিতেছে।

নেপ্‌চ্যুনের আয়তন ও দূরত্ব।

পৃথিবীর ন্যায় নেপচ্যুন্‌ও আপন মেরুদণ্ডের চারিদিকে আবর্ত্তন করে অর্থাৎ উহারও দিন-রাত্রি হয়। কিন্তু কত সময়ে নেপ্‌চ্যুন্‌ একবার আবর্ত্তন করে। তাহা এখনও স্থিরীকৃত হয় নাই। আমাদের ১৬৫ বৎসরে নেপ্‌চ্যুনের এক বৎসর হয়। অর্থাৎ সূর্য্যের চারিদিকে একবার ঘুরিয়া আসিতে উহার ১৬৫ বৎসর লাগে। কিন্তু তাই বলিয়া নেপ্‌চ্যুন্‌ খুব ধীরগামী নয়। উহা প্রতি সেকেণ্ডে তিন মাইল পথ চলে। পৃথিবীর ন্যায় নেপ্‌চ্যুনের একটী মাত্র চন্দ্র। লেসেল্‌ (Mr. Lesell) নেপ্‌চ্যুন্‌ আবিষ্কারের কিছুকাল পরেই এই চন্দ্রটী আবিষ্কার করেন। নেপ্‌চ্যুনের চন্দ্র ৫ দিন ২১ ঘণ্টা ৮ মিনিটে নেপ্‌চ্যুনকে প্রদক্ষিণ করিয়া থাকে। নেপ্‌চ্যুনের চন্দ্রের গতিও বোধ হয় পূর্ব্ব দিক হইতে পশ্চিম দিকে।

দিন ও বৎসর।

চন্দ্র।

নেপ্‌চ্যুন সৌর-জগতের সীমান্তে অবস্থিত। নেপ্‌চ্যুনের পরে আরও কোন গ্রহ আছে কিনা এ পর্য্যন্ত জানা যায় নাই।

আমরা বৎসরকে ছয় ঋতুতে বিভক্ত করিয়াছি। এক এক ঋতু দুই

যাস কাল স্থায়ী। নেপ্‌চ্যুনের এক বৎসর আমাদের ১৬৫ বৎসরের সমান সুতরাং উহার এক ঋতুই আমাদের প্রায় ২৮ বৎসরের সমান। এই হিসাবে আমাদের পৃথিবীর লোক দুই কি তিন ঋতুর বেশী বাঁচিবে না। গ্রীষ্মকালে কেহ জন্মিলে হেমন্তকাল তাহার অতিক্রম করিতে হইবে না।

ধূমকেতু।

অতি প্রাচীনকালে ধূমকেতুকে অমঙ্গলের পূর্ব্ব লক্ষণ বলিয়া লোকে বিশ্বাস করিত। আকাশে ধূমকেতু দেখা দিলে অমঙ্গলের পূর্ব্বলক্ষণ। রাষ্ট্রবিপ্লব, দুর্ভিক্ষ, মহামারী প্রভৃতি অমঙ্গলের আশঙ্কায় সকলে অধীর হইত। এখনও যে ধূমকেতুর ভয় দূর হইয়া গিয়াছে একথা বলা যায় না।

কেবল আমাদের দেশের অধিবাসীরাই ধূমকেতুকে অমঙ্গলের চিহ্ন বলিয়া মনে করিত তাহা নয়; এক সময়ে সকল দেশের লোকই ধূমকেতুর উদয় হইলে ভীত হইয়াছে।

বোধ হয় ধূমকেতুর সম্মার্জ্জনীর মত 'দুস্‌মন্‌' চেহারাই এক সময়ে সকল দেশের লোকের মনে ভয় জন্মাইত। সৌর-জগতের সূর্য্য এবং গ্রহ-উপগ্রহ সকলই গোলাকার। কেবল শনির বলয়টা কিছু অদ্ভুত। ধূমকেতুর আকৃতি অতিশয় বিকট এবং বিশাল। উহার চেহারাও আবার বড়ই পরিবর্ত্তনশীল এবং উহার গতিবিধিরও সাধারণতঃ কোন শৃঙ্খলা দেখা যায় না। হঠাৎ একদিন আকাশে ধূমকেতু দেখা দিল। ক্রমে উহার দেহ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, আবার অকস্মাৎ একদিন অদৃশ্য হইয়া গেল। আর তাহার সহিত দেখা নাই। অনন্ত আকাশে

কোথায় লুকাইল কেহ খুঁজিয়া পাইল না। এইরূপ অদ্ভুত জ্যোতিষ্ক অজ্ঞ লোকের মনে ভয়ের সঞ্চার করিবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি?

কোন কোন ধূমকেতু সপ্তাহকাল ব্যাপিয়া দৃষ্টিগোচর হয়। কোন কোন ধূমকেতু দুই এক মাস থাকে। আবার কোন কোন ধূমকেতু এক বৎসরের অধিককাল পর্য্যন্ত দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। কতকগুলি ধূমকেতু একবার দেখা দিয়া চিরদিনের জন্য অদৃশ্য হইয়া যায়। অনন্ত আকাশে অনন্তকাল উহারা ছুটিতে থাকে; আর ফিরিয়া আসেনা। লক্ষ লক্ষ বৎসর উহারা আকাশে ছুটিতে থাকিলেও উহাদের গতির বিরাম হইবে না, ভ্রমণের অবসান হইবে না। অকাশ কত বিস্তৃত কে তাহা নির্দ্ধারণ করিবে?

ধূমকেতুর গতিবিধি।

গ্রহসকল পশ্চিমদিক হইতে পূর্ব্বদিকে গমন করে, এ নিয়মের ব্যতিক্রম হয় না। কিন্তু সকল ধূমকেতু নিয়মের অধীন হইয়া চলে না। কতকগুলি ধূমকেতু পূর্ব্বদিক হইতে পশ্চিমদিকে গমন করে, আর কতকগুলি পশ্চিমদিক হইতে পূর্ব্বদিকে ভ্রমণ করিয়া থাকে। কতকগুলি ধূমকেতু নির্দ্দিষ্ট সময়ে আবার আকাশে দেখা দেয়। এ পর্য্যন্ত ১৩টী বিখ্যাত ধূমকেতুকে নিয়মিত সময়ে ফিরিয়া আসিতে দেখা গিয়াছে।

গ্রহগণের ন্যায় যে সকল ধূমকেতু বৃত্তাভাস পথে ভ্রমণ করে, সেই সকল ধূমকেতু নির্দ্দিষ্ট সময়ে আবার দেখা দেয়। যে সকল ধূমকেতু ক্ষেপণী বৃত্তে (Parabola) পরিভ্রমণ করে সেই সকল ধূমকেতু আর প্রত্যাবর্ত্তন করে না। কিন্তু কোন্ ধূমকেতু বৃত্তাভাস পথে চলিতেছে আর কোন্ ধূমকেতুর পথ ক্ষেপণী তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন। পটোল সদৃশ অতিশয় বাদামী পথও ক্ষেপণী বলিয়া ভ্রম হইয়া থাকে।

ধূমকেতুর পথ।
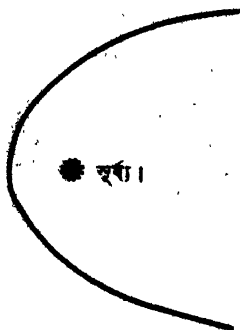
ক্ষেপণী-বৃত্ত।

সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত 'নিউটন্' মাধ্যাকর্ষণ আবিষ্কার করেন এবং তিনিই সপ্রমাণ করেন যে, মাধ্যাকর্ষণের নিয়মাধীন হইয়া গ্রহসকল বৃত্তাভাস (Ellipse) পথে সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে প্রদক্ষিণ করিতেছে। নিউটন্ ধূমকেতুর কক্ষ সম্বন্ধেও পূর্ব্বোক্ত নিয়ম প্রয়োগ করিয়া অনুমান করিয়াছিলেন যে,—"মাধ্যাকর্ষণ-বলে কোন কোন ধূমকেতুও সূর্য্যকে কেন্দ্র করিয়া বৃত্তাভাস-ক্ষেত্রে পরিভ্রমণ করিতে পারে, আর কোন কোন ধূমকেতু সূর্য্যকে কেন্দ্র করিয়া ক্ষেপণীবৃত্তেও (Parabola) ধাবিত হইতে পারে। গ্রহদিগের ন্যায় বৃত্তাভাস ক্ষেত্রে পরিভ্রমণ করিলে ধূমকেতুগুলি আবার নির্দ্দিষ্ট সময়ে আবির্ভূত হইবে। কিন্তু ক্ষেপণী-কক্ষে পরিভ্রমণ করিলে আর প্রত্যাবর্ত্তন করিবে না।" এই বিষয়েও নিউটনের অনুমান যথার্থ প্রমাণিত হইয়াছে।

ধূমকেতুর কক্ষ।

ধূমকেতুর দেহ বড়ই বিচিত্র। প্রথমতঃ সর্পের ফণার ন্যায় (Comma Shaped) বক্র মস্তক। মস্তকের অগ্রভাগে কতকটা স্থান নক্ষত্রের মত উজ্জ্বল দেখায়, উহাকে গর্ভ (Nucleus) বলা যাইতে

ধূমকেতুর গঠন।

পায়ে। গর্ভকে বেষ্টন করিয়া উজ্জ্বল বাষ্পরাশি বক্রাকারে অবস্থিত। উহাকেই আমরা ধূমকেতুর মস্তক বলিব।

অর্দ্ধুদাকৃতি ধূমকেতু (দোনাতির ধূমকেতু—১৮৫৮)।

ধূমকেতুর গর্ভের ব্যাস সাধারণতঃ ৫০০ পাঁচ শত মাইল হইতে ৫০০০ পাঁচ হাজার মাইল পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইতে দেখা গিয়াছে। যে উজ্জ্বল বাষ্পের ন্যায় পদার্থ ধূমকেতুর মস্তক বেষ্টন করিয়া থাকে উহার ব্যাস ২০০০০ বিশ হাজার হইতে ১০০০০০০ দশ লক্ষ মাইল পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইতে দেখা গিয়াছে। পৃথিবীর ব্যাস ৮০০০ মাইল মাত্র। সূর্য্য, পৃথিবী হইতে তের লক্ষ গুণ বড়, উহার ব্যাস ৮৬৬০০০ আট লক্ষ ছয়ষট্টি হাজার মাইল। সুতরাং ধূমকেতুর শুধু মস্তকটাই সৌর-জগতের সম্রাট্ সূর্য্য হইতে অনেক বৃহৎ। ধূমকেতুর মস্তক হইতে সুদীর্ঘ পুচ্ছ বাহির হয়। পুচ্ছ-শোভিত ধূমকেতুর দেহ অনেকটা সম্মার্জ্জনীর মত দেখায়।

ধূমকেতুর আকার অতিশয় পরিবর্ত্তনশীল। কখন উহার দীর্ঘপুচ্ছ দীর্ঘতর হয়, কখন পুচ্ছ একবারে অদৃশ্য হইয়া পড়ে। কখন উহার অবয়ব আয়তনে বৃদ্ধি পায় এবং উজ্জ্বলতাও বাড়ে। আবার কয়েক দিনের মধ্যে আয়তন ক্ষুদ্র হইয়া পড়ে এবং উজ্জ্বলতাও হ্রাস পায়। ধূমকেতু এত পরিবর্ত্তনশীল যে, উহার পরিমাণ স্থির করা বড়ই কঠিন। একদিন ধূমকেতু দেখিয়া আর কয়েকদিন পর উহাকে দেখিলে তাহা পূর্ব্বের ধূমকেতু কি না স্থির করা দুঃসাধ্য হয়।

ধূমকেতুর পুচ্ছটী অতীব কৌতুহলোদ্দীপক। এই বিচিত্র রহস্যপূর্ণ পুচ্ছ-সম্পদের অধিকারী বলিয়াই ধূমকেতু অপরাপর জ্যোতিষ্ক অপেক্ষা অধিকতর বিস্ময়জনক মনে হইয়া থাকে। কোন

ধূমকেতুর পুচ্ছ।

ধূমকেতুর পুচ্ছ অতিশয় দীর্ঘ হয়। উদয়-কালে ধূমকেতুর পুচ্ছ প্রায় থাকে না। তখন উহাকে উজ্জ্বল নক্ষত্রের মত দেখা যায়। ধূমকেতু যতই সূর্য্যের নিকট-বর্ত্তী হইতে থাকে, ততই উহার পুচ্ছ দীর্ঘ ও উজ্জ্বল হয়। যখন ধূমকেতু সূর্য্যের অতি সমীপবর্ত্তী হয় তখন অতি বেগে পুচ্ছ বর্দ্ধিত হইতে থাকে।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, ধূমকেতু যখন সূর্য্য হইতে দূরে অবস্থিতি করে তখন উহার পুচ্ছ থাকে না। থাকিলেও এত ক্ষুদ্র যে দৃষ্টিগোচর হয় না। ধূমকেতু যতই সূর্য্যের নিকটবর্ত্তী হইতে থাকে ততই উহার পুচ্ছ বাড়িতে থাকে। এই স্থলে আর একটী কথা বলা আবশ্যক। ধূমকেতুর সমস্ত শরীরই যে সূর্য্যাকর্ষণের অধীন তাহার সন্দেহ নাই। ধূমকেতু যখন নিজ পথে থাকিয়া ভ্রমণ করে তখন নিশ্চয়ই সূর্য্য এবং ধূমকেতু উভয়ই পরস্পরকে আকর্ষণ করে। কিন্তু ধূমকেতু যতই সূর্য্যের নিকটবর্ত্তী হইতে থাকে ততই উহার পুচ্ছ সূর্য্যের বিপরীত দিকে যাইতে থাকে। ধূমকেতুর পুচ্ছ কেন যে সূর্য্যের বিপরীত দিকে যায় উহার কারণ এ পর্য্যন্ত স্থিরীকৃত হয় নাই।

ধূমকেতু সূর্য্যের নিকটবর্ত্তী হইলে উহার গর্ভ ক্রমশঃ অধিকতর উজ্জ্বল হয়। তখন ধূমকেতুর গর্ভস্থ প্রদীপ্ত বাষ্পীয় পদার্থ জ্বলন্ত অগ্নিকণার ন্যায় উৎক্ষিপ্ত হইতে থাকে। ইহাই ধূমকেতুর পুচ্ছ। ধূমকেতু যতই সূর্য্যের নিকটে আইসে ততই তেজোময় পদার্থ অবিরাম প্রবলতর বেগে গর্ভ হইতে উদ্গীর্ণ হয়। পুচ্ছ ক্রমশঃ দীর্ঘ হইতে দীর্ঘতর হইতে থাকে। ধূমকেতু স্বীয়কক্ষে পরিভ্রমণ করিতে করিতে সূর্য্য হইতে যতই দূরে সরিয়া যাইতে থাকে ততই পুচ্ছও খর্ব্ব হইতে থাকে।

সকল ধূমকেতুর পুচ্ছের আকৃতি এক প্রকার নয়। পণ্ডিতেরা ধূমকেতুর পুচ্ছকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন।* প্রথম শ্রেণীর ধূমকেতুর পুচ্ছ সরল এবং দীর্ঘ। দ্বিতীয় শ্রেণীর ধূমকেতুর বহু পুচ্ছ কাগজের ভাজকরা পাখার ন্যায় স্তরে স্তরে একত্রীকৃত। আর তৃতীয় শ্রেণীর পুচ্ছ অতিশয় বক্র এবং হ্রস্ব। ঐ বিভিন্ন আকারের পুচ্ছ-সমূহের উপাদানও স্বতন্ত্র।

কতকগুলি ধূমকেতু গ্রহসকলের ন্যায় সৌর-জগতের অধিবাসী। উহারা সূর্য্যের আকর্ষণ অতিক্রম করিয়া যাইতে পারে না। এই

ধূমকেতুর গতি ও আবির্ভাব কাল।

শ্রেণীর ধূমকেতু নির্দ্দিষ্ট পথে, নিয়মিত সময়ে সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিতেছে। উহাদের কোনটী দুই বৎসরে, কোনটী তিন বৎসরে, কোনটী আবার ৭৫।৭৬ বৎসরে সূর্য্য-প্রদক্ষিণ করে। এমন ধূমকেতুও দুই একটী দেখা গিয়াছে, সূর্য্যকে একবার প্রদক্ষিণ করিতে যাহাদের ২০০০। ৩০০০ হাজার বৎসর কিংবা তার চেয়েও বেশী সময় লাগে।

---

* প্রথম শ্রেণীর অর্থাৎ যে সকল পুচ্ছ সরল ও দীর্ঘ, উহাতে হাইড্রোজেনের পরিমাণ অধিক। বহুপুচ্ছে হাইড্রু-কার্ব্বনের আধিক্য। তৃতীয় শ্রেণীর পুচ্ছে ক্লোরিণ, লৌহ এবং অন্যান্য যৌগিক পদার্থ বিদ্যমান আছে।

পূর্ব্বোক্ত ধূমকেতু ব্যতীত আর এক শ্রেণীর ধূমকেতু আছে উহারা সৌর-জগতের প্রজা নহে। উহারা কোথা হইতে আসে এবং কোথায় চলিয়া যায়, তাহা কেহ এ পর্য্যন্ত ঠিক করিতে পারে নাই। উহারা সুদূর আকাশ হইতে আসিয়া আবার একদিকে ছুটিয়া পালায়। পণ্ডিতেরা বলেন, ঐ সকল ধূমকেতু নিকটতম নক্ষত্রের রাজ্য হইতে আসিলেও উহাদের পুনরায় সেই স্থানে ফিরিয়া যাইতে লক্ষ বৎসর লাগিবে। এই শ্রেণীর ধূমকেতুও আকাশে অনেক আছে।

ধূমকেতুসকলের গতিও বড় সাধারণ নয়। উহারা প্রচণ্ডবেগে স্বীয় স্বীয় কক্ষে বিচরণ করে। ১৬৮০ খৃষ্টাব্দে যে ধূমকেতু উদয় হইয়াছিল উহার গতির কথা চিন্তা করিলে অবাক্ হইতে হয়। ঐ ধূমকেতু প্রতি ঘণ্টায় প্রায় ৮ লক্ষ মাইল চলে, তথাপি উহার একবার সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিতে ৫৭৪ বৎসর লাগে। এখন অনুমান কর উহার কক্ষ কত বৃহৎ! আর ব্রহ্মাণ্ডই বা কত বিস্তৃত!

পণ্ডিতেরা অনুমান করেন, লক্ষ লক্ষ ধূমকেতু অনন্ত আকাশে বিচরণ করিতেছে। এ পর্য্যন্ত এক হাজার ধূমকেতুর কথা লিপিবদ্ধ হইয়াছে। ইহার মধ্যে ১১৮টীর পুনরাগমন দৃষ্ট হইয়াছে। বাকী গুলি হয় তো আবার দেখা দিবে। আর কতকগুলি চিরদিনের জন্য অন্তর্হিত হইয়াছে। উহারা অচিন্তনীয় গতিতে অনন্ত আকাশে লক্ষ লক্ষ বৎসর ছুটিতে থাকিবে, তবু উহাদের ভ্রমণের পরিসমাপ্তি হইবে না। ঐ সকল সৌর-জগতের অতিথি কোথা হইতে আসিয়া কোথায় চলিয়া যায় তাহা নির্দ্ধারণ করা মানবের বুদ্ধির অতীত।

কয়েকটী প্রসিদ্ধ ধূমকেতুর সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

বিয়েলা (Biela) নামক একজন অষ্ট্রিয়াবাসী জ্যোতির্ব্বিদ্ ১৮২৬ খৃষ্টাব্দে একটী ধূমকেতু আবিষ্কার করেন। তাঁহার নামানুসারেই এই

ধূমকেতুর নামকরণ হইয়াছে। পণ্ডিতেরা গণনা করিয়া দেখিলেন যে ১৭৭২ খৃঃ এবং ১৮০৬ খৃঃ যে ধূমকেতু দেখা দিয়াছিল ইহা সেই ধূমকেতু। বিয়েলার আবিষ্কারের পর উহা ১৮৩২ খৃঃ আবার দৃষ্টিগোচর হয়। ১৮৪৩ খৃঃ এক অত্যাশ্চর্য্য ব্যাপার ঘটিল। ঐ বৎসর দেখা গেল, বিয়েলার ধূমকেতুর উত্তরাংশ কিছু স্ফীত হইয়া উঠিয়াছে। হঠাৎ একদিন সেই ধূমকেতু দ্বিখণ্ড হইয়া পড়িল এবং ঐ খণ্ডদ্বয় স্বতন্ত্র দুইটী ধূমকেতুতে পরিণত হইল! দুই শীর্ষ, দুই গর্ভ, দুই পুচ্ছ! একটী কিছু বড় আর একটী কিছু ছোট। উভয়ের মধ্যে প্রায় দশ লক্ষ মাইল ব্যবধান। উভয়েই একদিকে সমান বেগে ভ্রমণ করিতেছে। এই অত্যাশ্চর্য্য যুগল-ধূমকেতু আর দৃষ্টিগোচর হয় নাই। বোধ হয় উহার অস্তিত্ব আর নাই। উহা চিরদিনের জন্ত লয় পাইয়া গিয়াছে।

বিয়েলার ধূমকেতু।

১৮৭২, ১৮৮৫ ও ১৮৯২ খৃষ্টাব্দের নবেম্বর মাসে যখন পৃথিবী বিয়েলার ধূমকেতুর পথ অতিক্রম করিয়া গমন করে, তখন উক্ত তিন বৎসরই পৃথিবীতে অনেক উল্কা-পাত হয়। ঐ সকল উল্কা-পিণ্ডকে অনেকে বিয়েলার ধূমকেতুর ধ্বংসাবশেষ বলিয়া মনে করেন।

১৮৬০ খৃষ্টাব্দে আমেরিকার ব্রাজিল প্রদেশ হইতে একটী যুগল-ধূমকেতু দৃষ্ট হইয়াছিল।

১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের দোনাতি (Donati) আবিষ্কৃত ধূমকেতু প্রথমতঃ একটী উজ্জ্বল ঘনীভূত বাষ্প-পিণ্ডের ন্যায় দৃষ্টিগোচর হইয়াছিল। তখন উহার অতি ক্ষুদ্র পুচ্ছ ছিল। দূরবীক্ষণ ব্যতীত তাহা দেখা যাইত না। ক্রমে যখন ঐ ধূমকেতু সূর্য্যের অতি নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল তখন প্রতিদিন দুই লক্ষ মাইল হিসাবে উহার পুচ্ছ বাড়িতে লাগিল। ১৮১১ খৃষ্টাব্দে একটী ধূমকেতু দৃষ্ট হইয়াছিল, উহার

দোনাতির ধূমকেতু।

পুচ্ছ প্রতিদিন প্রায় কোটী মাইল বাড়িত। এই ধূমকেতুর পুচ্ছের পরিমাণ দশ কোটি নব্বই লক্ষ মাইল লম্বা এবং এক কোটী পঞ্চাশ লক্ষ মাইল চওড়া হইয়াছিল। ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে যে ধূমকেতু

বহু-পুচ্ছ ধূমকেতু। (১৭৪৪ খৃঃ)

দেখা দিয়াছিল উহার পুচ্ছের তুলনায় পূর্ব্বোক্ত ধূমকেতুর সকলের পুচ্ছকেই ক্ষুদ্র বলিতে হয়। এই ধূমকেতু সূর্য্যের অতিশয় নিকটবর্ত্তী হইলে প্রত্যহ সাড়ে তিন কোটী মাইল হিসাবে উহার পুচ্ছ বৃদ্ধি পাইতে থাকে। এই সুবৃহৎ ধূমকেতুর পুচ্ছের দৈর্ঘ্য বিশ কোটি মাইল হইয়াছিল।

বহু পুচ্ছবিশিষ্ট ধূমকেতুও মাঝে মাঝে আকাশে আবির্ভূত হইয়া থাকে। পূর্ব্বোল্লিখিত দোনাতির ধূমকেতুর দুইটী পুচ্ছ।

১৭৪৪ অব্দে একটী ধূমকেতু দেখা দিয়াছিল উহার ছয়টী পুচ্ছ ছিল। এই ধূমকেতু না জানি দেখিতে কিরূপ

বহু-পুচ্ছ ধূমকেতু।

বিচিত্র! পুচ্ছবিহীন ধূমকেতুও আকাশে দেখা দিয়া থাকে। কিন্তু উহা সকলের দৃষ্টিপথে পতিত হয় না এবং বড় কৌতূহলও উদ্দীপ্ত করে না। ধূমকেতু নক্ষত্রসমূহের তুলনায় পৃথিবীর খুব নিকটবর্ত্তী। এক এক সময় ধূমকেতু, পৃথিবী এবং নক্ষত্রের মধ্যবর্ত্তী হয়। ধূমকেতুর পুচ্ছের ভিতর দিয়া নক্ষত্রসকল দৃষ্টিগোচর হয় এবং উহাদের জ্যোতিঃও ম্লান বোধ হয় না।

সার জন হর্শেল একবার দূরবীক্ষণদ্বারা দেখিয়াছিলেন যে, বিয়েলার ধূমকেতু (Biela's Comet) একটী অপেক্ষাকৃত ক্ষীণ-জ্যোতিঃ নক্ষত্রপুঞ্জের (Starcluster) উপর আসিয়া পড়িল তথাপি ঐ নক্ষত্রপুঞ্জের অতি ক্ষুদ্র এবং মৃদু আলোকবিশিষ্ট নক্ষত্রটীও অদৃশ্য হইল না। যদি ঐ নক্ষত্রপুঞ্জের উপর একখণ্ড অতি পাতলা মেঘ পতিত হইত, তাহা হইলে উহা যে একবারে অদৃশ্য হইয়া যাইত সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। দুই তিন শত ফিট পুরু একখানি মেঘ প্রখর সূর্য্য-কিরণ একবারে আচ্ছাদিত করিয়া ফেলে কিন্তু এক লক্ষ ফিট পুরু ধূমকেতুর পুচ্ছ নক্ষত্রের ক্ষীণ জ্যোতিঃও প্রতিরোধ করিতে সমর্থ হয় না। ইহাতেই প্রতীয়মান হয় ধূমকেতুর পুচ্ছ অতিশয় পাত্‌লা বাষ্পে গঠিত।

সুপ্রসিদ্ধ জ্যোতিষী 'হেলি' (Edmund Halley) এই ধূমকেতুর কক্ষ এবং ইহার গতিবিধি নির্দ্ধারণ করেন, এইজন্ত তাঁহার নাম অনুসারে উহাকে 'হেলির ধূমকেতু' বলা হইয়া থাকে।

হেলির ধূমকেতু।

হেলি, ধূমকেতু সম্বন্ধে একটী তথ্য আবিষ্কার করিয়াছেন। গ্রহসমূহ বৃত্তাভাস কক্ষে সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করে, ইহা পূর্ব্বেই প্রদর্শিত

হেলির ধূমকেতু। (১৯১০ খৃঃ)

হইয়াছিল। কিন্তু 'হেলির' পূর্ব্বে ধূমকেতুর গতিবিধি সম্বন্ধে কিছুই

জানা ছিল না। নিউটন্ অনুমান করিয়াছিলেন, গ্রহগণের ন্যায় ধূমকেতুও বৃত্তাভাস কক্ষে বিচরণ করিতে পারে। নিউটনের অনুমান হেলি সপ্রমাণ করেন। হেলি দেখিলেন ১৬৮২ খৃষ্টাব্দে তিনি যে ধূমকেতু দেখিয়াছিলেন উহার, ১৫৩১ খৃঃ ও ১৬০৭ খৃঃ দৃষ্ট ধূমকেতুর একই কক্ষ। তখন তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস হইল যে, এই তিনটী ভিন্ন ভিন্ন ধূমকেতু নহে। একটী ধূমকেতু ৭৫।৭৬ বৎসর পর পৃথিবী হইতে দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। এই সিদ্ধান্ত করিয়া 'হেলি' প্রচার করিলেন যে, ১৬৮২ খৃষ্টাব্দে দৃষ্ট ধূমকেতু ১৭৫৭ কিংবা ১৭৫৮ খৃষ্টাব্দে আবার দৃষ্টিগোচর হইবে। এই ভবিষ্যদ্বাণী জ্যোতিষশাস্ত্রের ইতিহাসে একটী স্মরণীয় ঘটনা।

স্বীয় সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে হেলির এমনই দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, তিনি ঐ ধূমকেতুর পুনরাগমনকাল পর্য্যন্ত বাঁচিয়া থাকিবেন না মনে করিয়া লিখিয়াছিলেন,—"যদি আমাদের ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে ঐ ধূমকেতু ১৭৫৮ অব্দে পুনরাগমন করে তাহা হইলে নিরপেক্ষ উত্তর পুরুষগণ, একজন ইংরেজ কর্ত্তৃক ইহা আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা অস্বীকার করিবেন না।"

৭৫ বৎসর পর সেই ধূমকেতুর পুনরাগমন কাল যতই নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল, জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণের হৃদয়ে ততই অনিবার্য্য কৌতূহল জন্মিতে লাগিল। সকলেই উপযুক্ত যন্ত্রাদি লইয়া প্রতীক্ষা করিয়া রহিলেন। নির্দ্দিষ্ট সময়ের কয়েক মাস পূর্ব্ব হইতেই আকাশে সেই ধূমকেতুর অন্বেষণ আরম্ভ হইল। অবশেষে সত্য সত্যই ১৭৫৮ খৃষ্টাব্দের ২৬শে ডিসেম্বর হেলির ধূমকেতু প্রথম দৃষ্ট হইল। হেলির ভবিষ্যদ্বাণী সফল হইল। হায়! হেলি জীবিত থাকিলে তাঁহার কি আনন্দই না হইত! তথাপি হেলীর নাম জ্যোতিষশাস্ত্রের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। ইহার পর ১৮৩৫ খৃঃ হেলির ধূমকেতুর

পুনরায় উদয় হইয়াছিল। গত ১৯১১ খৃঃ ঐ ধূমকেতু আবার দেখা দিয়াছিল।

হেলির ধূমকেতুর একটু বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া আবশ্যক মনে করিতেছি। কেননা, হেলির ধূমকেতুই সর্ব্বাপেক্ষা বিখ্যাত। বিশেষতঃ বিগত ১৩১৭ সনের বৈশাখ হইতে আষাঢ় মাস পর্য্যন্ত এই ধূমকেতুকে আমরা আকাশে উদয় হইতে দেখিয়াছি এবং আমরা কেহই এই জীবনে আর হেলির ধূমকেতু দেখিব এরূপ সম্ভাবনা নাই। অনেকের ভাগ্যেই হেলির ধূমকেতু দেখা ঘটে না। ছিয়াত্তর বৎসর পর ইহা একবার দেখা দেয়, ইহার মধ্যে পৃথিবীর পৃষ্ঠের কত পরিবর্ত্তন ঘটে, কত লোকের আবির্ভাব ও তিরোভাব হয়, কত রাজ্যের ভাগ্য-চক্র আবর্ত্তন করিয়া আইসে! এই হেলির ধূমকেতু যে কত রাজ্যের উত্থান ও পতন দর্শন করিয়াছে তাহার সংখ্যা করাও অসাধ্য। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের প্রারম্ভে নাকি এই ধূমকেতুর উদয় হইয়াছিল! তারপর পাঠান ও মোগল রাজত্বের অবসান কালেও এই ধূমকেতু আকাশ হইতে হিন্দুস্থানের বিরাট নাট্যশালায় বিয়োগান্ত অভিনয় প্রত্যক্ষ করিয়াছে। যে বৎসর নর্ম্মানেরা ইংলণ্ড জয় করে এবং রোমান্ সৈন্যেরা যে বৎসর জেরুজালেম নগরী ধ্বংস করে, তখনও এই ধূমকেতু দেখা দিয়াছিল। আবার যখন ১৯৮৭ খৃষ্টাব্দে উহার উদয় হইবে, তখন না জানি আরও কত রাজ্য জলবুদ্বুদের ন্যায় কাল-সাগরে বিলীন হইয়া যাইবে! সেই স্থানে আবার কত অভিনব রাজ্যের অভ্যুদয় হইবে!

ছিয়াত্তর বৎসর পূর্ব্বে যখন হেলির ধূমকেতু দেখা দিয়াছিল তখন বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাদির এত উন্নতি হয় নাই। ১৩১৭ সনে জ্যোতির্ব্বিদেরা এই ধূমকেতুর অনেক 'ফটোগ্রাফ' তুলিয়াছেন এবং ন্যায়ালেন্স হইতে তাঁহারা যন্ত্র-সাহায্যে ইহার গঠন ও উপাদান

সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে পরীক্ষা করিয়াছেন। ১৬ই এপ্রিল তারিখে ইউরোপে হেলির ধূমকেতু প্রথম দেখা দিয়াছিল। জ্যোতির্ব্বিদেরা সেই তারিখ হইতে তিন দিন পর্য্যন্ত ইহার যে সকল চিত্র তুলিয়াছিলেন তাহার সকলগুলিতেই কেবল একটী বৃহৎ ডিম্বাকার মুণ্ড দেখিতে পাওয়া যায়। ২১শে এপ্রিল তারিখে ক্ষুদ্র পুচ্ছের উদ্গম প্রথমে ধরা পড়ে। তার পর পুচ্ছ ক্রমেই বাড়িতে আরম্ভ হইল। সমস্ত বৈশাখ মাস ইহা পূর্ব্বাকাশে শুক্র গ্রহের খুব নিকটে দৃষ্ট হইয়াছিল। তার পর ইহা ক্রমশঃ সূর্য্য ও পৃথিবীর নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল। এই সময়ে ফরাসী জ্যোতির্ব্বিদ্ ক্লেমেরিয়োঁ। ঘোষণা করিলেন, যখন হেলির ধূমকেতু পৃথিবী ও সূর্য্যের ঠিক মধ্য স্থানে আসিবে তখন পৃথিবীকে ইহার পুচ্ছের ভিতর দিয়া যাইতে হইবে।

প্রলয়ের ভবিষ্যদ্বাণী।

তৎকালে ধূমকেতুর পুচ্ছের বিষাক্ত বাষ্পে পৃথিবীর সকল প্রাণী প্রাণত্যাগ করিবে। প্রলয়ের এই ভবিষ্যদ্বাণী শুনিয়া সকল দেশের অধিবাসীই অল্পাধিক বিচলিত হইয়াছিল। কেননা, এত আর বাজে লোকের কথা নয়। জ্যোতিষ শাস্ত্রে ক্লেমেরিয়োঁ। অসাধারণ পণ্ডিত, তাঁহার কথা ব্যর্থ হইতে পারে না। হিসাব করিয়া দেখা গেল ৫ই জ্যৈষ্ঠ হেলির ধূমকেতু সূর্য্য ও পৃথিবীর মধ্যে আসিয়া দাঁড়াইবে, সুতরাং ৫ই জ্যৈষ্ঠই প্রলয়ের দিন! সেই তারিখে বিধাতার রাজ্যের কোটী কোটী নরনারীর অপমৃত্যু হইবে! ৪ঠা জ্যৈষ্ঠ হেলির ধূমকেতুর পুচ্ছের দৈর্ঘ্য পাঁচকোটী মাইলেরও অধিক হইয়াছিল। সুতরাং পৃথিবীকে ৫ই তারিখ নিশ্চয়ই ঐ পুচ্ছের ভিতর দিয়া যাইতে হইয়াছিল। কিন্তু তাহাতে অনিষ্ট হওয়া দূরের কথা আমরা কিছু টেরই পাই নাই। সেই দিন আমাদের দেশে ও পৃথিবীর অন্যান্য স্থানে ঝড় বৃষ্টি, জলপ্লাবন ও বজ্রপাত ইত্যাদি হইয়াছিল। ধূমকেতুর আবির্ভাবের সহিত এই প্রাকৃতিক

উৎপাতের কোন সম্বন্ধ আছে কি না তাহা বলা যায় না। চিরকালই বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে প্রাকৃতিক নিয়মে ঝড় বৃষ্টি হইয়া থাকে।

আষাঢ় মাসে হেলির ধূমকেতু পশ্চিম আকাশে কর্কট ও সিংহ রাশির নিকটে দেখা গিয়াছিল। তার পর ইহা ক্রমে নক্ষত্রের ন্যায় ক্ষুদ্র হইয়া অদৃশ্য হইয়া গেল। বিশ্বরাজ্যের এই অদ্ভুত জ্যোতিষ্ক আর আমাদের নয়নগোচর হইবে না।

কয়েকটী প্রসিদ্ধ ধূমকেতুর সূর্য্য-প্রদক্ষিণ কাল নিম্নে প্রদত্ত হইল।

নাম	সূর্য্য-প্রদক্ষিণকাল	যত বার দৃষ্ট হইয়াছে
এঙ্কি	৩ বৎসর	২৯
টেম্পেল্	৫ "	৪
উইনেক্	৫ "	৭
ঝিয়েলা	৬ "	৬
উল্ফ্	৬ "	৬
ফিন্লে	৬ "	২
টাট্ল্	১৩ "	৫
পন্স্ব্রুক্স্	৭১ "	২
অল্বারস্	৭২ "	২
হেলি	৭৬ "	২৪

উল্কা।

রাত্রিকালে আকাশের দিকে কিছুকাল তাকাইয়া থাকিলে মধ্যে মধ্যে যেন এক একটী নক্ষত্র খসিয়া পড়িতেছে দেখা যায়। বাস্তবিক উহা নক্ষত্র নহে, উল্কা (Shooting Stars)। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, নক্ষত্রগুলি অনেক বড়, এক একটা নক্ষত্র এক একটা সূর্য্য। নক্ষত্র যদি ঐরূপ ছুটিয়া আসিয়া আমাদের পৃথিবীতে পড়িত, তাহা হইলে বহু পূর্ব্বেই পৃথিবীর ধ্বংস হইত।

উল্কাপাতকেই সাধারণ লোকে 'তারা-খসা' বলে। উল্কাগুলি যখন আকাশ হইতে ছুটিয়া পড়ে, তখন দেখিলে বোধ হয় যেন তারাগুলিই খসিয়া পড়িতেছে। বহুসংখ্যক উল্কা যখন হাউইর মত আকাশ হইতে ছুটিয়া আইসে তখন দেখিতে বড়ই সুন্দর দেখায়!

সর্ব্বদাই উল্কাপাত হইতেছে। একজন পণ্ডিত গণনা করিয়া বলিয়াছেন, গড়ে প্রতিবৎসর ছোট বড় প্রায় ১৪,৬০০,০০০০০০০ চৌদ্দহাজার ছয় শত কোটী উল্কা-পিণ্ড পৃথিবীতে পতিত হয়। দিনের বেলায়ও উল্কা-পাত হয় কিন্তু সূর্য্যের প্রখর আলোকে দৃষ্টিগোচর হয় না।

উল্কা-পিণ্ডের গড়।

গ্রহাদির তুলনায় উল্কার আয়তন অতি ক্ষুদ্র। অধিকাংশ উল্কা-পিণ্ডই ছোট ছোট প্রস্তরখণ্ডের ন্যায়। এ পর্য্যন্ত দুই শত মণের অধিক ওজনের উল্কা-পিণ্ড পতিত হয় নাই। কঙ্করের মত ক্ষুদ্র উল্কা-পিণ্ড কোটী কোটী পড়িতেছে।

উল্কা পিণ্ডের আকার ও আয়তন।

প্রস্তর খণ্ড হইতে উল্কা-পিণ্ডগুলি চিনিয়া বাছিয়া বাহির করা অতি কঠিন কাজ। সমুদ্রের তীরে, বিস্তৃত মাঠে কিম্বা মরুভূমিতে বহুসংখ্যক উল্কা-পিণ্ড পড়িয়া থাকে। আমরা উহাদিগকে দেখিলেও সাধারণ পাথর মনে করিয়া উপেক্ষা করি। বাস্তবিক্ আগ্নেয়গিরি হইতে উৎক্ষিপ্ত পাথর ও উল্কা-পিণ্ডে বিশেষ কোন পার্থক্য দেখা যায় না। যে সকল উল্কা-পিণ্ড মানুষের সম্মুখে পৃথিবী-পৃষ্ঠে আসিয়া পড়িয়াছে, কেবল সেইগুলিই যত্নের সহিত 'মিউজিয়ম্' ইত্যাদি স্থানে রক্ষিত হইয়াছে। কলিকাতা মিউজিয়মেও অনেক উল্কা-পিণ্ড আছে। সাধারণ লোক ঐ সকল পাথর দেখিয়া বড় একটা আমোদ পায় না। উহারা যে এককালে শূন্যে বিচরণ করিত, তারপর এক দিন নক্ষত্রের মত ছুটিয়া আসিয়া পৃথিবীতে পড়িয়াছে, সেই কৌতূহল-পূর্ণ ইতিহাস সাধারণ লোকে জানে না। তাই ঐ পাথরগুলি তাহাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে সমর্থ হয় না।

অগ্নিবৃষ্টি ও পুষ্পবৃষ্টি।

উল্কাপাত দেখিয়া সকল দেশেরই প্রাচীন কালের লোকেরা অতিশয় বিস্মিত হইত। তাহারা উল্কাপাতের কারণ জানিত না। তখন নানাপ্রকার কাল্পনিক ব্যাখ্যার সাহায্যে তাহারা উল্কাপাত ব্যাপারটা বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছিল। নানাদেশের প্রাচীন গ্রন্থে আকাশ হইতে অগ্নিবৃষ্টি ও পুষ্পবৃষ্টি হইবার কথা উল্লিখিত হইয়াছে। অগ্নিবৃষ্টি ও পুষ্পবৃষ্টি এই উল্কা-বৃষ্টিকেই বুঝাইতেছে বলিয়া ধারণা হয়। বোধ হয় কোন শুভ ব্যাপার, কি প্রসিদ্ধ ঘটনা কালে আকাশ হইতে প্রচুর উল্কাপাত হইলে উহাকেই দেবতাদের আশীর্ব্বাদ-সূচক পুষ্প-বৃষ্টি মনে করা হইত। আর অশুভ ব্যাপারে কিম্বা দুর্ঘটনা-কালে অধিক সংখ্যক উল্কাপাত হইলে উহাকে অমঙ্গলসূচক অগ্নিবৃষ্টি নামে অভিহিত করা হইত। মহাপুরুষদিগের জন্মকালে স্বর্গ হইতে পুষ্পবৃষ্টি

হইবার কথা শুনা যায়। আরব দেশের ইতিহাসে লিখিত আছে যে, যে রাত্রে ইব্রাহিম বেন্ আহাম্মদ নামক সম্রাট্ প্রাণত্যাগ করেন সেই রাত্রে অগ্নিবৃষ্টি হইয়াছিল। সক্রেটিস যে রাত্রিতে জন্মগ্রহণ করেন সেই রাত্রিতে একটী প্রকাণ্ড উল্কা পতিত হইয়াছিল।

কয়েকটী উল্কা-পিণ্ডের বিবরণ।

উল্কা-পিণ্ড পতিত হইবার সময় কখন কখন ভয়ানক শব্দ হইয়া থাকে। এক এক সময়ে এই শব্দ বজ্রপাতের শব্দের ন্যায় ভীষণ হয়। ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে অগ্রহায়ণ মাসে দুই প্রহরের সময় বিষ্ণুপুরের নিকটবর্ত্তী এক গ্রামে একটী উল্কা-পিণ্ড পতিত হয়। উহা পড়িবার সময় কামানের শব্দের ন্যায় ভয়ানক শব্দ হইয়াছিল। ঐ উল্কা-পিণ্ড এখন কলিকাতা 'এসিয়াটিক্ সোসাইটী'র গৃহে রক্ষিত আছে।

১৮৭৬ খৃষ্টাব্দের ২০শে এপ্রিল বেলা সাড়ে তিন ঘটিকার সময় ইংলণ্ডের অন্তঃপাতী শ্রপ্‌সায়ারে (Shropshire) একটী প্রকাণ্ড উল্কা পড়িয়াছিল। এই উল্কা-পিণ্ডটী দেখিতে নিরেট লোহার মত। উহা পৃথিবীতে পড়িবার সময় এমন ভীষণ শব্দ হইয়াছিল যে, ৭।৮ মাইল দূরবর্ত্তী স্থানের লোকেরাও ভয়ে অধীর হইয়াছিল। পূর্ব্বোক্ত উল্কা-পিণ্ডটী এক কৃষকের ক্ষেত্রে পতিত হয়। কৃষক সেই সময়ে তথায় উপস্থিত ছিল। সে দৌড়িয়া গিয়া দেখিল তাহার ক্ষেতের এক হাত মাটির নীচে একটা লৌহ-পিণ্ড পড়িয়া রহিয়াছে। স্পর্শ করিয়া দেখিল, উহা তখনও উত্তপ্ত রহিয়াছে। ফরাসী দেশে উল্কা পড়িয়া একটা গোলাঘর একবারে পুড়িয়া গিয়াছিল।

১৮০৭ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে আমেরিকার অন্তর্গত "কনেক্টীকট্" প্রদেশে একটী উল্কাপাত হইয়াছিল। উহা পৃথিবীতে পড়িবার পূর্ব্বে শূন্যে তিনবার তোপের ন্যায় শব্দ হইয়াছিল। এই উল্কা-পিণ্ডের যত-গুলি খণ্ড পাওয়া গিয়াছে তাহাদের মোট ওজন প্রায় তিন মণ।

১৮৬০ খৃষ্টাব্দে ওহিও প্রদেশে একটী উল্কা-পিণ্ড পড়িয়াছিল, উহার ওজন প্রায় ৮ মণ।

উল্কাগুলির আলোক নাই। কিন্তু উল্কা যখন আকাশ হইতে পতিত হয় তখন জলন্ত হাউইর মত দেখা যায়। ইহার কারণ পরে বলিব। লৌহ, তামা, টিন্, গন্ধক, নিকেল্, কোবাল্ট, মেঙ্গেনিস্, গ্রেফাইট্, চুণ, সোরা প্রভৃতি কতকগুলি পদার্থ উল্কা-পিণ্ডে দেখিতে পাওয়া যায়। পৃথিবীতে যে বস্তু নাই, সে বস্তু উল্কাতেও দেখিতে পাওয়া যায় না। পৃথিবীর খনির মধ্যে বিশুদ্ধ লৌহ ও বিশুদ্ধ নিকেল্ ধাতু পাওয়া যায় না, উহাদের সহিত অন্য বস্তু মিশ্রিত থাকে; পরে পরিষ্কৃত করিয়া লইতে হয়। কিন্তু উল্কা-পিণ্ডে যে লৌহ ও নিকেল পাওয়া যায় তাহা বিশুদ্ধ। কথিত আছে, পারস্যের সাহের এবং তিব্বতের বৌদ্ধগুরু লামার তরবারি উল্কার লৌহদ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছে।

উল্কার উপাদান।

প্রতিদিন গড়ে ছোট বড় ৪০,০০০০০০০০ চল্লিশ কোটী উল্কা পৃথিবীতে পতিত হয়। যদি লক্ষ উল্কা-পিণ্ডের মধ্যে একটাও মানুষের উপরে পড়িত, তাহা হইলে এতদিনে পৃথিবী জন-শূন্য হইয়া যাইত। কিন্তু এপর্য্যন্ত উল্কাপাতে সমস্ত পৃথিবীতে দুই তিনটী লোকের বেশী মরিতে শুনা যায় নাই। কিরূপে আমরা এই ভীষণ উৎপাত হইতে রক্ষা পাইতেছি তাহা জানিবার জন্য কৌতূহল হওয়া স্বাভাবিক।

উল্কাপাতে মৃত্যু।

জলমগ্ন গোলকের ন্যায় আমাদের পৃথিবী বায়ুর মধ্যে ডুবিয়া আছে। পৃথিবীর চারিদিকেই বায়ুর আবরণ (Atmosphere)। এই আবরণের গভীরতা, কেহ কেহ বলেন পঞ্চাশ মাইল। আবার কোন কোন পণ্ডিত অনুমান করেন, পৃথিবীর ৪০০।৫০০ শত মাইল

উপরেও বায়ু আছে। সুদূর আকাশ হইতে কোন পদার্থ যখন পৃথিবীতে পতিত হয় তখন ঐ পদার্থকে বায়ু-স্তর ভেদ করিয়া আসিতে হয়। বায়ু খুব হাল্‌কা। হাল্‌কা হইলেও গতিশীল বস্তুকে বাধা দিয়া থাকে। গতির বেগ যত বৃদ্ধি পায় বায়ুর প্রতিরোধ করিবার শক্তিও তত প্রবল হয়। জলে অঙ্গুলি স্থাপন করিলে জল সরিয়া যায় কিন্তু জলের ভিতর দিয়া কামানের গোলাও বেশী দূর অগ্রসর হইতে পারে না।

বায়ুর দুর্ভেদ্য আবরণ।

বায়ুর গতিরোধ করিবার শক্তি অনেকটা জলের মতই। দৌড়িবার সময় বায়ু আমাদিগকে বাধা দেয়; গতিশীল রেলগাড়ীকে আরও বেশী বাধা দিয়া থাকে। খুব দ্রুতগামী রেলগাড়ী ঘণ্টায় ৬০ মাইল চলে, কিন্তু উল্কাগুলি মিনিটে ১৮০০ এক হাজার আট শত মাইল গতিতে পৃথিবীর বায়ু-মণ্ডল ভেদ করিয়া আইসে। সুতরাং বায়ু উল্কাগুলিকে অত্যন্ত বাধা দিয়া থাকে। ঘর্ষণে তাপের উৎপত্তি হয়। "ফুটবলে" বায়ু পূরিবার সময় সামান্য ঘর্ষণে পাম্পের (Pump) চোঙ গরম হইয়া উঠে। বায়ুর সহিত উল্কা-পিণ্ডসমূহের সংঘর্ষণ তার চেয়ে হাজার হাজার গুণ বেশী হয়। সুতরাং অতি অল্প সময়ের মধ্যেই উল্কা-পিণ্ড-সকল অতিশয় উত্তপ্ত হয়। উত্তাপ যতই বৃদ্ধি পায় উল্কা-পিণ্ডসমূহ ততই রক্তবর্ণ ধারণ করিতে থাকে। অবশেষে উত্তাপের মাত্রা অতিশয় বৃদ্ধি পাইলে উল্কা-পিণ্ডগুলি শ্বেতবর্ণ ধারণ করে এবং তখনই জলন্ত বাষ্পে পরিণত হয়। আমরা সেই সময়েই পৃথিবী হইতে উল্কাপাত দেখি। বায়ুর সহিত সংঘর্ষণজনিত তাপে লোহার মত শক্ত উল্কা-পিণ্ডও বাষ্প হইয়া পড়ে এবং অবশেষে ধূলি-কণার ন্যায় পৃথিবী-পৃষ্ঠে পতিত হয়। দৈবাৎ দুই একটা লোহার ন্যায় শক্ত উল্কা-পিণ্ড পৃথিবীতে আসিয়া পড়ে। বায়ুর দুর্ভেদ্য আবরণ আছে বলিয়াই উল্কার উৎপাত হইতে জন-প্রাণী রক্ষিত হইতেছে।

সাধারণতঃ পৃথিবী-পৃষ্ঠ হইতে ৭০।৭৫ মাইল উপরে উল্কা-গুলি প্রথম দৃষ্টিগোচর হয় এবং ৫০।৫৫ মাইল উপরে উহারা বাষ্পে পরিণত হইয়া শেষে অদৃশ্য হইয়া যায়।

কোটী কোটী উল্কা-পিণ্ড কোথা হইতে আসিয়া পৃথিবীতে পড়ে এবং কেনই বা পৃথিবীতে আইসে সেই কথাই এখন বলিব।

উল্কাপাতের কারণ।

গ্রহসকল যেমন সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করে, তেমনি উল্কাসকলও সূর্য্যের আকর্ষণের অধীন হইয়া সূর্য্যের চারিদিকে ঘুরিতেছে। কোটী কোটী উল্কা নিজ নিজ পথে সর্ব্বদা ছুটিতেছে। কাহারও পথ ছাড়িয়া যাইবার সাধ্য নাই। তবে উহারা পৃথিবীতে আইসে কিরূপে?

পৃথিবী যেমন নির্দ্দিষ্ট সময়ে সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করে তেমনি উল্কা-সকলও নির্দ্দিষ্ট পথে স্বাধীন ভাবে ৩৩ বৎসরে সূর্য্যকে একবার প্রদক্ষিণ করিয়া থাকে। কিন্তু পৃথিবীর কক্ষ উল্কার পথ ছেদ করিয়া গিয়াছে। অর্থাৎ পৃথিবীকে সূর্য্য প্রদক্ষিণ কালে অগণিত উল্কার মধ্য দিয়া কতকটা স্থান অতিক্রম করিয়া যাইতে হয়। উল্কাগুলি ছোট বড় অসংখ্য দলে, কোটী কোটী মাইল জুড়িয়া, অসংখ্য পথে, সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিতেছে। পৃথিবী যখন উল্কা-পথ অতিক্রম করিয়া যায়, তখন উল্কার দল ছুটিতে ছুটিতে পৃথিবীর বায়ু-মণ্ডলে প্রবেশ করে। তখন আর যাইতে পারে না। ধীবর জাল দিয়া যেমন মাছ ধরে, আমাদের পৃথিবীও তেমনি বায়ুর জাল দিয়া উল্কা-মাছ ধরিতেছে। উল্কার পথ অতিশয় বিস্তৃত এবং অসংখ্য উল্কা অসংখ্য দলে সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিতেছে। তাই সর্ব্বদাই পৃথিবীর বায়ু-জালে উল্কা ধরা পড়িতেছে।

প্রতিবৎসর অগ্রহায়ণ মাসে পৃথিবী একটী প্রকাণ্ড উল্কাদলের পথ অতিক্রম করিয়া যায়। সেই সময়ে অনেক উল্কা ধরা পড়ে।

এইজন্য অগ্রহায়ণ মাসে অধিক সংখ্যক উল্কাপাত হইয়া থাকে। ঐরূপ উল্কার আর একটা খুব প্রকাণ্ড দল আছে। পৃথিবীর সহিত যখন ঐ দলের সাক্ষাৎ হয় তখনও অজস্র উল্কা-বৃষ্টি হইয়া থাকে। তেত্রিশ বৎসর পর পর ঐ প্রকাণ্ড দলটা হইতে প্রচুর পরিমাণে উল্কা বর্ষিত হয়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বায়ুর সহিত উল্কা-পিণ্ডের সংঘর্ষ হইলে এত তাপের উৎপত্তি হয় যে ক্ষণকাল মধ্যে কঠিন উল্কা-পিণ্ড বাষ্পে পরিণত হইয়া যায়।

অগ্রহায়ণের উল্কা-বর্ষণ।

উল্কা-বর্ষণ।

কখন কখন আকাশের কোন নির্দ্দিষ্ট স্থান হইতে বৃষ্টিধারার ন্যায় অনবরত উল্কা-বর্ষণ হইয়া থাকে। সেই দৃশ্য দেখিতে বড়ই মনোরম। যেন সহস্র সহস্র উজ্জ্বল তারার ফুল নীল আকাশ ভেদ

করিয়া ঝরিয়া পড়িতেছে। সমস্ত রাত্রি এইরূপ অবিশ্রান্ত উল্কা-বর্ষণ হইতে শুনা গিয়াছে। ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দের ১২ই নবেম্বর তারিখে আমেরিকায় যে উল্কা-বৃষ্টি হইয়াছিল তাহা অতিশয় বিস্ময়জনক। ঐ দিবস রাত্রি নয়টা হইতে পর দিবস প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত অজস্র উল্কা-বর্ষণ হইয়াছিল।

এখন উল্কার উৎপত্তি সম্বন্ধে কিছু বলিব। কেহ কেহ বলেন, শুক্র মঙ্গলাদি কোন গ্রহের আগ্নেয়গিরি হইতে এক সময়ে বহু সংখ্যক প্রস্তর বেগে উৎক্ষিপ্ত হইয়াছিল, ঐ সকল প্রস্তরখণ্ড এখন উল্কারূপে সূর্য্যের চারিদিকে ভ্রমণ করিতেছে। কিন্তু এই মতের বিরুদ্ধে গুরুতর আপত্তি আছে। পৃথিবীর ন্যায় অপরাপর গ্রহেও মাধ্যাকর্ষণ প্রভাবে ঊর্দ্ধে নিক্ষিপ্ত পদার্থ গ্রহ-পৃষ্ঠে পতিত হয়। সুতরাং মাধ্যাকর্ষণের শক্তি অতিক্রম করিতে না পারিলে কোন বস্তুই কোন গ্রহ হইতে একবারে চলিয়া যাইতে পারিবে না। মাধ্যাকর্ষণের শক্তি একবারে অতিক্রম করিয়া যাইতে হইলে গিরি-নিক্ষিপ্ত প্রস্তরাদির বেগ প্রতি সেকেণ্ডে অন্ততঃ সাত মাইল হওয়া চাই। কিন্তু আগ্নেয়গিরি হইতে উৎক্ষিপ্ত প্রস্তরের বেগ সেকেণ্ডে দুই মাইলের অধিক হয় না। সুতরাং এই মত গ্রহণ করা যায় না।

উল্কার উৎপত্তি।

কেহ কেহ অনুমান করিয়াছেন, চন্দ্রের আগ্নেয়গিরি হইতে উৎক্ষিপ্ত প্রস্তরসকল এখন উল্কা রূপে পৃথিবীতে পতিত হইতেছে। এই মতটী কতদূর সঙ্গত, বিবেচনা করিয়া দেখা যাউক। চন্দ্রে অসংখ্য আগ্নেয়পর্ব্বত আছে। আবার চন্দ্রের মাধ্যাকর্ষণও কম। যে জ্যোতিষ্কের জিনিস (mass) যত কম, তাহার আকর্ষণ-শক্তিও তত অল্প হয়। চন্দ্রের জিনিস পৃথিবীর জিনিসের ৮০

ভাগের এক ভাগ মাত্র। পৃথিবী হইতে কোন পদার্থকে চিরদিনের জন্ম উৎক্ষিপ্ত করিয়া বিদায় দিতে হইলে যে বলের প্রয়োজন, চন্দ্র-মণ্ডলে সেই বলের ছয় ভাগের এক ভাগ হইলেই কাজ চলিতে পারে। কিন্তু এই মত সম্বন্ধেও আপত্তি আছে।

চন্দ্র পৃথিবীর খুব নিকটবর্ত্তী। সুতরাং চন্দ্রের পাহাড় হইতে উৎক্ষিপ্ত প্রস্তররাশি পৃথিবী কর্ত্তৃক আকৃষ্ট হইয়া উহার চারিদিকে ঘুরিতে থাকিবে। যদি একবার পৃথিবীকে এড়াইয়া যায়, তবে আর কখনও পৃথিবীতে পড়িবে না। অতএব চন্দ্র হইতে উৎক্ষিপ্ত প্রস্তর যদি পৃথিবীতে পতিত হয় তবে চন্দ্র হইতে বাহির হইয়াই একবারে পৃথিবীতে আসিয়া পড়িতে হইবে। চন্দ্র হইতে বাহির হইয়াই উল্কাগুলি পৃথিবীতে আসিয়া পড়িতেছে একথা বিশ্বাস করা যায় না। কারণ চন্দ্রের পাহাড়গুলি বহুদিন যাবৎ নির্ব্বাপিত সুতরাং এখন আর উহাদের ভিতর হইতে প্রস্তর উৎক্ষিপ্ত হইতে পারে না।

বৃহস্পতি, শনি প্রভৃতি গ্রহে আগ্নেয়গিরির অস্তিত্ব এপর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই। আবার ঐ সকল বড় বড় গ্রহের আকর্ষণী শক্তিও অধিক। উল্কা-পিণ্ডের সেই ভীষণ আকর্ষণ অতিক্রম করিয়া আইসা অসম্ভব।

কোন কোন পণ্ডিত অনুমান করেন, পৃথিবীর আগ্নেয়গিরি হইতে এক সময় যে প্রস্তর উৎক্ষিপ্ত হইয়াছিল তাহাই আবার উল্কারূপে ফিরিয়া আসিতেছে। কিন্তু পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ অতিক্রম করিয়া উল্কাগুলি কিরূপে যাইতে পারিয়াছিল তাহা আমরা কল্পনাও করিতে পারি না। সুতরাং উল্কার উৎপত্তির বিষয় এখনও অপরিজ্ঞাত।

আকাশের গল্প।

দ্বিতীয় খণ্ড।

নক্ষত্র-জগৎ।

নক্ষত্রের সংখ্যা।

অন্ধকার রজনীতে নিরভ্র নির্ম্মল আকাশে দৃষ্টিপাত করিলে একবারে বহু সংখ্যক নক্ষত্র দেখিতে পাওয়া যায়। তখন আমাদের মনে হয় বুঝি কোটী,কোটী নক্ষত্র প্রত্যক্ষ করিতেছি। বাস্তবিক উহা আমাদের ভুল ধারণা। সুপ্রসিদ্ধ জর্ম্মান পণ্ডিত আর্জ্জিলেণ্ডার (Argelander) বহু পরীক্ষাদ্বারা নির্দ্ধারণ করিয়াছেন, সমগ্র আকাশে শুধু চক্ষে ৬০০০ ছয় সহস্রের অধিক নক্ষত্র দৃষ্টিগোচর হয় না। যাহাদের দৃষ্টিশক্তি অপেক্ষাকৃত ক্ষীণ তাহারা আরও অল্প সংখ্যক নক্ষত্র দেখিয়া থাকে।

জ্যোতির্ব্বিদ্ পণ্ডিতেরা আকাশের সুন্দর সুন্দর মানচিত্র প্রস্তুত করিয়াছেন। ঐ মানচিত্রে নক্ষত্রসকলের স্থান নির্দ্দিষ্ট আছে। আমাদের গবর্ণমেণ্ট যেমন দশ বৎসর পর পর লোকসংখ্যা গণনা করিয়া জন্ম-মৃত্যুর তালিকা প্রস্তুত করেন, জ্যোতির্ব্বিদেরাও সেইরূপ মাঝে মাঝে আকাশের নক্ষত্র গণনা করিয়া থাকেন। কোন নূতন নক্ষত্র দেখা দিলে অথবা কোন পরিচিত নক্ষত্র অদৃশ্য হইলে, কি স্থান পরিবর্ত্তন করিলে তাঁহারা তাহা ধরিতে পারেন।

আকাশের মানচিত্র।

আকাশের কোটী কোটী নক্ষত্রের মধ্যে দুই একটা তো দূরের কথা, দশ বিশ হাজার নক্ষত্র অদৃশ্য হইয়া গেলে কিম্বা ঐ পরিমাণ নূতন নক্ষত্র দেখা দিলে যে কোন উপায়ে তাহা জানিতে পারা সম্ভব তাহা তোমরা অনেকেই বিশ্বাস করিতে রাজি হইবে না। কেহ কেহ হয়ত মনে করিবে নক্ষত্র গণনা ব্যাপারটা জ্যোতির্ব্বিদ্-গণের একটা 'বুজ্রুকি' মাত্র।

এখানে আমার একটা গল্প মনে পড়িল। একবার সম্রাট্ আকবর সাহ নাকি তাঁহার প্রিয় পারিষদ্ বীরবলকে 'জব্দ' করিবার উদ্দেশ্যে তাঁহাকে পৃথিবীর কেন্দ্র নির্দ্ধারণ করিয়া দিতে আদেশ করিয়াছিলেন। বীরবল হারিবার পাত্র ছিলেন না। তিনি সম্রাট্‌কে বলিলেন,—"আচ্ছা, আমি সম্রাটের কথা মত পৃথিবীর কেন্দ্র স্থির করিয়া দিব কিন্তু রাজ-কোষ হইতে এই দুরূহ কার্য্যের উপযোগী অর্থ আমাকে প্রদান করিতে হইবে।" আকবর তাহাতে সম্মত হইলেন। বীরবল বহু ধনরত্ন লইয়া স্বগৃহে প্রস্থান করিলেন। দীর্ঘকাল পর তিনি অনেকগুলি রজ্জু ও অঙ্ক-কষা খাতা গাড়ী বোঝাই করিয়া লইয়া রাজধানীতে উপনীত হইলেন এবং সম্রাট্‌কে রাজপ্রাসাদের সন্নিকটেই একটা স্থান প্রদর্শন করিয়া কহিলেন,—

"এই স্থানটীই পৃথিবীর কেন্দ্র।" বলাবাহুল্য বীরবলের কথায় সম্রাটের একবারেই বিশ্বাস হইল না। কিন্তু বীরবল দৃঢ় ভাবে কহিলেন,—"এই স্থানই পৃথিবীর কেন্দ্র, যদি আমার কথায় বিশ্বাস না হয় তবে, সম্রাট্ স্বয়ং পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন।" সম্রাট্ পরীক্ষা না করিয়া বীরবলের কথা মিথ্যা নির্দ্ধারণ করিবেন কিরূপে? সুতরাং নিতান্ত অনিচ্ছায় বীরবলের কথাই তাঁহাকে মানিয়া লইতে হইল!

অনেকে মনে করিতে পারে জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণের নক্ষত্র গণনা ব্যাপারটাও ঐরূপ প্রতারণা মাত্র। তাঁহারা একটা বিরাট্ সংখ্যার উল্লেখ করিয়া বলিতেছেন,—"আকাশে এত কোটী নক্ষত্র।" প্রতিবাদ করিলে তাঁহারাও বীরবলের মত বলিবেন,—"বিশ্বাস না হয় পরীক্ষা করিয়া দেখ।" পরীক্ষা করিয়া দেখিবার তো আর উপায় নাই!

আকাশের সুনীল চন্দ্রাতপে শোভমান কোটী কোটী নক্ষত্র এক একটী করিয়া গণনা করা যে অসাধ্য তাহা বলাই বাহুল্য। জ্যোতির্ব্বিদ্ পণ্ডিতেরা এক অভিনব কৌশলে নক্ষত্রের সংখ্যা নির্দ্ধারণ করিয়া থাকেন। পূর্ব্বে বলিয়াছি, শুধু চক্ষে মাত্র ৬০০০ ছয় সহস্র নক্ষত্র দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে।

নক্ষত্র গণনার কৌশল।

একটী অতি ক্ষুদ্র দূরবীক্ষণের (Opera Glass) সাহায্য লইলে আকাশের যে স্থান পূর্ব্বে শূন্য বোধ হইয়াছিল তথায় শতাধিক নক্ষত্র ঘনবিন্যস্ত কুসুমস্তবকের ন্যায় প্রকাশিত হইবে। উৎকৃষ্ট দূরবীক্ষণ দ্বারা অবলোকন করিলে লোক-চক্ষুর অন্তরালে অবস্থিত লক্ষ লক্ষ নক্ষত্র দৃষ্ট হয়। আকাশের মানচিত্র প্রস্তুত করিবার জন্য পণ্ডিতেরা 'ফটোগ্রাফীর' সাহায্য গ্রহণ করিয়া থাকেন। ফটোগ্রাফী, দূরবীক্ষণ ও বর্ণ-বীক্ষণের সাক্ষ্য অভ্রান্তরূপে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখে। উৎকৃষ্ট দূরবীক্ষণের পশ্চাদ্ভাগে 'ফটোগ্রাফীর' আরক

লাগান কাচ বা 'প্লেট' (Plate) সংযুক্ত করিয়া দেওয়া হয়। আকাশের যে অংশে দূরবীক্ষণের দৃষ্টি স্থাপন করা হয়, সেই অংশের চক্ষুর অগোচর অতি ক্ষীণরশ্মি জ্যোতিষ্কসমূহের আলোকও দূরবীক্ষণের বস্তুর কাচের ভিতর দিয়া 'প্লেটে' পতিত হয়। তখন পূর্ব্বোক্ত আরকের আবরণে জ্যোতিষ্কসমূহের আলোক-চিহ্ন থাকিয়া যায়। পণ্ডিতেরা ঐ রূপে নানা স্থান হইতে আকাশের বিভিন্ন অংশের চিত্র তুলিয়া লন। তৎপর ঐ চিত্রগুলি একত্র জুড়িয়া লইলেই আকাশের মানচিত্র প্রস্তুত হইল। এই মানচিত্রের সাহায্যে নক্ষত্রসমূহের স্থান ও সংখ্যা নির্দ্ধারণ করা হইয়া থাকে। উৎকৃষ্ট দূরবীক্ষণের সাহায্যে ৫০ কোটী নক্ষত্রের ফটোগ্রাফ তোলা হইয়াছে।

নক্ষত্রের শ্রেণী বিভাগ।

রাত্রিকালে আকাশের দিকে চাহিলে দেখিতে পাইবে, আকাশের সকল নক্ষত্র সমান উজ্জ্বল নহে। কোন কোন নক্ষত্র দীপ-শিখার ন্যায় বেশ উজ্জ্বল, আর কতকগুলি আলোক-বিন্দুর মত কেবল মিট্ মিট্ করিয়া জ্বলিতেছে।

নক্ষত্রসকলের উজ্জ্বলতা অনুসারে উহাদের শ্রেণী বিভাগ করা হইয়াছে। যে সকল নক্ষত্র খুব উজ্জ্বল উহারা প্রথম শ্রেণীর অন্তর্গত; তার চেয়ে কিছু কম উজ্জ্বল নক্ষত্র দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত। দ্বিতীয় শ্রেণীর নক্ষত্র হইতে যেগুলি কিছু কম উজ্জ্বল উহারা তৃতীয় শ্রেণীর। এইরূপ উজ্জ্বলতার অল্পতা অনুসারে শ্রেণী বিভাগ হইয়াছে। ষষ্ঠ শ্রেণীর নক্ষত্র পর্য্যন্ত খালি চক্ষে দেখা যায়। কোন কোন ব্যক্তির দৃষ্টিশক্তি এমন প্রখর যে সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণীর নক্ষত্রও তাঁহারা খালি চক্ষে দেখিতে পান।

৬ষ্ঠ শ্রেণীর নক্ষত্র হইতে ৫ম শ্রেণীর নক্ষত্র ২॥ গুণ অধিক উজ্জ্বল দেখায়।

" " ৪র্থ " ৬ "

" " ৩য় " ১৫॥ "

" " ২য় " ৩৯॥ "

" " ১ম " ১০০ "

" " সিরিয়াস্ বা লুব্ধক ৪০০ "

(উহা ১ম শ্রেণীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক উজ্জ্বল)

" " সূর্য্য ২২০০ ০০০ ০০০ ০০০ "

এখানে বলা উচিত, আমরা চক্ষে নক্ষত্রের উজ্জ্বলতায় যেরূপ পার্থক্য দেখি সেই অনুসারে শ্রেণী ভাগ করা হইয়াছে। বাস্তবিক উজ্জ্বলতার এরূপ পার্থক্য নয়। সাধারণতঃ দূরের নক্ষত্রই কম উজ্জ্বল দেখায়। তারপর আয়তন এবং আলোকের পার্থক্য তো আছেই।

নক্ষত্রের দূরত্ব।

ঐ যে সুনীল আকাশে কোটী কোটী নক্ষত্র ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দীপ-শিখার মত জ্বলিতেছে, উহারা এক একটী বিরাট সূর্য্য! পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সূর্য্য ও নক্ষত্রে কোনই প্রভেদ নাই। আমাদের সূর্য্য পৃথিবীর নিকটতম নক্ষত্র। সূর্য্যের সহিত তুলনা করিয়াই আকাশের অপরাপর নক্ষত্ররাজির অবস্থা বুঝিতে হইবে। পরীক্ষা দ্বারা স্থিরীকৃত হইয়াছে, সূর্য্য অপেক্ষা বৃহত্তর ও উজ্জ্বলতর নক্ষত্র আকাশে অনেক আছে। নক্ষত্রসমূহ অচিন্তনীয় দূরে অবস্থিত বলিয়া উহাদিগকে আমরা আলোক-বিন্দুর ন্যায় প্রত্যক্ষ করি।

নক্ষত্রসমূহের দূরত্বের কথা কল্পনা করাও অসাধ্য। জ্যোতির্বিদ্ পণ্ডিতগণ নানাবিধ যন্ত্রের সাহায্যে পরীক্ষা করিয়াও বহু বৎসর

নিকটতম দশটী নক্ষত্র।

পর্য্যন্ত একটী নক্ষত্রেরও দূরত্ব নির্দ্ধারণ করিতে সমর্থ হন নাই। ১৮৩৭ খৃঃ সুপ্রসিদ্ধ জর্ম্মান পণ্ডিত 'বেসেল্' (Bassel) ৬১ সিগ্‌নি (Cygni 61) নক্ষত্রটীর দূরত্ব নির্দ্ধারণ করেন। ইহার কিছুদিন পর স্কট্‌লণ্ডের হেণ্ডারসন্ (Henderson) নামক পণ্ডিত আল্‌ফা সেণ্টরাই (a Centauri) নক্ষত্রটীর দূরত্ব নিরূপণ করেন। বিজ্ঞানের এবং বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাদির উন্নতি সত্বেও বহু শতাব্দীর পরিশ্রমের ফলে কোটী কোটী নক্ষত্রের মধ্যে মাত্র দশটী নিকটবর্ত্তী নক্ষত্রের দূরত্ব নির্দ্ধারিত হইয়াছে। এই সকল নক্ষত্রের দূরত্ব অঙ্কে প্রকাশ করাই কঠিন, মনে সম্যক্ ধারণা করা ত অসাধ্য!

আলোক-বর্ষ।

আমরা কোন স্থানের দূরত্বের পরিমাণ করিতে হইলে মাইল্, ক্রোশ ইত্যাদি দ্বারা প্রকাশ করিয়া থাকি। কিন্তু নক্ষত্রের সম্বন্ধে ঐ সকল দূরত্বজ্ঞাপক শব্দ ব্যবহার করা চলে না। তাহাতে সংখ্যা এত বাড়িয়া যায় যে পাঠ করিতেও ক্লেশ হয়। এই জন্য পণ্ডিতেরা তাহা পরিত্যাগ করিয়া বৃহত্তর মাপকাঠি ব্যবহার করিয়া থাকেন। মাইল, ক্রোশ ইত্যাদি দ্বারা না মাপিয়া আলোক এক বৎসরে যত দূর যায়, সেই দূরত্বকে তাঁহারা মাপ কাঠি করিয়াছেন। সেই মাপ কাঠির নাম "আলোক-বর্ষ"।

আলোক এক সেকেণ্ডে ১৮৬০০০ মাইল পথ অতিক্রম করে। অর্থাৎ এক সেকেণ্ডে আলোক পৃথিবীর চারিদিকে আটবার ঘুরিয়া আসিতে পারে। পৃথিবী হইতে সূর্য্য ৯২৮৯৭০০০ মাইল দূরে অবস্থিত। সূর্য্য হইতে পৃথিবীতে আলোক আসিতে মাত্র ৮ মিনিট সময় লাগে। এক বৎসরে আলোক ৫৮,৬৫,৬৯,৬০০০০০০ মাইল যায়। ইহাই জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণের মাপ কাঠি—এক 'আলোকবর্ষ।'

কোন নক্ষত্রের দূরত্ব যত আলোক-বর্ষ, তাহা দ্বারা পূর্ব্বোক্ত সংখ্যাকে পূরণ করিলেই, দূরত্ব কত মাইল, বাহির হইবে। নিম্নে দশটী নক্ষত্রের দূরত্ব প্রদত্ত হইল।

আল্‌ফা সেণ্টরাই	৪.৫	আলোক-বর্ষ	আল টেয়ার	১৬.৩	আলোক-বর্ষ
৬১ সিগ্‌নি	৭.৪	,,	বিটা কেসিয়োপিয়া	২০.৪	,,
সিরিয়াস (লুব্ধক)	৮.৮	,,	বেটেল্‌ গিউস্ (আর্দ্রা)	২১.৭	,,
প্রসিয়ন্ (প্রশ্বা)	১১.৬	,,	ভেগা (অভিজিৎ)	২১.৭	,,
কেপেলা (ব্রহ্মহৃদয়)	১৫.৫	,,	পোলারিস্ (ধ্রুব)	৪৬.৫	,,

দেখা যাইতেছে যে, আমাদের নিকটতম যে তারাটী, তাহাও ৪½ আলোক-বর্ষ দূরে। মাইলের সংখ্যায় প্রকাশ করিলে, ৪½ আলোক-বর্ষে, ২ পদ্ম, ৬৪ নিখর্ব্ব, ৯০ বৃন্দ, ১৩ কোটী, ৬৯ লক্ষ, ৩২ হাজার মাইল হয়। কিন্তু এত বড় একটা অঙ্ক কেবল মুখে বলিতেই জমকাল শোনায়। উহাতে বাস্তবিক পদার্থ কত দূরে, তাহা বুঝিবার কোনও সহায়তা হয় না। ইহার চাইতে আমাদের পরিচিত বিষয় দিয়া সাদাসিদা একটা দৃষ্টান্ত দিলে হয়তো মনে একটা কোনরূপ ধারণা হইতে পারে। মনে কর, এখান হইতে সূর্য্য যত দূরে, সেই স্থানটুকুকে আমরা ধরিয়া লইলাম, যেন এক হাত। এখন এই হিসাবে, গ্রহ নক্ষত্রগুলিকে তাহাদের উপযুক্ত স্থানে বসাইয়া, একবার দেখা যাউক অবস্থাটা কিরূপ হয়। সূর্য্য হইতে পৃথিবী প্রায় ৯ কোটী ৩০ লক্ষ মাইল। এতটা স্থানকে আমরা এক হাত ধরিয়াছি। তাহা হইলে সূর্য্যটাকে কত বড় ধরিব? এ অবস্থায় সূর্য্যের ব্যাস এক ইঞ্চির বর্ত্তাংশের অধিক হইবে না। অর্থাৎ সূর্য্যটিকে একটি মটরের মত বড় করিলেই যথেষ্ট হইবে। ইহার এক হাত দূরে পৃথিবী; তাহার ব্যাস এক

ইঞ্চির ৬০০ ভাগের এক ভাগ মাত্র। এত ছোট পদার্থ খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিলেও, তাহাকে অণুবীক্ষণ ব্যতীত দেখা যাইবে না। নেপ্চ্যুনের স্থান হইবে ৪৯ ফুট দূরে। তাহার ব্যাস এক ইঞ্চির ১৬৬ ভাগের এক ভাগ। অর্থাৎ তাহাকে কষ্টে দেখা গেলেও যাইতে পারে। ৪৯ ফুটের ভিতরেই সৌর-জগৎ ফুরাইল। এখন আমাদের নিকটতম তারাটির স্থান কোথায় করিব? নিকটতম তারাটী এই কল্পিত মটরের মতন সূর্য্যের প্রায় ৮৫ মাইল দূরে হইবে। অর্থাৎ মনে কর, যেন কলিকাতা হইতে চুয়াডাঙ্গা, কিম্বা নারায়ণগঞ্জ হইতে ময়মনসিংহ।

আর একটী দৃষ্টান্ত দেওয়া যাউক। মনে কর, যেন আমাদের সেই তারায় যাইতে হইবে। যদি সেখানে যাইবার রেল থাকিত, আর সেই রেলের বেগ ঘণ্টায় ৩০ মাইল হইত, তবে আমরা দশ কোটী আট লক্ষ বৎসরের কমে সেখানে পৌঁছাইতে পারিতাম না। ইহা বড় বেশী দিনের কথা হইল। এতদিন তো বাঁচিয়া থাকিব না সুতরাং আমাদের আয়ুষ্কালের অনুরূপ একটী দৃষ্টান্ত দেওয়া যাউক।

অনেকেই আলাদিন এবং আশ্চর্য্য প্রদীপের গল্প পড়িয়াছ। আলাদিনের একটা প্রদীপ ছিল, সেটাকে ঘসিলেই একটা ভূত আসিত। আলাদিন তাহার ঘাড়ে চড়িয়া, মুহূর্ত্তের মধ্যে যেখানে খুসী চলিয়া যাইতেন। এখন যদি হঠাৎ আলাদিনের সেই প্রদীপ কুড়াইয়া তাহার সাহায্যে সেই ভূতটাকে বশ করিয়া একবার আল্ফা সেণ্টয়াই যাইতে চেষ্টা কর, তবে কিরূপ হয় দেখা যাউক। মনে করা যাউক, যেন সূর্য্য হইতে নেপচ্যুন পর্য্যন্ত যাইতে সে ভূতটার একদিন মাত্র লাগে। বেগটা সামান্য হইল না। এইরূপ বেগে পৃথিবীর চারিদিক ঘুরিয়া আসিতে এক সেকেণ্ডও লাগে না। এই ভূতের ঘাড়ে চড়িয়া, একদিন ভোরে সূর্য্য হইতে ঠিক

সোজাসুজি আলূফা সেণ্টরাই যাইবার জন্ত রওনা হইলে। পৃথিবী যদি তোমার পথে পড়ে, তবে তাহাতে পৌঁছাইতে তোমার আধ ঘণ্টার বেশী দেরী হইবে না। আর যে মুহূর্ত্তে পৌঁছাইবে প্রায় সেই মুহূর্ত্তেই তাহাকে ছাড়িয়া যাইবে। সন্ধ্যার পূর্ব্বেই পৃথিবী অদৃশ্য হইয়া যাইবে। পরদিন ভোর বেলা তুমি সৌর-জগতের সীমা অতিক্রম করিবে। তৃতীয় দিন শেষ হইবার পূর্ব্বেই বৃহস্পতি প্রভৃতি গ্রহেরাও অদৃশ্য হইয়া যাইবে। তারপর বৎসরের পর বৎসর চলিয়া যাইবে। আমাদের এই সূর্য্য ক্রমে ছোট হইয়া অবশেষে একটী তারার আকার প্রাপ্ত হইবে। এবং ২৫ বৎসর পরে তুমি আলূফা সেণ্টরীতে পৌঁছাইবে।

আজ যদি সেই তারা বোমের মতন ফুটিয়া অদৃশ্য হইয়া যায়, তথাপি আগামী সাড়ে চারি বৎসরের ভিতরে আমরা তাহার কোন সংবাদ পাইব না। কারণ, তাহার পূর্ব্বে সেই ঘটনার আলোক এখানে পৌঁছাইতে পারিবে না। সেই শব্দ আমাদের এখানে আসিবার যদি কোন উপায় থাকে, তবে সাত কোটী ত্রিশ লক্ষ বৎসরের পূর্ব্বে আমরা তাহা শুনিতে পাইব না।

এই ত আমাদের নিকটতম তারা! এইরূপে যাহাদের দূরত্ব মাপা গিয়াছে তাহাদের সংখ্যা অতি অল্প। অধিকাংশ তারাই এত দূরে, যে তাহাদের দূরত্ব মাপিবার সকল চেষ্টাই বিফল হইয়াছে। এই দূরত্বের সহস্রগুণ—লক্ষগুণ দূরেও অবশ্য তারা আছে। ইহা অপেক্ষাও কত বেশী দূরে তারা আছে তাহা কে বলিতে পারে? যাহা হউক এত দূরে আসিয়াও আমাদের এরূপ মনে হইবে না যে, আমরা নিতান্ত পরের দেশে আসিয়াছি। এখানেও দেখিব, যে আমাদের চিরপরিচিত মাধ্যাকর্ষণ-বিধানে কাজ চলিতেছে।”

নক্ষত্রের গতি।

সমস্তটা আকাশ যেন একটা কাচের ফাঁপা গোলা। নক্ষত্রগুলি উহার গায় উজ্জ্বল হীরার টুক্‌রার মত লাগান রহিয়াছে। আমাদের পৃথিবী সেই প্রকাণ্ড ফাঁপা গোলার মাঝখানে অবস্থিত।

গোলাটী অনবরত ঘুরিতেছে। যেমন নাটাই একটা শলার চারিদিকে ঘুরে অথবা কুমারের চাক আকের চারিদিকে ঘুরে, তেমনি আকাশটা যেন একটী কল্পিত শলার চারিদিকে ঘুরিতেছে। শলার দুই প্রান্ত আকাশেই গাঁথা আছে। উহার নড় চড় নাই। শলার উত্তরের প্রান্তকে আকাশের উত্তর কেন্দ্র এবং দক্ষিণের প্রান্তকে আকাশের দক্ষিণ কেন্দ্র বলে। উত্তর কেন্দ্রের খুব নিকটে একটী নক্ষত্র আছে উহাকে ধ্রুব-তারা (Pole Star) বলে। বোধ হয় যেন এই তারাটীর গতি নাই; এইটীই কেন্দ্র।

আমরা দেখি, আকাশ অনবরত ঘুরিয়া যাইতেছে আর আমাদের পৃথিবী একস্থানে স্থির রহিয়াছে। তারাগুলিও আকাশের সহিত ঘুরিতেছে। আকাশের দিকে কিছু কাল তাকাইয়া থাকিলেই দেখিতে পাইবে, তারাগুলি চলিতেছে। যে তারাগুলি কিছুকাল আগে পূর্ব্বদিকে প্রায় মাটির নিকটে অথবা গাছের মাথার উপরে ছিল সেই-গুলি অনেকটা উপরে উঠিয়াছে। যে গুলি আমাদের মাথার উপরে ছিল সেইগুলি পশ্চিমে চলিয়া পড়িতেছে। পশ্চিম আকাশে যে তারাগুলি মাটির নিকট দেখা যাইত সেইগুলি অদৃশ্য হইয়াছে।

নক্ষত্রের দৃশ্য গতি।

বাস্তবিক নক্ষত্রগুলি ঘুরে না। পৃথিবী অনবরত আবর্ত্তন করিতেছে বলিয়া আমরা উহার পৃষ্ঠে থাকিয়া দেখি, নক্ষত্রগুলি

পৃথিবীর চারিদিকে ঘুরিতেছে। পৃথিবী ঘুরিতেছে বলিয়া যেমন সূর্য্যের উদয়-অস্ত দেখি তেমনি নক্ষত্রগুলিও পূর্ব্বদিকে উদিত হইয়া পশ্চিম দিকে অস্ত যাইতেছে, দৃষ্টতঃ এইরূপ বোধ হয়। প্রকৃত পক্ষে নক্ষত্রসকলের ঐরূপ কোন গতি নাই।

কয়েক দিন মনোযোগ দিয়া আকাশের নক্ষত্রগুলি লক্ষ্য করিলে দেখিতে পাইবে যে, নক্ষত্রসকল পরস্পর সম্বন্ধে স্থান পরিবর্ত্তন করে না। অর্থাৎ যে তারা যে ভাবে অন্য তারা হইতে যত দূরে ছিল, সেই তারা সেই ভাবে তত দূরে থাকিতেছে। আজ রাত্রে একখানি কাগজে আকাশের নক্সা করিয়া কতকগুলি নক্ষত্রের স্থান চিহ্নিত করিয়া রাখ। দুই বৎসর পর দেখিবে উহারা পূর্ব্বের স্থানেই আছে।

নক্ষত্রের প্রকৃত গতি।

পৃথিবীর আবর্ত্তনের জন্য আমরা নক্ষত্রের যে গতি দেখি উহাকে নক্ষত্রের দৃশ্যগতি (Apparent Motion) বলে। এই দৃশ্য গতি ব্যতীত নক্ষত্রসকলের প্রকৃতগতিও (Real motion) আছে। আমাদের সূর্য্য ও আকাশের অগণিত নক্ষত্র সকলই চলিতেছে; একটী নক্ষত্রও অচল নহে। কিন্তু উহাদের প্রকৃতগতি খালি চক্ষে ধরিবার সাধ্য নাই। নক্ষত্রসকলের গতির জন্য উহাদের স্থান পরিবর্ত্তন হইতেছে কিন্তু অনন্ত আকাশে উহারা পরস্পর হইতে এত দূরে দূরে অবস্থিত যে দুই এক শতাব্দীর মধ্যে উহাদের স্থান পরিবর্ত্তন লক্ষিত হয় না। প্রাচীন গ্রীক্ পণ্ডিতেরা যে সকল নক্ষত্রের যে যে স্থান নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন, আমরা উহাদিগকে এখন ঠিক সেই স্থানে দেখি না; কারণ উহারা স্থান পরিবর্ত্তন করিতেছে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আমাদের সূর্য্য সৌর-জগতের সকল গ্রহ উপ-গ্রহাদি লইয়া বীণা (Lyre) নামক একটী নক্ষত্র-মণ্ডলীর দিকে মিনিটে ২৪০ মাইল গতিতে ছুটিতেছে। এখন হইতে ১৮ কোটী বৎসরের

পূর্ব্বে সূর্য্য ঐ নক্ষত্রের নিকটে পৌঁছিতে পারিবে না। পথে অন্য নক্ষত্রের সঙ্গে সংঘর্ষ হইবার আশঙ্কা নাই, এমনও বলা যায় না। আবার যে নক্ষত্রের দিকে সূর্য্য ধাবিত হইতেছে উহাও অগণিত নক্ষত্র লইয়া অন্য একটী দূরস্থ নক্ষত্রের দিকে ছুটিতেছে।*

সূর্য্যের ন্যায় আকাশের অন্যান্য নক্ষত্রগণও অতি প্রচণ্ড বেগে ছুটিতেছে। কোন কোন নক্ষত্রের গতি ঘণ্টায় ৭২.০০০ মাইল। পূর্ব্বোক্ত বীণা নক্ষত্র-মণ্ডলীর অভিজিৎ (Vega) নক্ষত্রের গতি ঘণ্টায় ১,৮০,০০০ মাইল। কস্তর নক্ষত্রের (Castor) গতি ঘণ্টায় ৯০,০০০ মাইল। পোলাক্স (Pollux) নামক আর একটী নক্ষত্রের গতি ঘণ্টায় ১,৭৬,৪০৭ মাইল। এতদ্ব্যতীত আর কতকগুলি নক্ষত্র আছে, উহারা দুইটী, তিনটী বা ততোধিক নক্ষত্র একটী নির্দ্দিষ্ট কেন্দ্রের চারিদিকে আবর্ত্তন করিতেছে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ঐ সকল দূরবর্ত্তী নক্ষত্রও নিউটনের মাধ্যাকর্ষণের নিয়মের অধীন হইয়া চলিতেছে।

পরিবর্ত্তনশীল নক্ষত্র।

দূরবীক্ষণ ব্যতীত শুধু চক্ষে দেখিলে আকাশের সকল নক্ষত্রকেই একরূপ দেখা যায়; কেবল উজ্জ্বলতার পার্থক্য। কিন্তু বাগানে যেমন নানা প্রকার ফুল তেমনি আকাশে নানা রকম তারা আছে। আয়তনের কথা ছাড়িয়া দিলেও নক্ষত্রের বৈচিত্র্য অসামান্য! বাগানের ফুলের যেমন

নক্ষত্রের বৈচিত্র্য।

* I refer to the supposed discovery of the great centre about which it is presumed the myriads of stars composing our mighty Milky way are all revolving.—The Orbs of Heaven.

নানা রং আকাশের তারারও তেমনি অশেষ বর্ণ-বৈচিত্র্য। কোন তারা গোলাপের মত পাটল, কোন তারা জবার মত লাল, আবার কোন তারা মল্লিকার মত শুভ্র। নীল, পীত, ধূসর, ধূমল প্রভৃতি অনেক বর্ণের তারা আছে। বাগানে কোন ফুল ফুটিতেছে, কোন ফুল পূর্ণ বিকশিত আবার কোন ফুল ম্লান হইতেছে! আকাশের তারাও তেমনি কোনটী বাষ্পের মত—এখনও জমাট বাঁধে নাই, কোনটী উজ্জ্বল আলো দিতেছে, আবার কোন কোন নক্ষত্র জ্যোতিঃহীন হইয়া অদৃশ্য হইতেছে। বাগানে যেমন গুচ্ছে গুচ্ছে ফুল, আকাশে তেমনি দলে দলে তারা। ফুল একবার ম্লান হইলে উজ্জ্বল হয় না। কিন্তু কতকগুলি আকাশ-কুসুম ক্রমে নিষ্প্রভ হইয়াও আবার উজ্জ্বল হইতেছে!

আকাশে কতকগুলি নক্ষত্র আছে উহাদের উজ্জ্বলতার হ্রাস-বৃদ্ধি হইয়া থাকে। ঐ সকল নক্ষত্রের জ্যোতিঃ নির্দ্দিষ্ট সময় পর্য্যন্ত বাড়িয়া ধীরে ধীরে কমিতে থাকে এবং আবার নির্দ্দিষ্ট দিনে পূর্ব্বের ন্যায় উজ্জ্বল হয়। এই জন্যই উহাদিগকে "পরিবর্ত্তনশীল নক্ষত্র" (Variable Stars) বলে। চন্দ্র-কলার হ্রাস-বৃদ্ধির ন্যায় উহাদের কয়েকটী নক্ষত্রের উজ্জ্বলতার হ্রাস-বৃদ্ধির সময় ও পরিমাণ নির্দ্ধারিত হইয়াছে।

আর্গাস্, ৭বৎসরে ১ম শ্রেণী হইতে উজ্জ্বলতা কমিয়া ৮ম শ্রেণীতে যায়।
কেসিওপিয়া ৪২৯ দিনে ৬ষ্ঠ ” ” ১২শ ”
সেটি বা মিরা ৩৩১ ” ১ম ” ” ১০ম ”
লায়ার ১৩ ” ৩½ ” ” ৪½ ”
এল্গল্ ৩ ” ২½ ” ” ৪ ”

"সেটি"(Ceti) নক্ষত্রটী বড়ই আশ্চর্য্য রকমের ; এই জন্য পণ্ডিতেরা উহার নাম রাখিয়াছেন 'মিরা' (Marvellous) অর্থাৎ আশ্চর্য্য নক্ষত্র। যখন ইহা খুব উজ্জ্বল হয় তখন উহার জ্যোতিঃ এত বৃদ্ধি পায় যে

উহা প্রথম শ্রেণীতে উঠে। তার পর উজ্জ্বলতা কমিতে থাকে। কমিয়া মিরা একবারে ১০ম শ্রেণীতে নামে। তখন আর দেখা যায় না।

"এল্‌গল্‌" (Algol) নক্ষত্রটী আরও অদ্ভুত। অতি অল্প সময়ের মধ্যে উহার জ্যোতির চরম হ্রাস-বৃদ্ধি হয়। দুই দিন পর্য্যন্ত 'এল্‌গল্‌' খুব উজ্জ্বল থাকে; তখন উহা ২য় শ্রেণীর তারার ন্যায় দেখা যায়। তারপর হঠাৎ উহার জ্যোতিঃ কমিয়া সাড়ে তিন ঘণ্টায় ৪র্থ শ্রেণীতে নামিয়া থাকে। ইহার উন্নতি ও অবনতি উভয়ই অতি অল্পকাল স্থায়ী।

আকাশে কতকগুলি নক্ষত্র আছে উহাদিগকে "যুগল-নক্ষত্র" (Double Star) বলে। দুইটী তারা পরস্পর পরস্পরের আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া এক নির্দ্দিষ্ট বিন্দুর চারি দিকে ঘুরিতেছে। যুগল-নক্ষত্র খালি চক্ষে একটী নক্ষত্রের মতই দেখা যায় কিন্তু দূরবীক্ষণ দিয়া দেখিলেই দেখা যায়, দুইটী তারায় একটী তারা হইয়াছে। একটী আর একটী হইতে শত কোটী মাইল দূরে অবস্থিত। যুগল-নক্ষত্রের বিস্তৃত বৃত্তান্ত অপর প্রবন্ধে প্রকাশিত হইবে।

অধ্যাপক পিকারিং সপ্রমাণ করিয়াছেন যে, যে সকল নক্ষত্রকে আমরা পরিবর্ত্তনশীল বলি উহারা সকলেই যুগল। উহাদের একটী সহচরের আলোক অতিশয় ক্ষীণ। যুগল নক্ষত্র দুইটী পরস্পরকে প্রদক্ষিণ করিতে করিতে যখন অনুজ্জ্বল সহচরটী আমাদের সম্মুখে আসিয়া পড়ে তখন উহাদ্বারা উজ্জ্বল নক্ষত্রটী ঢাকা পড়ে। এইজন্য উভয়েই আমাদের নিকট অদৃশ্য হয় অথবা অপেক্ষাকৃত নিষ্প্রভ দেখা যায়। 'এল্‌গল্‌' নামক পরিবর্ত্তনশীল নক্ষত্রের সহচরটীও আলোকহীন।

অস্থায়ী নক্ষত্র।

কতকগুলি নক্ষত্র মাঝে মাঝে আকাশে দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। উহারা অতিথির স্থায় হঠাৎ গগনমণ্ডলে দেখা দিয়া চির দিনের জন্ত অদৃশ্য হইয়া যায়। এই শ্রেণীর নক্ষত্রকে "অস্থায়ী নক্ষত্র" (Temporary Stars) কহে।

দুইটী আশ্চর্য্য নক্ষত্র।

"টাইকোব্রাহী" নামক সুপ্রসিদ্ধ জ্যোতির্ব্বিদ পণ্ডিত একটী অস্থায়ী নক্ষত্রের কথা লিখিয়া গিয়াছেন,উহার বর্ণনা পাঠ করিলে বিস্মিত হইতে হয়। ১৫৭২ খৃষ্টাব্দে শুক্র গ্রহ হইতে অধিকতর উজ্জ্বল একটী নক্ষত্র আবির্ভূত হইয়াছিল ; সে নক্ষত্রটী নাকি এমন উজ্জ্বল হইয়াছিল যে দিনের বেলায়ই উহা খালি চক্ষে দেখা যাইত। ১৫৭৪ খৃষ্টাব্দে এই নক্ষত্রটী অদৃশ্য হইয়া যায়। যখন অদৃশ্য হইতে থাকে তখন উহার বর্ণ প্রথমতঃ শুভ্র, তৎপর পীতবর্ণ হয়। ১৫৭৩ খৃষ্টাব্দের বসন্তকালে উহা লালবর্ণ ধারণ করে এবং তৎপর ধূসরবর্ণ হয়, ইহার কিছুকাল পরে উহা তিরোহিত হইয়া যায়। এই নক্ষত্রটী আর দেখা দেয় নাই। তখন যদি বর্ণ-বীক্ষণ যন্ত্র (Spectroscope) থাকিত তাহা হইলে অনেক তথ্য আবিষ্কৃত হইত। ১৬০৪ খৃষ্টাব্দে পূর্ব্বোক্ত-নক্ষত্রের স্থায় আর একটী নক্ষত্র আকাশে দেখা দিয়া কয়েক মাস পর অন্তর্হিত হইয়া যায়।*

---

* কেহ কেহ অনুমান করেন যে অস্থায়ী নক্ষত্র এবং পরিবর্ত্তনশীল নক্ষত্র বিভিন্ন নক্ষত্র নহে। কোন একটী পরিবর্ত্তনশীল নক্ষত্রের জ্যোতিঃ কমিতে কমিতে যখন একেবারে অদৃশ্য হইয়া পড়ে, আর দীর্ঘকাল দৃষ্টিগোচর হয় না, তখন উহাকে আমরা একটী অস্থায়ী নক্ষত্র মনে করি। আবার যখন ঐ নক্ষত্র ৫০।৬০ বৎসর পরে পুনরায় দৃষ্টিগোচর হয়, তখন উহাকে আমরা আর একটী নূতন নক্ষত্র বলিয়া মনে করিয়া থাকি।

নক্ষত্র-মণ্ডলী

আকাশের যে দিকে তাকাও সেই দিকেই বহুসংখ্যক নক্ষত্র দৃষ্টিগোচর হইবে। কিন্তু নক্ষত্র-সমূহের মধ্যে কোন শৃঙ্খলা দেখা যায় না। কোথাও বহু নক্ষত্র একস্থানে হীরার ফুলের মত শোভা পাইতেছে। আবার কোথাও দূরে দূরে দুই একটী মাত্র তারা ঝক্ ঝক্ করিয়া জ্বলিতেছে। বাগানে যেমন বহুসংখ্যক ফুল থোবায় থোবায় ফুটিয়া থাকে, আকাশেরও স্থানে স্থানে তেমনি বহুসংখ্যক তারার ফুল গুচ্ছে গুচ্ছে সন্নিবিষ্ট দেখা যায়।

প্রাচীন কালের জ্যোতিষিগণ কতকগুলি ঘন-দল-বদ্ধ তারা দিয়া এক একটী নক্ষত্র-মণ্ডলী (Constellation) কল্পনা করিয়াছিলেন। আকাশে ছোট বড় অনেক নক্ষত্র-মণ্ডলী আছে। সকল নক্ষত্র-মণ্ডলী সাধারণ লোকের পক্ষে চিনিয়া লওয়া দুঃসাধ্য বটে, কিন্তু কতকগুলি নক্ষত্র-মণ্ডলী এরূপ উজ্জ্বল নক্ষত্র লইয়া গঠিত যে, অসংখ্য তারার মধ্য হইতে উহাদিগকে বাহির করিতে বিশেষ আয়াস হয় না। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ কালপুরুষ, সপ্তর্ষি, কৃত্তিকা, পিগেসাস্ প্রভৃতি কয়েকটী নক্ষত্র-মণ্ডলীর নাম করা যাইতে পারে।

আকাশের কতকগুলি নক্ষত্র-মণ্ডলী চিনিয়া লইলে গ্রহ ও অন্যান্য নক্ষত্রসকল বাহির করা সহজ হয়। আজ রাত্রিকালে একটী তারা দেখিয়া রাখিলে, কাল দিনের বেলায় সেইটী আর দৃষ্টিগোচর হইবে না, পর দিন রাত্রিতে উহাকে কোথায় পাইবে জানা না থাকিলে বাহির করা কঠিন হয়। গ্রহগুলি সর্ব্বদা স্থান পরিবর্ত্তন করিতেছে; উহাদিগকে অগণিত তারার মধ্যে খুঁজিয়া ধরা আরও শক্ত কাজ। কিন্তু কোন্ গ্রহ কোন্ চিহ্নিত নক্ষত্র-মণ্ডলীর কোন্ দিকে এবং উহা

কত দূরে, যদি দেখিয়া রাখি, তাহা হইলে উহাদিগকে বাহির করিতে বিশেষ কষ্ট হইবে না।

সহজে খুঁজিয়া বাহির করিবার সুবিধার জন্য অতি প্রাচীন কালের জ্যোতির্বিদগণ আকাশের অনেকগুলি নক্ষত্র-মণ্ডলী চিহ্নিত করিয়া উহাদের এক একটী মূর্ত্তি কল্পনা করিয়াছিলেন। সকল নক্ষত্র-মণ্ডলীতে সমান সংখ্যক নক্ষত্র নহে। কোন মণ্ডলীতে তিন চারিটী, কোন মণ্ডলীতে ২০।২৫ টীর চেয়েও বেশী নক্ষত্র। প্রত্যেক নক্ষত্র-মণ্ডলীর এক একটী নাম আছে। এই নাম কি অর্থে রাখা হইয়াছিল তাহা এখন ঠিক করিয়া বলা অসম্ভব। তবে বোধ হয় যে, যে নক্ষত্র-মণ্ডলীর তারাগুলি মিলাইয়া মোটামুটি যে মূর্ত্তি হইয়াছে, উহার সেই নাম রাখা হইয়াছে।

নক্ষত্র-মণ্ডলির মূর্ত্তি কল্পনা।

কোন নক্ষত্র-মণ্ডলীর মানুষের নাম; যেমন, পার্শিয়ুস্, এণ্ড্রোমিডা, কাসিওপেয়া, হার্কিউলিস্ ও কালপুরুষ প্রভৃতি। জন্তুর মধ্যে মেষ, ষাঁড়, সর্প, হংস, সিংহ, ভল্লুক ইত্যাদি নাম আছে। আবার ধনু, বীণা, জাহাজ, মুকুট ইত্যাদির নামও আছে।

হিন্দুরা খৃষ্টের জন্মের বহু সহস্র বৎসর পূর্ব্বে জ্যোতিষ শাস্ত্রের আলোচনা আরম্ভ করিয়াছিলেন। আকাশের গ্রহ-নক্ষত্রসমূহের গতিবিধি সেই প্রাচীন কাল হইতে লক্ষ্য করিয়া তাঁহারা অনেক তথ্য আবিষ্কার করিয়াছিলেন। এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে সেই সকল ইতিহাস বলিবার আমাদের প্রয়োজন নাই।

প্রাচীন মিশর, চীন, গ্রীস্ ও আরব দেশের লোকেরাও নক্ষত্রাদি দর্শনে বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু হিন্দুরা বোধ হয় অন্যান্য জাতির বহুপূর্ব্বে আপনাদের নক্ষত্র-মণ্ডলী কল্পনা করিয়া আকাশে উহাদের স্থান নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন।

উত্তর আকাশের কয়েকটী নক্ষত্র-মণ্ডলীর মূর্ত্তি।

হিন্দু জ্যোতিষ শাস্ত্রে ২৭ সাতাশটী নক্ষত্রের (Constellation) উল্লেখ আছে। চন্দ্র আকাশ-পথে পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করিতেছে। ২৭।২৮ দিনে চন্দ্র পৃথিবীকে একবার প্রদক্ষিণ করে। অর্থাৎ সমুদায় আকাশ-চক্র ঘুরিয়া আসিতে চন্দ্রের ২৭।২৮ দিন সময় লাগে। এইজন্য পণ্ডিতেরা চন্দ্রের পথকে ২৭ ভাগে বিভক্ত করিলেন। কিন্তু শূন্যে চিহ্ন রাখিবেন কিরূপে? আকাশের নক্ষত্রগুলি অচল; চন্দ্র প্রতি রাত্রে সেই অচল নক্ষত্রগুলি অতিক্রম করিয়া যায় সুতরাং উহাদের দ্বারা চিহ্নের কাজ চলিতে

হিন্দুদিগের নক্ষত্র।

রাত্রে। চন্দ্র যে দিন রাত্রে আকাশের যেখানে থাকে সেই স্থানের নক্ষত্রগুলি দিয়া একটী নক্ষত্র (মণ্ডলী) গঠন করা হইল। এইরূপে অশ্বিনী, ভরণী, কৃত্তিকা, রোহিণী ইত্যাদি ২৭টী নক্ষত্রের উৎপত্তি হইয়াছে। পুরাণে আছে, দক্ষরাজা তাঁহার ২৭টী কন্যাকে চন্দ্রের নিকট বিবাহ দিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য যে চন্দ্র ২৭টী নক্ষত্রে ২৭ রাত্রি যাপন করেন বলিয়াই নক্ষত্রগুলিকে চন্দ্রের পত্নী কল্পনা করা হইয়াছে। *

মাস ও বৎসর গণনা।

কালক্রমে যখন দেখা গেল যে এক অমাবস্যা বা পূর্ণিমা হইতে আর এক অমাবস্যা বা পূর্ণিমা ঘটিতে ৩০ বার সূর্য্যোদয় হয়, তখন ৩০ দিনে একমাস গণনা হইতে লাগিল।

পণ্ডিতেরা সূর্য্যের উদয় ও অস্তকালে নক্ষত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন যে, সূর্য্যও চন্দ্রের ন্যায় পূর্ব্বোক্ত নক্ষত্রগুলি অতিক্রম করিয়া যায় অর্থাৎ চন্দ্র যে পথে ভ্রমণ করে সূর্য্যও সেই পথেই ভ্রমণ করে। আরও লক্ষ্য করিলেন যে, ১২ বার অমাবস্যা হইলে সূর্য্য একবার নক্ষত্র-চক্র ঘুরিয়া আইসে। তখন ৩০ দিনে একমাস এবং ১২ মাসে বা ৩৬০ দিনে বৎসর গণনা আরম্ভ হইল।

চন্দ্রের গতি দেখিয়া চন্দ্র-পথ ২৭ ভাগে বিভক্ত হইয়াছিল। সূর্য্য সেই পথে ১২ মাসে ভ্রমণ করে এইজন্য সেই পথকে আবার ১২

---

* এই ২৭টী ছাড়া সপ্তর্ষি ও অগস্ত্য (Cannopus) নামক আর দুইটী নক্ষত্র-মণ্ডলী হিন্দুদের জানা ছিল। গণনার সুবিধার জন্য যতগুলি নক্ষত্র-মণ্ডলী কল্পনা করা আবশ্যক হইয়াছিল তাঁহারা ঠিক ততগুলিই কল্পনা করিয়াছিলেন। বিখ্যাত গ্রীক জ্যোতির্বিদ টলেমী ১০০ খৃষ্টাব্দে যে তালিকা প্রস্তুত করেন তাহাতে ৪৮টী নক্ষত্র-মণ্ডলীর নাম উল্লিখিত হইয়াছে। এখন নক্ষত্র-মণ্ডলীর সংখ্যা অনেক বাড়িয়াছে।

ভাগে বিভক্ত করা আবশ্যক হইল। পণ্ডিতেরা তখন পূর্ব্বোক্ত অশ্বিনী, ভরণী রোহিণী ইত্যাদি নক্ষত্র-মণ্ডলীকে ১২ ভাগে বিভক্ত করিলেন। এক এক ভাগে ২।০ সোয়া দুই নক্ষত্র পড়িল। এই সোয়া দুই নক্ষত্রের এক এক ভাগকে রাশি কহে। পূর্ব্বে যেমন চন্দ্রের পথ ২৭ ভাগে বিভক্ত করিয়া অশ্বিনী, ভরণী ইত্যাদি নাম দেওয়া হইয়াছিল এখন আবার দ্বাদশ রাশির মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কট, সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিক, ধনু, মকর, কুম্ভ এবং মীন নাম রাখা হইল। রাশিগুলি চক্রাকারে পৃথিবীর চারিদিকে আকাশে অবস্থিত এই জন্য রাশিগুলিকে একত্রে রাশিচক্র (Zodiac) কহে।

রাশি-চক্র। *

এই নাম ও আকার কল্পনায় দুইটী সুবিধা হইয়াছে; কোন্ দিন আকাশের কোন্ স্থানে সূর্য্য ও চন্দ্র অবস্থান করে তাহা নাম দ্বারা ব্যক্ত করা যায় এবং সেই স্থান আকাশের কোন অংশ তাহাও যন্ত্রের সাহায্য ব্যতীত নির্দ্ধারিত হইতে পারে।

কেহ কেহ অনুমান করেন, হিন্দুরা গ্রীক্‌দিগের নিকট হইতে এই রাশি-বিভাগ প্রণালী গ্রহণ করিয়াছেন। গ্রীক্‌গণ মিসরবাসীদিগের নিকট হইতে ঐ প্রণালী শিখিয়াছিলেন। মিসরবাসীরাই রাশি-চক্রের কল্পনা উদ্ভাবন করেন।

কয়েকটী প্রসিদ্ধ-নক্ষত্র ও নক্ষত্র-মণ্ডলী।

আকাশের নক্ষত্রগুলি পূর্ব্বদিকে উদয় হয় এবং পশ্চিম দিকে অস্ত যায়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি পৃথিবী স্বীয় মেরুদণ্ডের উপর আবর্ত্তন

* বিশ্বকোষ—খগোল। Ency. Brt.—Astronomy

(Rotate) করে বলিয়া নক্ষত্রসকলের ঐরূপ উদয়াস্ত দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। কেবল একটী নক্ষত্রকে সর্ব্বদা একস্থানে দেখিতে পাওয়া যায়। উহার উদয়াস্ত নাই। এই নক্ষত্রটীর নাম ধ্রুব (Pole Star)। ধ্রুব সকল ঋতুতেই রাত্রিতে দৃষ্টিগোচর হয়। এই ধ্রুব নক্ষত্রই নাকি সেই বালক যোগী ধ্রুব। ভগবান্ তাঁহার তপে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে এই উন্নত লোকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। পৃথিবীর

ধ্রুব।

মেরুদণ্ডকে উপরের দিকে বর্দ্ধিত করিলে আকাশের যে স্থান দিয়া যাইবে তাহাকে সুমেরু কহে। ধ্রুব সেই সুমেরুর উপর অবস্থিত। এইজন্য ধ্রুব নক্ষত্রের গতি দেখা যায় না। তুমি যদি ঘরের এক স্থানে দাঁড়াইয়া ঘুরিতে থাক, তাহা হইলে চারিদিকের সকল পদার্থই ঘুরিতেছে দেখিতে পাইবে। কিন্তু ঘুরিতে ঘুরিতে ঠিক মাথার উপরে কোন বস্তুর প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে দেখিবে উহা অচল রহিয়াছে। এইরূপ ঘূর্ণ্যমান পৃথিবীতে দাঁড়াইয়া আমরা চারিদিকের সকল নক্ষত্রকেই ঘুরিতে দেখি কিন্তু 'ধ্রুব' মেরুর উপর অবস্থিত বলিয়া উহার কোন গতি লক্ষিত হয় না। *

ধ্রুব আকাশের উত্তরদিকে অবস্থিত। যখন দিক্‌দর্শন যন্ত্র আবিষ্কৃত হয় নাই তখন অকূল সমুদ্রে নাবিকেরা এই ধ্রুব নক্ষত্র দেখিয়া দিক ঠিক করিত। বেলা ১২টার সময় খাড়া বস্তুর ছায়া যে দিকে পড়ে উহাই উত্তর দিক্।

ধ্রুব নক্ষত্রটাকে খুঁজিয়া বাহির করিবার একটী কৌশল আছে। উত্তর আকাশে সাতটী খুব উজ্জ্বল নক্ষত্র আছে। উহাদিগকে

---

* ধ্রুব নক্ষত্র ঠিক মেরুর উপরে নহে। এইজন্য ধ্রুবও একবারে স্থির নয়। উহা এক অল্প স্থানের মধ্যে ঘুরে যে খালি চক্ষে উহার গতি লক্ষ্য হয় না। ধ্রুব হইতে মেরুর সন্নিহিত যত নক্ষত্র আছে উহাদের একটীরও গতি দৃষ্ট হয় না।
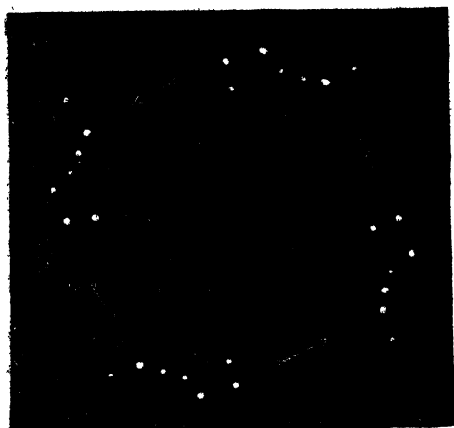
ধ্রুবকে কেন্দ্র করিয়া সপ্তর্ষিমণ্ডল প্রদক্ষিণ করিতেছে।

সপ্তর্ষি-মণ্ডল কহে। সপ্তর্ষি-মণ্ডলকে অতি সহজেই খুঁজিয়া বাহির করা যায়। কিন্তু সপ্তর্ষি-মণ্ডল সর্ব্বদা আকাশে দৃষ্টিগোচর হয় না। কারণ উহার উদয় অস্ত আছে। উহা ধ্রুব-তারার চারিদিকে ঘুরিতেছে। ভাদ্র মাসের মাঝা মাঝি অথবা ফাল্গুন মাসের প্রথম ভাগে সপ্তর্ষি-মণ্ডলকে সন্ধ্যার পরই আকাশে গাছ পালার মাথার উপর দেখিতে পাওয়া যায়। উহার চারটী তারায় একটী চতুর্ভুজ ও তিনটী তারায় উহার লেজ হইয়াছে। ইহার ইংরেজী নাম Great Bear বা বড় ভল্লুক।

সপ্তর্ষি-মণ্ডল।

উহার সম্মুখের তারা দুইটী মনে মনে একটী রেখা দ্বারা মিলাইয়া উহা বর্দ্ধিত করিলে ধ্রুবের খুব নিকট দিয়া যাইবে। এইরূপে ধ্রুব-তারাকে সহজে বাহির করিতে পারা যায়। এইজন্যই ঐ তারা দুইটীকে 'প্রদর্শক' (Pointers) কহে।

ভাদ্র-আশ্বিন মাসে সপ্তর্ষি ধ্রুব-তারার পশ্চিম দিকে উল্টাভাবে অর্থাৎ লেজ ঊর্দ্ধে ও মাথা নীচু করিয়া থাকে। (যেমন চিত্রে আছে।) ফাল্গুন-চৈত্র মাসে উহা ধ্রুব তারার পূর্ব্বদিকে দেখিতে পাওয়া যায়। তখন মাথা ঊর্দ্ধে ও লেজ নীচের দিকে থাকে।

সপ্তর্ষি-মণ্ডল ধ্রুব তারার যে দিকে থাকে তাহার বিপরীত দিকে ধ্রুব হইতে প্রায় সমান দূরে একটী নক্ষত্র-মণ্ডলী আছে। ইহার পাঁচটী তারা সংযুক্ত করিলে ইংরেজি "W" ডব্লিউ অক্ষরের ন্যায় হয়। এই নক্ষত্র-মণ্ডলীর নাম কাশ্যপেয়া (Casseopeia)।

কাশ্যপেয়া। প্রাচীনকালে এই নক্ষত্র-মণ্ডলীকে চেয়ারে উপবিষ্টা মহিলার ন্যায় কল্পিত হইয়াছিল। এইজন্য ইংরেজীতে ইহাকে Lady in chair বলিয়া থাকে। ভাদ্রের মধ্যভাগে রাত্রি ৮ টার সময় আমাদের ঠিক মথার উপর আকাশের গায় উত্তর দক্ষিণে বিস্তৃত একটা সাদা মেঘের মত পথ দেখিতে পাওয়া যায়। উহাকে ছায়াপথ কহে। কাশ্যপেয়া এই ছায়া-পথে অবস্থিত। ধ্রুব মাঝখানে আর সপ্তর্ষি ও কাশ্যপেয়া দুই দিকে অবস্থিত। দাঁড়ির যেমন একদিক উপরে উঠিলে আর একদিক নীচে নামে তেমনি সপ্তর্ষি যখন নীচে নামিতে থাকে তখন কাশ্যপেয়া উপরে উঠিতে থাকে। আবার কাশ্যপেয়া যখন ধীরে ধীরে নীচে নামিয়া অদৃশ্য হইয়া যায় তখন সপ্তর্ষি গাছপালার উপর দিয়া উঁকি মারিতে থাকে।

ধ্রুব তারার একটু দূরে আর দুইটী পরস্পর নিকটবর্ত্তী তারা আছে, উহাদিগকে ইংরেজীতে Guards বা প্রহরী নক্ষত্র-মণ্ডলী কহে। তার চেয়ে একটু দূরে সর্পের মত লম্বা একটী নক্ষত্র-মণ্ডলী আছে উহার নাম 'উরগ' (Draco) (১নং মানচিত্র দেখ)।

ভাদ্র মাসের শেষ ও আশ্বিন মাসের প্রথম ভাগে রাত্রি প্রায়

আকাশের গল্প

নক্ষত্রের মানচিত্র

ধ্রুব

মেষ

মিথুন

আর্দ্রা

বৃষ

কর্কট

কালপুরুষ
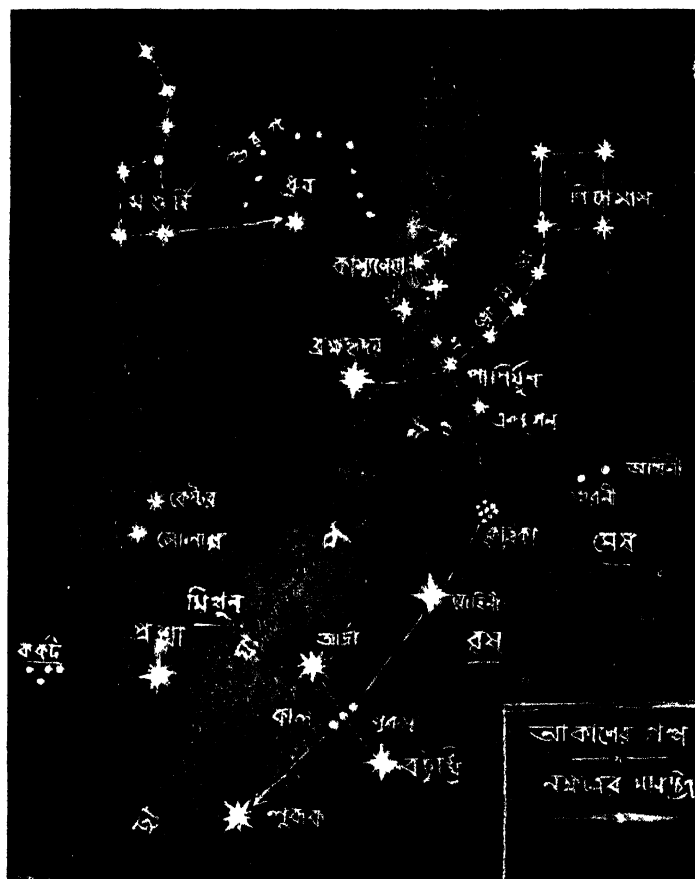
৯টার সময়ে কাশ্যপেয়া হইতে পূর্ব্বে চারিটী বেশ উজ্জ্বল নক্ষত্র চতুর্ভুজ আকারে অবস্থিত দেখিতে পাওয়া যায়। এই নক্ষত্র-মণ্ডলীর নাম পিগেসাস্ (Pegasus)। পিগেসাস্ নক্ষত্র-মণ্ডলীর পূর্ব্বার্দ্ধের নাম "পূর্ব্বভাদ্রপদ" আর নিম্নার্দ্ধের নাম উত্তরভাদ্রপদ।" ইহারা কুম্ভ রাশির অন্তর্গত। ইহার নীচে মীন রাশি। মীন রাশির এন্‌ড্রোমিডা (Andromeda) নক্ষত্র-মণ্ডলী বিখ্যাত। এন্‌ড্রোমিডার কতকাংশ লইয়া রেবতী নক্ষত্র। এন্‌ড্রোমিডার নীচে পার্শিয়ুস্। পার্শিয়ুস্ নক্ষত্র-মণ্ডলীর মধ্যে এল্‌গল্ (Algol) একটী আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তনশীল নক্ষত্র।

পিগেসাস্।

পার্শিয়ুস্ হইতে একটী রেখা টানিলে ব্রহ্ম-হৃদয় বা কেপেলা (Capella) নামক ১ম শ্রেণীর খুব উজ্জ্বল একটী নক্ষত্র পাওয়া যায়। কৃত্তিকা নক্ষত্র-মণ্ডলী তোমরা বোধ হয় চিনিয়াছ। পিগেসাসের নীচে মধুচক্রের ন্যায় কতকগুলি তারা একত্র দলবদ্ধ হইয়া আছে। উহাকে কৃত্তিকা কহে। আশ্বিনের মাঝামাঝি রাত্রি ১০টার এবং কার্ত্তিকের প্রথমভাগে সন্ধ্যার পরই পূর্ব্বদিকে গাছপালার উপরে কৃত্তিকা নক্ষত্র-মণ্ডলী দৃষ্টিগোচর হয়।

অশ্বিনী, ভরণী ও কৃত্তিকার কতকটা **মেষ রাশির** (Aries) অন্তর্গত। কৃত্তিকার নীচেই একটী খুব উজ্জ্বল প্রথম শ্রেণীর নক্ষত্র আছে উহার নাম রোহিণী বা এল্‌ডিবেরান (Aldeberan)। রোহিণী নক্ষত্রটী উজ্জ্বল লাল বর্ণ, এইজন্য উহাকে সহজে চিনিতে পারা যায়। রোহিণী **বৃষ রাশির** (Taurus) শ্রেষ্ঠ নক্ষত্র। (১নং মানচিত্র দেখ)

কৃত্তিকা যখন প্রায় মাথার উপর আইসে তখন পূর্ব্বাকাশে দিগ্‌বলয়ের কাছে দৃষ্টিপাত করিলে একটী উজ্জ্বল নক্ষত্র-মণ্ডলী

কালপুরুষ।

দেখিতে পাইবে। ইহার নাম কালপুরুষ (Orion)। সাধারণ লোক ইহাকে 'আদম্‌সুরৎ'ও বলিয়া থাকে। সমগ্র আকাশে এমন উজ্জ্বল ও বৃহৎ নক্ষত্র-মণ্ডলী আর দ্বিতীয় নাই। আশ্বিনের শেষ ও কার্ত্তিকের প্রথম ভাগে রাত্রি ১১টার সময় এবং অগ্রহায়ণে ৮।৯টা ও পৌষে সন্ধ্যার পরই দিক্‌বলয়ে ইহাকে দেখিতে পাওয়া যায়। চৈত্র ও বৈশাখ মাসে উত্তর আকাশে সপ্তর্ষি এবং দক্ষিণ আকাশে কালপুরুষ সন্ধ্যার পরই দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। কালপুরুষ নক্ষত্র মণ্ডলীর আর্দ্রা (Betelguze) রিগেল্ (Rigel) লুব্ধক (Sirius) এই তিনটী ১ম শ্রেণীর নক্ষত্র। আর্দ্রা নক্ষত্রটী রক্তবর্ণ। লুব্ধক বা সিরিয়াস্ নক্ষত্রটীর মত বৃহৎ ও উজ্জ্বল নক্ষত্র আর জানা নাই। রিগেলের দেশীয় নাম বটুক্তিয়্। কালপুরুষ নক্ষত্রমণ্ডলী **মীন রাশির** (Gemine) অন্তর্গত। মিথুন রাশিতে ছায়াপথের অপর দিকে কেষ্টর্ ও পোলাক্স (Castor and Pollux) নামক দুইটী ২য় শ্রেণীর নক্ষত্র আছে, তাহার মধ্যে কেষ্টর একটী যুগল নক্ষত্র। উহাদের নীচে প্রশ্বা (Procyon) নামক একটী ১ম শ্রেণীর উজ্জ্বল নক্ষত্র আছে। **কর্কট রাশিতে** (Cancer) কোন উল্লেখযোগ্য নক্ষত্র নাই। (২নং মানচিত্র দেখ)

তারপর **সিংহ রাশির** (Leo) অন্তর্গত ১ম শ্রেণীর মঘা (Regulas) নক্ষত্রটী বিশেষ প্রসিদ্ধ। সিংহরাশি হইতে প্রতিবৎসর অগ্রহায়ণ মাসে বহুসংখ্যক উল্কাপাত হয়। **কন্যা-রাশির** (Virgo) মধ্যে চিত্রা নক্ষত্র (Spica) ও **তুলা-রাশির** (Libra) স্বাতি নক্ষত্র (Arcturus) ১ম শ্রেণীর। উজ্জ্বলতায় এই নক্ষত্র দুইটী লুব্ধক (Sirius) নক্ষত্রের পরেই স্থান পাইবার যোগ্য। সপ্তর্ষি-মণ্ডলীকে তোমরা চিনিয়াছ। সপ্তর্ষির
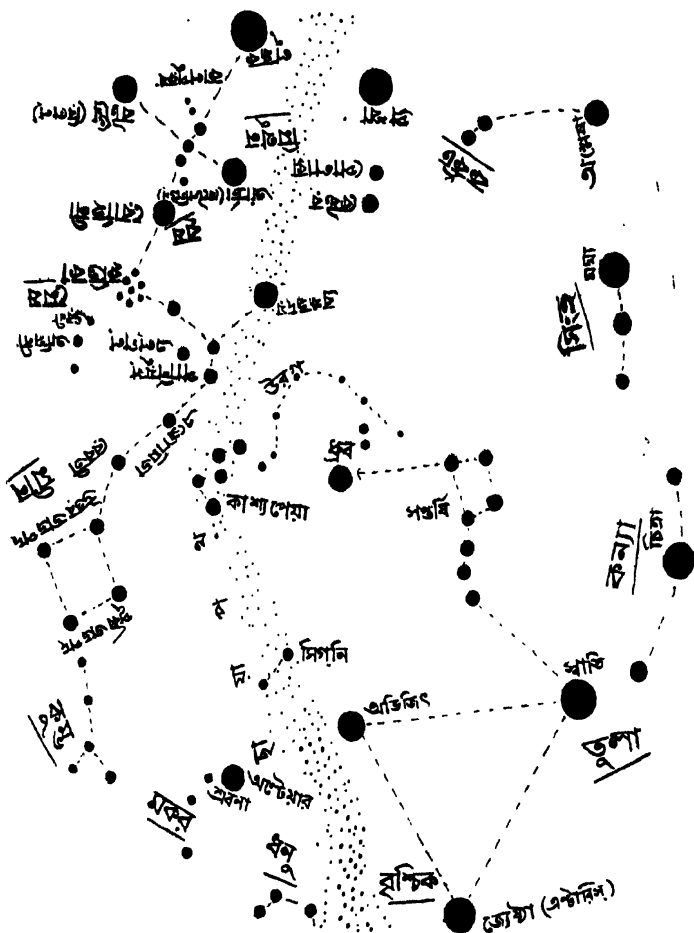
নক্ষত্রের মানচিত্র।

লেজের শেষ তারাটী হইতে নীচের দিকে একটী রেখা টানিলে স্বাতি নক্ষত্রে পৌঁছিতে পারিবে। **বৃশ্চিক রাশিতে**-ও (Scorpio) একটি ১ম শ্রেণীর নক্ষত্র আছে, ইহার নাম জ্যেষ্ঠা (Antares)। এই নক্ষত্র খুব উজ্জ্বল লাল বর্ণ এবং ছায়াপথের অতি নিকটে অবস্থিত। ছায়াপথটী বৃষ ও মিথুন রাশির মধ্যে এবং বৃশ্চিক ও ধনু রাশির মধ্যে রাশিচক্রকে কাটিয়া গিয়াছে। (৩নং মানচিত্র দেখ)

ধনুরাশি (Sagettarius) ছায়াপথের অপর দিকে। ধনু রাশিতে কোন উল্লেখযোগ্য নক্ষত্র নাই। ছায়াপথের নিকটে বীণা নক্ষত্র-মণ্ডলীর মধ্যে অভিজিৎ (Vega) নামক একটি অতি উজ্জ্বল ১ম শ্রেণীর নক্ষত্র আছে। কন্যা রাশির স্বাতি, বৃশ্চিক রাশির জ্যেষ্ঠা ও বীণার অভিজিৎ এই তিনটী ১ম শ্রেণীর নক্ষত্রকে লাইন টানিয়া পরস্পর সংযুক্ত করিলে একটী সমদ্বিবাহু ত্রিভুজ হয়।

মকররাশিস্থ (Capricornus) শ্রবণা নক্ষত্র-মণ্ডলীর (Acquila) অন্তর্গত অল্টেয়ার (Altair) নামক নক্ষত্রটী ১ম শ্রেণীর। ইহা ছায়াপথের নিকটে অবস্থিত।

কুম্ভ (Pisces) রাশিতে কোন প্রসিদ্ধ নক্ষত্র নাই। **মীন রাশিতে** পূর্ব্বভাদ্রপদ (Acquarius) ও উত্তর ভাদ্র পদের কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। এই দুইটী নক্ষত্র-মণ্ডলী পিগেসাসের (Pegasus) চতুর্ভুজের দুইটী ভুজ মাত্র। এই চতুর্ভুজের লেজ এণ্ড্রোমেডা নক্ষত্র-মণ্ডলী দ্বারা গঠিত। তারপর আবার মেষ, বৃষ ইত্যাদি রাশি ঘুরিয়া আসিবে। সমগ্র রাশিচক্র ও নক্ষত্র-মণ্ডলী ধ্রুব নক্ষত্রকে কেন্দ্র করিয়া ঘুরিতেছে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ইহা নক্ষত্রের দৃষ্ট গতি।

নক্ষত্রপুঞ্জ ও নীহারিকা।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, কতকগুলি দলবদ্ধ তারা লইয়া এক একটী নক্ষত্র-মণ্ডলী কল্পনা করা হইয়াছে। নক্ষত্র-মণ্ডলীর তারাগুলি অপেক্ষাকৃত উজ্জ্বল, এইজন্য উহাদিগকে চেষ্টা করিলে চিনিয়া লওয়া সহজ; আর খালি চক্ষেই উহাদিগকে দেখা যায়। নক্ষত্র-মণ্ডলীর তারাগুলি যেমন পরস্পর নিকটবর্ত্তী, তার চেয়ে অধিকতর ঘন দলবদ্ধ কতকগুলি নক্ষত্র আছে, উহাদিগকে নক্ষত্রপুঞ্জ (Star-clustar) কহে। নক্ষত্রপুঞ্জের সকল তারা খালি চক্ষে দৃষ্টিগোচর হয় না, কতকগুলি নক্ষত্রপুঞ্জের কেবল আলোকই আমরা দেখিতে পাই। তারাগুলি প্রত্যক্ষ করা যায় না। এমন কি, সাধারণ দূরবীক্ষণ দিয়াও কোন কোন নক্ষত্রপুঞ্জের তারা পৃথক পৃথক দৃষ্টিগোচর হয় না। আকাশের স্থানে স্থানে যে উজ্জ্বল সাদা মেঘের মত পদার্থ দেখা যায় ঐ সকলও নক্ষত্র-পুঞ্জ। ভাল দূরবীক্ষণ দিয়া দেখিলে ঐ সকল স্থানে শত শত নক্ষত্র দৃষ্ট হয়।

নক্ষত্রপুঞ্জ।

নক্ষত্রপুঞ্জের মধ্যে কৃত্তিকাটী (Pleiades) প্রায় সকলেরই পরিচিত। সাধারণ লোকে বলিয়া থাকে, কৃত্তিকারা "সাত বোন্।" ইহার কারণ, সাধারণতঃ এই নক্ষত্রপুঞ্জের সাতটী নক্ষত্র খালি চক্ষে দেখিতে পাওয়া যায়। যাহাদের দৃষ্টিশক্তি একটু প্রখর তাহারা দশটী নক্ষত্রপর্য্যন্ত দেখিতে পায়। অতি সাধারণ দূরবীক্ষণদ্বারা দেখিলেও এই নক্ষত্রপুঞ্জে চল্লিশটী নক্ষত্র দৃষ্টিগোচর হয়। উৎকৃষ্ট দূরবীক্ষণদ্বারা ৬২৫টী নক্ষত্র পর্য্যন্ত গণিতে পারা

কয়েকটী প্রসিদ্ধ নক্ষত্রপুঞ্জ।

কালপুরুষের নীহারিকা ।

গিয়াছে। ফটোগ্রাফের সাহায্যে এই নক্ষত্রপুঞ্জে ১৪২১টী নক্ষত্র ধরা পড়িয়াছে।

পার্শিয়ুস্ (Perseus) ও কাশ্যপেয়ার (Cassiopeia) মধ্যস্থলে একটী অতি উজ্জ্বল নক্ষত্রপুঞ্জ আছে। খালি চক্ষে উহা একখানি পাতলা উজ্জ্বল মেঘের ন্যায় বোধ হয়। দূরবীক্ষণ দিয়া দেখিলে তথায় ঘন বিন্যস্ত কুসুমস্তবকের ন্যায় বহুসংখ্যক নক্ষত্ররাজি দৃষ্টিগোচর হয়।

হারকিউলিস্ (Hercules) নক্ষত্র-মণ্ডলীর নিকট একটী নক্ষত্র-পুঞ্জ আছে। সাধারণ দূরবীক্ষণদ্বারা ইহার অস্পষ্ট জ্যোতিঃ মাত্র প্রত্যক্ষ হয়। সুপ্রসিদ্ধ "রসের" (Lord Rosse's) দূরবীক্ষণ-দ্বারা এই নক্ষত্রপুঞ্জে প্রায় দুই হাজার তারকা দেখা গিয়াছে।

ছায়াপথের বৃত্তান্ত অতিশয় বিস্ময়জনক। পাত্‌লা মেঘের মত ছায়াপথটী আকাশের উত্তর দক্ষিণে বৃত্তার্দ্ধের ন্যায় বিস্তৃত দেখিতে পাওয়া যায়। সমগ্র ছায়াপথটী নক্ষত্রপুঞ্জের সমষ্টি মাত্র। নক্ষত্রপুঞ্জের সংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইয়া ছায়াপথের দিকে অগ্রসর হইয়াছে। ছায়া-পথে যে কত নক্ষত্রপুঞ্জ তাহা গণনা করিয়া বলিবার সাধ্য নাই। সেই নক্ষত্রপুঞ্জের নক্ষত্ররাজিও নিতান্ত নগণ্য নহে। ছায়াপথের বৃত্তান্ত স্থানান্তরে প্রদত্ত হইয়াছে।

নক্ষত্রপুঞ্জ ব্যতীত আকাশে আরও এক প্রকার জ্যোতিষ্ক আছে, উহাদিগকে "নীহারিকা" বলে। নীহারিকার বৃত্তান্ত অতিশয় কৌতূহলজনক। ইংরেজীতে নীহারিকাকে নেবি-উলা (Nebula) বলে। নেবিউলা লাটিন্ শব্দ, ইহার অর্থ বাষ্প বা মেঘ। নীহারিকা আকাশের গায় মৃদুজ্যোতিঃ মেঘখণ্ডের ন্যায় প্রতীয়মান হয়। নীহারিকা বহু দূরে অবস্থিত, এই জন্য দূরবীক্ষণ ব্যতীত দৃষ্টিগোচর হয় না।

নীহারিকা।

কিন্তু আয়তনে নীহারিকাগুলি ক্ষুদ্র নহে। সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র নীহারিকাটীও আমাদের সূর্য্য হইতে অনেক বৃহৎ। সুতরাং নীহারিকার বিবরণ বড় উপেক্ষার বিষয় নহে।

যে সকল উজ্জ্বল মেঘখণ্ডকে পূর্ব্বে পণ্ডিতেরা নীহারিকা বলিয়া উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন, ভাল দূরবীক্ষণদ্বারা পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে, উহারা বাস্তবিক নীহারিকা নহে,—নক্ষত্রপুঞ্জ মাত্র। খুব দূরে আছে বলিয়া সাধারণ দূরবীক্ষণেও নক্ষত্রগুলি পৃথক দৃষ্ট হয় না। সার উইলিয়ম হর্শেল প্রথমে মনে করিয়াছিলেন, এখন যে সকল জ্যোতিষ্করাজি নীহারিকা বলিয়া পরিচিত, সেইগুলিও আরও ভাল দূরবীক্ষণ আবিষ্কৃত হইলে নক্ষত্রপুঞ্জ বলিয়া প্রমাণিত হইবে। কিন্তু বর্ণ-বীক্ষণ যন্ত্রদ্বারা পরীক্ষা করিয়া তিনি বুঝিতে পারিলেন, প্রকৃতই কতকগুলি নীহারিকা আছে, সেগুলি কিছুতেই নক্ষত্রপুঞ্জ হইতে পারে না।

সার উইলিয়ম হগিন্স (Sir William Huggins) সর্ব্বপ্রথমে মেঘবৎ প্রতীয়মান নক্ষত্রপুঞ্জ হইতে নীহারিকা যে পৃথক ও স্বতন্ত্র পদার্থ তাহা সপ্রমাণ করেন। তিনি বলেন, নক্ষত্রপুঞ্জ যেমন তারার সমষ্টি, নীহারিকাগুলি তেমন নহে। উহারা উজ্জ্বল বাষ্পপুঞ্জ মাত্র।

কয়েকটী প্রসিদ্ধ নীহারিকা।

এণ্ড্রোমেডা নক্ষত্র-মণ্ডলীর নিকটবর্ত্তী একটী নীহারিকা আছে। উহা দূরবীক্ষণ আবিষ্কারের পূর্ব্ব হইতেই জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণের নিকট পরিচিত ছিল। এই নীহারিকাটী বোধ হয় খুব নিকটবর্ত্তী এবং অতিশয় উজ্জ্বল, এই কারণে উহা খালি চক্ষেই দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে।

সার উইলিয়ম হর্শেল ১৭৮৬ হইতে ১৮০২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত কঠোর পরিশ্রম করিয়া আড়াই হাজার নীহারিকা আবিষ্কার করেন এবং ঐ-

সকল নীহারিকার একটা তালিকাও প্রস্তুত করেন। হর্শেলের মৃত্যুর পর তৎপুত্র সার জন্ হর্শেল উত্তমাশা অন্তরীপে গিয়া ১৭০৮টী নূতন নীহারিকা আবিষ্কার করিয়া পূর্ব্বোক্ত তালিকার অন্তর্ভুক্ত করেন। এ পর্য্যন্ত প্রায় আট হাজার (৭৮৪০) নীহারিকা আবিষ্কৃত হইয়াছে। ভবিষ্যতে হয় তো নীহারিকার তালিকায় আরও নূতন নীহারিকার নাম সংযুক্ত হইবে।

নীহারিকার বৈচিত্র্য।

নীহারিকাগুলির আকার ও আয়তন ভিন্ন ভিন্ন প্রকার। সমুদ্র-তীরে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত উপলখণ্ডগুলি যেমন আকার ও আয়তনে বিভিন্ন তেমনি আকাশে নানা রকমের ছোট বড় বহু সংখ্যক নীহারিকা আছে। উহাদের আকৃতিগত বৈচিত্র্য অসাধারণ রহস্যময়। কোন নীহারিকার আকৃতি গোলাকার, কোনটী কুণ্ডলী পাকান (Spirial), কোনটি চক্রাকারে ঘূর্ণায়মান (Annular), কোনটী বাদামী ধরণের। কর্কটও 'ডাম্বেল' (Dumb bell) প্রভৃতি বিচিত্র আকৃতিরও কয়েকটী নীহারিকা আবিষ্কৃত হইয়াছে।

কালপুরুষ (Orion) নক্ষত্র-মণ্ডলীর মধ্যে একটী অতি রমণীয় নীহারিকা আছে। ইহা খুব বৃহৎ, দেখিতে অনেকটা মকর মাছের মুখের মত।

অর্গাস্ (Argus) নক্ষত্রের নিকটবর্ত্তী নীহারিকাটীর বাষ্পে ঐ নক্ষত্রের উপাদান বিদ্যমান। বোধ হয় সেই নীহারিকা হইতেই ঐ নক্ষত্রের উৎপত্তি হইয়াছে। কোন কোন নীহারিকা দেখিয়া অনুমান হয় যেন ইহারা ঘনীভূত হইতেছে। কোন কোন নীহারিকা কঠিন হইয়া নূতন নক্ষত্রে পরিণত হইতেছে, স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়।

নীহারিকাগুলি কালে ঘনীভূত হইয়া নক্ষত্রে পরিণত হইবে। লাপ্লাস্ (Laplace) সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন, নীহারিকা হইতেই জগতের উৎপত্তি হইয়াছে। এক সময়ে ব্রহ্মাণ্ডের সকল জ্যোতিষ্কই বাষ্পাকারে শূন্যে ঘুরিতেছিল। ক্রমে যখন উহাদের অভ্যন্তর-ভাগ ঘনীভূত হইয়া কঠিন হইতে আরম্ভ করিল তখন উহা অধিকতর প্রবল বেগে ঘুরিতে লাগিল।

নীহারিকা-বাদ।

সেই সময় কেন্দ্রাপসারিণী গতি মাধ্যাকর্ষণকে অতিক্রম করাতে উপরের বাষ্পরাশি দূরে উৎক্ষিপ্ত হইল। এইরূপে পৃথক হইয়াও উৎক্ষিপ্ত অংশসকল মাধ্যাকর্ষণের নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া মূল নীহারিকাকে প্রদক্ষিণ করিতে লাগিল। আমাদের সূর্য্যও এক সময় নীহারিকা বা বাষ্পময় ছিল। সূর্য্য হইতে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে গ্রহ সকল উৎপন্ন হইয়াছে। আকাশে যত গ্রহ, উপগ্রহ, সূর্য্য, নক্ষত্র আছে সকলই এক সময়ে নীহারিকা ছিল। ইহাকেই নীহারিকা-বাদ (Nebular hypothesis) কহে। লিব্‌নিজ (Libnitz) প্রভৃতি পণ্ডিতগণ নীহারিকা-বাদের পক্ষপাতী। এখনও ভগবানের শিল্পশালায় কত সূর্য্য নির্ম্মিত হইতেছে! আবার কত সূর্য্য শীতল হইয়া অদৃশ্য হইতেছে! আমাদের এই "সুজলা-সুফলা-শস্য-শ্যামলা" ধরণী এককালে জলন্ত

বাষ্পাকারে অবস্থিত ছিল, এই কথা এখন আমরা কল্পনাও করিতে পারি না!
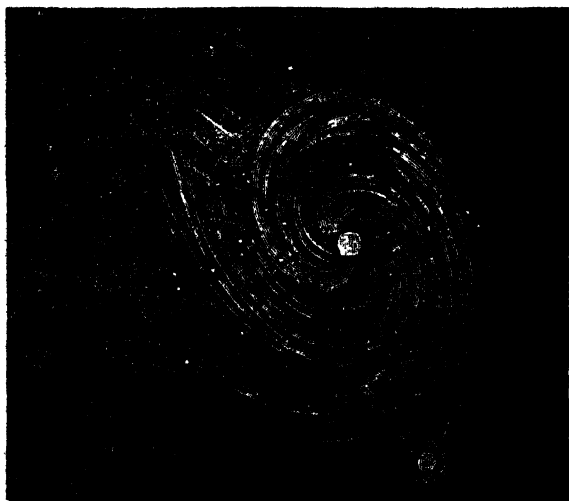
কোন কোন নীহারিকার দুইটী অংশ আছে। ঐ দুই অংশ যুগল নক্ষত্রের ন্যায় একটী নির্দ্দিষ্ট বিন্দুর চারিদিকে ঘুরিতেছে। বোধ হয় কালে এই নীহারিকা যুগলনক্ষত্রে পরিণত হইবে।

নীহারিকা হইতে যে নক্ষত্রসকল উৎপন্ন হইয়াছে আর একটী বিষয় হইতে তাহা অনুমিত হয়। ছায়াপথে কোন নীহারিকা দৃষ্টিগোচর হয় না। ছায়াপথ হইতে যত দূরে যাওয়া যায় ততই নীহারিকার সংখ্যা বাড়িতে থাকে। পণ্ডিতেরা বলেন, ছায়াপথের নীহারিকা সমূহ নক্ষত্রে পরিণত হইয়াছে, কিন্তু দূরতর প্রদেশের নীহারিকাসকল আজ পর্য্যন্ত বাষ্পাকারে আছে। *

* There is this perfect demonstration that nebulous matter is involved in the formation of new stars—Lockyer.

যুগল-নক্ষত্র।

নক্ষত্র-জগতের অসামান্য বৈচিত্র্য বহুদিন পর্য্যন্ত জ্যোতিষীদিগের নিকট অপরিজ্ঞাত ছিল। উৎকৃষ্ট দূরবীক্ষণ ও বর্ণ-বীক্ষণ যন্ত্র আবিষ্কৃত হইলে পর নক্ষত্রদিগের সম্বন্ধে অনেক তথ্য অবগত হওয়া গিয়াছে। আকাশে যে সকল নক্ষত্র দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে উহাদের মধ্যে কোন কোন নক্ষত্র যে "যুগল" (Double) এই বিষয়ে পূর্ব্বে কাহারও ধারণা হয় নাই।

যুগল-নক্ষত্র যখন প্রথম আবিষ্কৃত হইল, তখন কেহ কেহ বলিলেন, ঐ সকল নক্ষত্র বাস্তবিক যুগল নয়। যুগল বোধ হইবার কারণ এই

দৃষ্টতঃযুগল।

যে, দুইটী দূরবর্ত্তী নক্ষত্র পরস্পর হইতে খুব ব্যবধানে থাকিলেও সমসূত্রে দৃষ্টিগোচর হইলে উহাদিগকে একত্র বোধ হইয়া থাকে। খুব দূর হইতে শ্রেণীবদ্ধ অতি দূরবর্ত্তী আলোক-শিখাগুলিকেও সমসূত্রে দেখিলে একত্র বলিয়া ভ্রম জন্মে। ঐরূপ দৃষ্টি-ভ্রম হেতুই কতকগুলি নক্ষত্রকে "যুগল" দেখায়, বাস্তবিক উহারা যুগল নহে, প্রথমে অনেকের এই বিশ্বাস হইয়াছিল।

এখন যুগল-নক্ষত্রের অস্তিত্ব অভ্রান্তরূপে প্রমাণিত হইয়াছে। কেসিনি (Cassini) নামক একজন জ্যোতির্ব্বিদ্ ১৬৭৮ খৃষ্টাব্দে সর্ব্বপ্রথম যুগল-নক্ষত্র আবিষ্কার করেন। ঐ সময় হইতে জ্যোতিষি-

যুগল নক্ষত্রের সংখ্যা।

গণ যুগল-নক্ষত্র সম্বন্ধে বিশেষ তথ্য অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন। ১৭৮১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ৮০টী যুগল-নক্ষত্রের সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। পরে যখন সুবিখ্যাত পণ্ডিত সার উলিয়ম্ হর্শেলের দৃষ্টি উহাদের উপর

পতিত হইল, তখন বহুসংখ্যক নূতন নক্ষত্র আবিষ্কৃত হইল। হর্শেল ২৪০০ শত যুগল-নক্ষত্র তাঁহার তালিকাভুক্ত করিয়াছিলেন। ষ্ট্রুভের (Struve) তালিকায় ৩০৬৩টী যুগল-নক্ষত্র স্থান পাইয়াছে। এখন প্রায় ১২০০০ হাজার যুগল-নক্ষত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে, এবং ৬০০ শত যুগল-নক্ষত্রের ভ্রমণ-পথ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। হর্শেল কেবল বহুসংখ্যক যুগল-নক্ষত্র আবিষ্কার করিয়াই নিশ্চেষ্ট হন নাই, তিনি কঠোর পরিশ্রম ও পর্য্যবেক্ষণদ্বারা ঐ সকল নক্ষত্র সম্বন্ধে অনেক অভিনব ও অত্যাশ্চর্য্য তথ্য আবিষ্কার করেন।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, যুগল-নক্ষত্রের তারকা দুইটীর ব্যবধান অত্যন্ত অল্প। সে জন্য কেহ মনে করিবেন না যে উহাদের পরস্পরের দূরত্ব দশ কি পনর হাজার মাইলের অধিক নয়। 'সিগ্নি ৬১' নামক যুগলনক্ষত্রের দুইটী তারকা পরস্পর হইতে ৫৬৫৮০০০০০০০ মাইল দূরবর্ত্তী। অথচ খালি চক্ষে উহাদিগকে একটী অভিন্ন তারার মত দেখা যায়।

গতি ও পরিবর্ত্তন যেমন সৌর-জগতের ধর্ম্ম, তেমনি সকল নক্ষত্রমণ্ডলেও ঐ ব্যাপার দেখিতে পাওয়া যায়। পূর্ব্বে বলিয়াছি, নক্ষত্ররাজি একবারে অচল নহে, উহারা স্থান পরিবর্ত্তন করিতেছে। যুগল-নক্ষত্রসমূহও ঐ নিয়মের অধীন। তদ্ভিন্ন কতকগুলি যুগল-নক্ষত্রের অন্যপ্রকার গতি আছে। উহাদের অন্তর্গত দুইটী নক্ষত্র উভয়ের মধ্যবর্ত্তী একনির্দ্দিষ্ট বিন্দুর চারিদিকে অনবরত ঘুরিতেছে। এইরূপে একটী আর একটী হইতে শত কোটী মাইল দূরে থাকিয়া বহু শত অথবা বহু সহস্র বৎসরে পরস্পরকে প্রদক্ষিণ করিতেছে! অথচ উহাদের কোনটীর গতিই মিনিটে ৫০০০ মাইলের কম নয়।

যুগল-নক্ষত্রের পরস্পর যে সম্বন্ধ, কোথাও তিন তারায়, কোথাও বা যোড়ায় যোড়ায় অথবা বহু তারায় (Multiple star) সেইরূপ

সম্বন্ধ অর্থাৎ মাধ্যাকর্ষণের অধীন হইয়া নির্দ্দিষ্ট বিন্দুর চারিদিকে ঘুরিতেছে।

লায়ার (Lyre) নামক নক্ষত্র-মণ্ডলের অন্তর্গত একটী যুগল-নক্ষত্র আছে উহাকে খালি চক্ষে একটী বলিয়া বোধ হয় এবং উহার আলোকও তত উজ্জ্বল নয়। অতি সাধারণ দূরবীক্ষণ দ্বারা দেখিলেও উহার দুইটী নক্ষত্র দৃষ্টিগোচর হয়। খুব উৎকৃষ্ট দূরবীক্ষণ দিয়া দেখিলে লায়ারে দুইটী যুগল-নক্ষত্র দেখিতে পাওয়া যায়। অর্থাৎ যুগল-নক্ষত্রের দুইটী নক্ষত্রও আবার যুগল। এইজন্য ইংরেজীতে এই নক্ষত্রটাকে Double-double star বা যুগলে-যুগল নক্ষত্র বলে। এইখানে দুই যোড়া সূর্য্য একত্র রহিয়াছে! প্রত্যেক যোড়ায় আবার দুইটী সূর্য্য! উহারা উভয়েই একটী নির্দ্দিষ্ট বিন্দুর চারিদিকে ঘুরিতেছে। আবার একটী যুগল-নক্ষত্র আর একটী যুগল-নক্ষত্রকে ঐরূপ প্রদক্ষিণ করিয়া থাকে। পণ্ডিতেরা অনুমান করেন, পূর্ব্বোক্ত যুগল-নক্ষত্র দুইটীর একবার পরস্পরকে প্রদক্ষিণ করিতে প্রায় ১০ লক্ষ বৎসর সময় লাগে।

যুগলে-যুগল।

সপ্তর্ষি মণ্ডলের লেজের তিনটী নক্ষত্রের মধ্যের নক্ষত্রটী যুগল। উহার একটী নক্ষত্র অপরটী হইতে আয়তনে দ্বিগুণ বড়। ঐ যুগল-নক্ষত্রের বড় নক্ষত্রটীও আবার যুগল। বোধ হয় কালে অনেক যুগলে-যুগল নক্ষত্র আবিষ্কৃত হইবে।

লুব্ধক (Sirius) নক্ষত্রটী অনেকেরই পরিচিত। এই নক্ষত্রটী দেখিতে খুব উজ্জ্বল। উহা প্রাচীন কালেই জ্যোতিষীদিগের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। গ্রীক্ জ্যোতির্ব্বিদ্গণ উহার বর্ণ লাল বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু আমরা উহাকে কিছু নীলাভ দেখিয়া থাকি। বোধ হয় লুব্ধক নক্ষত্রের রঙ্ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। এই

নক্ষত্রটী যুগল। উহার একটী হীন-প্রভ সহচর আছে। লুব্ধক উহা হইতে পাঁচহাজার গুণ অধিক উজ্জ্বল, কিন্তু দুইগুণ অধিক ভারী।

সার উলিয়ম হর্শেলই প্রথম আবিষ্কার করেন, যে যুগল নক্ষত্রের অন্তর্গত দুইটী নক্ষত্র পরস্পর পরস্পরের আকর্ষণগুণে বৃত্তাভাস পথে পরিভ্রমণ করিতেছে। মাধ্যাকর্ষণ বলে সৌর-জগতের গ্রহ উপগ্রহ ইত্যাদি জ্যোতিষ্করাজি শূন্যে অবস্থান করিয়া বৃত্তাভাস পথে সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিতেছে, ইহা পূর্ব্বে প্রমাণিত হইয়াছে। কিন্তু বিশাল ব্রহ্মাণ্ডের জ্যোতিষ্ক সমূহ সর্ব্বত্র এই নিয়মের অধীন কি না তাহা জ্যোতির্ব্বিদগণ অবগত ছিলেন না। অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের তুলনায় সমগ্র সৌর-জগৎও অতি ক্ষুদ্র; সমুদ্রের সহিত তুলনায় যেমন এক বিন্দু জলকণা। সুতরাং ক্ষুদ্র সৌর-জগতের নিয়ম ও শৃঙ্খলা দেখিয়া বিশাল বিশ্বের অনুসাশন ও শৃঙ্খলা নিঃসন্দেহে কিছু বলা যায় না। কিন্তু হর্শেল কর্ত্তৃক যুগল-নক্ষত্রের বৃত্তান্ত আবিষ্কৃত হইলে জানা গেল যুগলনক্ষত্র সমূহও মাধ্যাকর্ষণের অধীন হইয়া বৃত্তাভাস কক্ষে পরস্পরকে প্রদক্ষিণ করিতেছে। অর্থাৎ সমগ্র বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড একই নিয়মে শাসিত। ভগবানের বিশাল সাম্রাজ্যে কোথাও নিয়মের বৈষম্য নাই।

যুগল নক্ষত্রের কক্ষ।
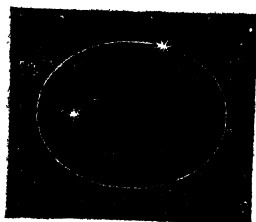
যুগল-নক্ষত্রের কক্ষ।

নক্ষত্রের বর্ণ-বৈচিত্র্য।

অতিশয় আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, অপরাপর নক্ষত্রের ন্যায় সকল যুগল-নক্ষত্রের আলোক শুভ্র নহে। অবশ্য কয়েকটী পরিচিত নক্ষত্র আছে, উহারা যদিও যুগল নয় তথাপি উহাদের বিভিন্ন রঙের আলোক আছে। বড় নক্ষত্রের মধ্যে রোহিণী, এন্‌টারিস্ এবং আর্দ্রা উজ্জ্বল লাল বর্ণ। লুব্ধক (Sirius), অভিজিৎ (Vega) এবং চিত্রা একটু নীলাভ। ব্রহ্ম-হৃদয় (Capella), প্রশ্বা (Procyon) ও স্বাতি আমাদের সূর্য্যের ন্যায় একটু পীতবর্ণ। কিন্তু যুগল-নক্ষত্রের আলোক-বৈচিত্র্য অতি মনোরম, উহাদের বর্ণ-মাধুর্য্য বড়ই চিত্তাকর্ষক। কতগুলি যুগল-নক্ষত্র আছে, উহাদের দুইটীর রঙ্ই এক প্রকার, যেমন দুইটীই শাদা অথবা লাল। আর কতগুলি আছে উহাদের দুইটীর নক্ষত্রই ভিন্ন রঙের, যেমন একটা সবুজ একটা শাদা, একটা লাল একটা শাদা, একটা কমলা একটা রক্তবর্ণ। আর কতগুলি যুগল-নক্ষত্রের বর্ণ-পার্থক্য তত বেশী নয়, যেমন একটা গোলাপী আর একটা পদ্ম, একটা সোণালী আর একটা হলুদে ইত্যাদি। এখানেই যুগল-নক্ষত্রের বর্ণ-বৈচিত্র্য শেষ হইল না। পূর্ব্বোক্ত বর্ণের নক্ষত্র ব্যতীত ধূসর, পাটল ও বাদামী রংএর বহুসংখ্যক নক্ষত্র আকাশে শোভা পাইতেছে। শেষোক্ত নক্ষত্রগুলি আয়তনে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র। কিন্তু ক্ষুদ্র বলিয়া নিতান্ত নগণ্য নহে। অতি ক্ষুদ্র নক্ষত্রটীও সৌর-জগতের সমগ্র গ্রহগুলির সমষ্টি হইতে বড়। আমাদের সূর্য্য একাকী আপন রাজ্যে আলোক দিতেছে। চিরদিন তাহার এক রকম আলো। যুগল-তারা দুইয়ে মিলিয়া আলোক দেয়। আর উহাদের রাজ্যে আকাশের বৈচিত্র্য কত! কোন যুগল তারার রাজ্যে এক দিনের আভা লাল, একদিনের আভা নীল; কোন যুগল তারার একদিনের আলো পীত, আর একদিনের আলো পাটল ইত্যাদি।

যদি ঐ সকল বিচিত্র-বর্ণ সূর্য্যের আমাদের পৃথিবীর ন্যায় জনপ্রাণী পূর্ণ গ্রহ থাকে, তাহা হইলে ঐ সকল গ্রহের অধিবাসীরা প্রতিদিন নয়নের তৃপ্তিকর কত সৌন্দর্য্য প্রত্যক্ষ করে! বৃক্ষ লতাদি নানা বর্ণে রঞ্জিত হইয়া প্রকৃতির কি অপূর্ব্ব শ্রীসম্পাদন করে! এক সময়ে আকাশে নানা বর্ণের সূর্য্য উদিত হয় অথবা এক রঙের সূর্য্য অস্তমিত হইতেই অন্য বর্ণের সূর্য্য দেখা দিয়া থাকে! সেই সকল রাজ্যের অত্যাশ্চর্য্য মাধুর্য্য কল্পনা করিতেও আমরা অক্ষম। *

জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ নির্দ্ধারণ করিয়াছেন, সূর্য্য-রশ্মির ন্যায় যুগল-নক্ষত্রেরও আলোক শুভ্র। সূর্য্যের উত্তাপে বিবিধ ধাতু দ্রব হইয়া বাষ্পাকারে যেমন সূর্য্যের চতুর্দ্দিকস্থ বায়ুমণ্ডলীতে (atmosphere) মিশিয়া রহিয়াছে তেমনি নানাপ্রকার ধাতুর বাষ্প

বর্ণ-বৈচিত্র্যের কারণ।

যুগল-নক্ষত্রের বায়ুমণ্ডলেও বিদ্যমান রহিয়াছে। সকল নক্ষত্রের বায়ুমণ্ডলীতে একজাতীয় বাষ্প মিশ্রিত নহে। কতকগুলি নক্ষত্রের বায়ুমণ্ডলীতে এক জাতীয় বাষ্প বিভিন্ন পরিমাণে রহিয়াছে, আর কতগুলির বায়ুমণ্ডলীতে স্বতন্ত্র বাষ্প বিদ্যমান। ত্রিপল বিশিষ্ট কাচের উপর সূর্য্য-রশ্মি পতিত হইলে উহা বিশ্লেষিত হইয়া রামধনুর ন্যায় বিচিত্র বর্ণ প্রকাশ পায়। ঐ বর্ণের মাঝে মাঝে কাল রেখা (Fraunhofer's Line) দৃষ্টিগোচর হয়। নক্ষত্র-রশ্মি বিশ্লেষিত হইলেও ঠিক ঐরূপ হইয়া থাকে। বায়ুমণ্ডলস্থিত ধাতব বাষ্পই ঐ কৃষ্ণ রেখার কারণ। কৃষ্ণ রেখার আকার ও আয়তন বাষ্পের পরিমাণ ও প্রকৃতি অনুসারে-ছোট বড় হইয়া থাকে। নক্ষত্র-

* Imagination fails to concieve, the charming contrasts and graceful vicissitudes of red and green day alternating with white light or with darkness, in the planatory systems belonging to these suns!! Herschell.

রশ্মি যখন বাষ্পপরিপূর্ণ বায়ুমণ্ডল ভেদ করিয়া আইসে, তখন ঐ রশ্মি বিশ্লেষিত হইয়া রামধনুর ন্যায় বর্ণচ্ছটা বিকাশ করে। ঐ বর্ণচ্ছটার উপর কাল রেখা পতিত হয়। কাল রেখা যখন খুব বিস্তৃত হয় তখন বহু বর্ণের একটী কি দুইটী বর্ণ ঢাকিয়া যায়। কাল রেখা যখন লাল বর্ণের অংশটি ঢাকিয়া ফেলে তখন পীত, সবুজ বা নীল বর্ণ উজ্জ্বল হয়, আর যখন সবুজ অংশ ঢাকিয়া যায় তখন নক্ষত্রের আলোক কমলা রং ধারণ করে। নক্ষত্র পরিবেষ্টিত বাষ্পরাশিই যুগল-নক্ষত্রের আলোক বৈচিত্র্যের কারণ। এক এক নক্ষত্রের বায়ুমণ্ডলস্থ বাষ্প কেন এক এক রকম হয় তাহার কারণ এ পর্য্যন্ত কেহ নির্দ্ধারণ করিতে পারেন নাই।

রাজ-সূর্য্য।

কালপুরুষ নামক একটী নক্ষত্র-মণ্ডলীর কথা পূর্ব্বে তোমাদিগকে বলিয়াছি। সাধারণ লোকে স্থান বিশেষে উহাকে 'আদম্‌সুরত্‌' বলে। অগ্রহায়ণের শেষ ভাগে কালপুরুষ সন্ধ্যার পরই পূর্ব্বাকাশে দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। এই নক্ষত্র-মণ্ডলী দেখিতে অনেকটা পুরুষের আকৃতিসদৃশ; আর বোধ হয় আদিম কালের অধিবাসীরা ইহা দেখিয়া রাত্রিতে কাল নির্ণয় করিত। এইজন্ত উহার কালপুরুষ নামকরণ হওয়া বিচিত্র নহে। এই নক্ষত্র-মণ্ডলীর ইংরেজী নাম 'অরায়ন' (Orion), উহা গ্রীক শব্দ। গ্রীকদিগের অরায়ন (Orion)

অরায়ন।

কথাটী হিন্দুদিগের নিকট হইতে গৃহীত। " অরায়ন, "অগ্রহায়ণ" কথার অপভ্রংশ মাত্র।*

কালপুরুষের নক্ষত্রগুলির ন্যায় এতগুলি উজ্জ্বল ও বৃহৎ নক্ষত্র আর কোন নক্ষত্র-মণ্ডলীতে দৃষ্ট হয় না। উহার মস্তকের নক্ষত্রগুলি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র; হস্তের একটী নক্ষত্র খুব উজ্জ্বল এবং দেখিতে লাল; উহার নাম আর্দ্রা। কালপুরুষের কোমরে কতকগুলি নক্ষত্র আছে উহাদিগকে কালপুরুষের কোমরবন্ধ (belt) বলে। ঐ কোমরবন্ধের নিম্নভাগে কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নক্ষত্র পর পর অবস্থিত; উহাদিগকে কালপুরুষের তরবারি (Sword) কহে। কালপুরুষের পাদদেশে একটী উজ্জ্বল তারকা আছে, তাহার নাম বট্টজ্যি (Rigel)। বট্টজ্যির রঙ্ সুনীল।

এ হেন বিচিত্র কালপুরুষকে আকাশে খুঁজিয়া বাহির করা কঠিন নহে। কালপুরুষের কোমরবন্ধ বর্দ্ধিত করিয়া নীচের দিকে মনে মনে একটী রেখা টানিলে ঐ রেখা একটী অতি উজ্জ্বল নক্ষত্রে আসিয়া ঠেকিবে। এই নক্ষত্রের নাম লুব্ধক বা মৃগব্যাধ; ইংরেজীতে উহাকে সিরিয়াস্ (Sirius) কহে। †

---

* ঋগ্বেদে শারদ বর্ষের উল্লেখ আছে। শারদ বর্ষের প্রথম মাসেরই নাম অগ্রহায়ণ। প্রাচীন বৈদিক কালে এক সময়ে অগ্রহায়ণ মাস হইতে বর্ষ গণনা হইত।

† আর্য্য সাহিত্যে উহার মৃগব্যাধ নামই প্রসিদ্ধ।

অশীতি ভাগৈর্য্যাম্যায়ামগস্ত্যো মিথুনান্তগঃ।
বিংশেচ মিথুনস্যাংশে মৃগব্যাধো ব্যবস্থিতঃ॥

সূর্য্যসিদ্ধান্ত, ৮ম অধ্যায়।

মিথুন রাশিকে আশিভাগে বিভক্ত করিলে উহার শেষ ভাগে অগস্ত্য এবং বিংশতিভাগে মৃগব্যাধ অবস্থিত।

লুব্ধক আকাশের উজ্জ্বলতম নক্ষত্র। লুব্ধক স্বীয় উজ্জ্বলতায় সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া থাকে। ইহা যেমন উজ্জ্বলতায় শ্রেষ্ঠ তেমনি আয়তনেও সুবৃহৎ। এই জন্য জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ উহাকে "রাজ-সূর্য্য" (King of Suns) বলিয়া থাকেন।

লুব্ধকের সহচর।

লুব্ধক, কেনিস্ মেজর (Canis major) নামক নক্ষত্র-মণ্ডলীর অন্তর্ভুক্ত। যদিও অতি প্রাচীনকালে এই নক্ষত্রটী জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল তথাপি উহার অচিন্তনীয় দূরত্বহেতু তাঁহারা ইহার কোন তত্ত্বই আবিষ্কার করিতে সমর্থ হন নাই। পৃথিবী হইতে সূর্য্য ৯২৭০০০০০ নয় কোটী সাতাইশ লক্ষ মাইল দূরে আছে; লুব্ধক এই বিশাল দূরত্বেরও অন্ততঃ ১৩ লক্ষ গুণ দূরে অবস্থিত।

লুব্ধক মিনিটে প্রায় হাজার মাইল গতিতে আকাশে ছুটিতেছে, তবু আমরা উহাকে নিশ্চল দেখিতে পাই। কিন্তু লুব্ধক নক্ষত্রের গতির বেগ সর্ব্বদা সমান থাকে না, বেগের হ্রাস বৃদ্ধি হয়। এই ব্যাপারটী লক্ষ্য করিয়া জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ অতিশয় বিস্মিত হইয়াছিলেন। কোথাও বাধাপ্রাপ্ত না হইলে জড়পদার্থের বেগের বৈষম্য হইতে পারে না, তবে লুব্ধকের গতির বেগের হ্রাস বৃদ্ধি হয় কেন?

লুব্ধক যে সমগতিতে চলিতেছে না এই তথ্যটী "বেসেল্" নামক জর্ম্মাণ জ্যোতির্ব্বিদ আবিষ্কার করেন। বেসেল্ ভাবিলেন, নিশ্চয়ই কোন শক্তি লুব্ধকের গতির বেগের হ্রাস বৃদ্ধি করিয়া দিতেছে। অনন্ত আকাশে প্রতিরোধক শক্তি আকর্ষণ ভিন্ন আর কিছুই হইতে পারে না। পণ্ডিতেরা আলোচনা করিয়া অনুমান করিলেন, লুব্ধকের একটী সঙ্গী তাহাকে প্রদক্ষিণ করিতেছে। লুব্ধকের সহচর যখন লুব্ধককে প্রদক্ষিণ করে তখন উহা কখন পশ্চাতে পড়ে, কখন সম্মুখে আইসে। সম্মুখ হইতে টানিলে উহার

গতি বৃদ্ধি পায় আর পশ্চাৎ হইতে টানিলে গতির হ্রাস হয়। এই অনুমান অনেকেই যথার্থ বলিয়া স্বীকার করিলেন। অতঃপর ঐ অদৃষ্টচর নক্ষত্র কোন্ সময়ে কোথায় অবস্থান করিবে তাহাও নির্দ্ধারিত হইল। কিন্তু নক্ষত্রটী তখনও দৃষ্টিগোচর হয় নাই। আমেরিকায় "এল্‌বান্ ক্লার্ক" নামক একজন প্রসিদ্ধ দূরবীক্ষণ-নির্ম্মাতা ছিলেন। ক্লার্ক ও তদীয় পুত্র একত্র কারখানায় কাজ করিতেন। ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে ক্লার্কের কারখানায় একটী সুবৃহৎ দূরবীক্ষণ যন্ত্র নির্ম্মিত হইল। কনিষ্ঠ ক্লার্ক যখন ঐ দূরবীক্ষণ পরীক্ষা করিবার জন্য লুব্ধক নক্ষত্রে উঁহার দৃষ্টি স্থাপন করিলেন তখন উহার সঙ্গীটী ধরা পড়িল। ঐ সঙ্গীটী ঐ সময়ে যে স্থানে থাকিবে বলিয়া পণ্ডিতেরা পূর্ব্বে নির্দ্ধারণ করিয়াছিলেন, পরীক্ষা করিয়া দেখা গেল সেই স্থানেই আছে!

লুব্ধকের সঙ্গী লুব্ধককে উনপঞ্চাশ বৎসরে একবার প্রদক্ষিণ করে। ঐ সহচরটী অতিশয় হীন-প্রভ। লুব্ধক হইতে পৃথক করিয়া দেখিলে উহা উজ্জ্বলতায় সপ্তম শ্রেণীর নক্ষত্র পর্য্যায়ভুক্ত হইবে। লুব্ধক স্বীয় সহচর হইতে হাজারগুণ অধিক উজ্জ্বল কিন্তু মাত্র দ্বিগুণ ভারী। ইহা আমাদের সূর্য্য হইতে ওজনে অধিক ভারী কিন্তু ঔজ্জ্বল্যে অতি হীন। ঐরূপ একশত নক্ষত্র একত্র করিলেও আমাদের সূর্য্যের সমান উজ্জ্বল হইবে না। ইহা হইতে প্রতীয়মান হয়, ব্রহ্মাণ্ডে হয়ত অতি ক্ষীণ-জ্যোতিঃ অনেক বৃহৎ নক্ষত্র পরিভ্রমণ করিতেছে, কিন্তু উহারা দূরবীক্ষণের দৃষ্টিতে ধরা পড়িতেছে না।

জ্যোতির্ব্বিদ্ প্রক্টার (Proctor) বলেন, লুব্ধকের আয়তন আমাদের সূর্য্যের আয়তন হইতে প্রায় দুই হাজার গুণ বৃহৎ। অর্থাৎ লুব্ধক উহার বিরাট উদর গহ্বরে আমাদের সূর্য্যের ন্যায় দুই হাজার সূর্য্য ধারণ করিতে পারে। পৃথিবী হইতে আমাদের সূর্য্য প্রায় ৯ লক্ষ

গুণ বৃহৎ ; আবার অনন্ত আকাশে দীপশিখার ন্যায় প্রতীয়মান লুব্ধক নক্ষত্র সেই বিরাট সূর্য্য হইতেও দুই হাজার গুণ বড়! এইজন্যই উহাকে রাজ-সূর্য্য নাম দেওয়া অসঙ্গত হয় নাই। লুব্ধকের আয়তন কত বড় তাহা কল্পনা করাও দুঃসাধ্য! কিন্তু লুব্ধক সূর্য্য হইতে মাত্র ২০ বিশগুণ অধিক ভারী। সুতরাং উহার উপাদান সূর্য্যের উপাদান হইতে হাল্‌কা।

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে, আকাশের নানা প্রদেশে সিরিয়াসের ন্যায় বড় রাজসূর্য্য অনেক আছে। মঘা, চিত্রা, প্রথা, অভিজিৎ উহারা সকলেই রাজ-সূর্য্য বলিয়া সম্মান লাভের যোগ্য। আকাশে এইরূপ আরও কত রাজ-সূর্য্য আছে তাহা বলা অসাধ্য।

ছায়াপথ।

নির্ম্মল অন্ধকার রজনীতে আকাশের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে সাদা পাতলা মেঘের ন্যায় একটী ক্ষীণ আলোকবর্ত্ম দেখিতে পাওয়া যায়। উহা আকাশের উত্তর দক্ষিণে এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত বিস্তৃত। এই আলোকবর্ত্মকে ছায়াপথ (Milky Way) বলে।

ইহার দেববর্ত্ম, দুগ্ধবর্ত্ম, আকাশগঙ্গা, স্বর্ণদী প্রভৃতি বহু নাম আছে। এই সকল নাম এবং তৎসম্বন্ধীয় বিচিত্র কাহিনীসমূহ পাঠ করিলে সহজেই ইহা অনুমিত হয় যে, অতি প্রাচীন-লোকদের কাছেই নানা দেশের অধিবাসিগণ অনন্ত আকাশে এই ক্ষীণ আলোকবর্ত্মই দেখিয়া অতীব বিস্মিত হইয়াছিলেন। এবং ইহার বিষয় জানিবার জন্য সকলেরই ব্যাকুলতা জন্মিয়াছিল। তখন বিজ্ঞানের উন্নতি হয় নাই। দূরবীক্ষণের

কথা কেহ কল্পনায়ও আনিতে পারিত না। সুতরাং এক এক জন ইহার এক এক রূপ কাল্পনিক ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছেন।

ধর্ম্মপ্রিয় হিন্দুগণ কল্পনা করিয়াছেন যে এই বিমানপথে শচীদেবী প্রতিরাত্রে দেবরাজ ইন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান। প্রাচীন গ্রীকগণ ছায়াপথকে 'গেলাক্‌সি' (Galaxy) বা দুগ্ধবর্ম্ম (Milky Way) বলিত। কথিত আছে, "জুপিটার" "হারকিউলিসকে" "জুনো" দেবীর ক্রোড়ে স্থাপন করিলে জুনোদেবী তাহাকে 'মার'- (Mar) পুত্র জানিয়া ত্যাগ করেন। তখন জুনোদেবীর স্তন হইতে দুগ্ধ ক্ষরিত হইয়া আকাশে ছড়াইয়া পড়ে। তাহাতেই দুগ্ধবর্ম্ম (Milky Way) হইয়াছে।

পূর্ব্বোল্লিখিত প্রচলিত কাহিনীসকল যে ভিত্তিহীন এই কথা আর এখন কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না। কিন্তু নানা জাতির প্রাচীন গল্পগুলিতে কোন সত্য না থাকিলেও ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে পুরাকালে অতি ক্ষীণ আলোক বিশিষ্ট ছায়াপথ তৎকালের অধিবাসিগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল।

দূরবীক্ষণের আবিষ্কারের অব্যবহিত পরেই ছায়াপথের প্রকৃত তথ্য আবিষ্কৃত হইয়াছে। কিন্তু প্রাচীন অতিরঞ্জিত কাহিনী অপেক্ষা বৈজ্ঞানিক তথ্য কোন অংশে কম বিস্ময়জনক নহে। বিজ্ঞান ছায়াপথের যে রহস্য উদ্ঘাটন করিয়াছে তাহা কবিকল্পনাকেও অতিক্রম করিয়াছে।

গ্যালিলিও ছায়াপথের যথার্থ তথ্য আবিষ্কার করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার পূর্ব্বেও দুই একটী পণ্ডিত উহার অতি ক্ষীণ আভাস প্রদান করিয়াছিলেন। গ্রীক পণ্ডিত আরিষ্টটল্ (Aristotle) ছায়াপথকে উজ্জ্বল বাষ্পরাশি বলিয়া উল্লেখ করিয়াছিলেন। ডিমোক্রিটাস্ (Democritus) প্রকৃত তথ্যের অনেকটা নিকটবর্ত্তী হইয়াছিলেন।

ক্ষীণ আভাস।

তিনি বলিয়াছেন, ছায়াপথ দূরস্থিত তারকা-পুঞ্জ মাত্র। অতিশয় দূরে আছে বলিয়া তারকাগুলি পৃথক পৃথক দৃষ্টিগোচর না হইয়া কেবল দুগ্ধবৎ শুভ্র দেখায়। কিন্তু ডিমোক্রিটাসের কথা তখন পরীক্ষা করিয়া দেখিবার কোনই উপায় ছিল না। গ্যালিলিও সর্ব্বপ্রথম দূরবীক্ষণ দ্বারা পরীক্ষা করিয়া প্রমাণিত করেন যে. বহু দূরস্থিত নক্ষত্রপুঞ্জের ক্ষীণ আলোকরাশিই ছায়াপথের সৃষ্টি করিয়াছে। গ্যালিলিও তাঁহার অতি নিকৃষ্ট দূরবীক্ষণদ্বারাই ছায়াপথে অগণিত নক্ষত্রপুঞ্জ প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন।

ছায়াপথ একটী বৃত্তের ন্যায় পৃথিবীকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। আকাশে দৃষ্টিপাত করিলে আমরা ছায়াপথের অর্দ্ধাংশ মাত্র দেখিতে পাই। ঠিক একটী বৃত্তের আধ খানা যেন আকাশের উত্তর দক্ষিণে এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে গিয়া মিলিয়াছে।

ছায়াপথ চিনিবার কৌশল।

পৃথিবী যদি কাচের ন্যায় স্বচ্ছ হইত তাহা হইলে পৃথিবীর ভিতর দিয়া আকাশের গায় ছায়াপথের অপরার্দ্ধও দেখিতে পাওয়া যাইত। দিনের বেলায়ও ছায়াপথ আমাদের মাথার উপর আইসে, কিন্তু প্রখর সূর্য্যালোকে ক্ষীণজ্যোতিঃ ছায়াপথটী অদৃশ্য হইয়া থাকে।

আশ্বিন মাসের রাত্রে আটটা নয়টার সময়ই ছায়াপথ মাথার উপরে আইসে। কিন্তু কার্ত্তিক অগ্রহায়ণ মাসে রাত্রে ৭।৮ টার সময়ই ছায়াপথ মাথার উপরে দেখিতে পাওয়া যায়। তারপর পৌষ মাঘ মাসে সন্ধ্যার সময় ছায়াপথ পশ্চিম দিকে হেলিয়া পড়ে। তখন শেষ রাত্রে উঠিয়া দেখিলে ছায়াপথের অপরার্দ্ধ পূর্ব্বাকাশে দৃষ্টিগোচর হয়। সুতরাং সহজেই বুঝা যাইতেছে যে ছায়াপথ পৃথিবীকে চারিদিকে বেষ্টন করিয়া আছে।

আমাদের সূর্য্যের ন্যায় উজ্জ্বল এবং বৃহৎ নক্ষত্র দ্বারা সমগ্র ছায়াপথটী নির্ম্মিত! এখন একবার ভাবিয়া দেখ, ছায়াপথে কত সূর্য্য। সমগ্র ছায়াপথে কত সূর্য্য। সম্ভবতঃ সেই সকল সূর্য্যের চারিদিকে বহুসংখ্যক গ্রহ, উপগ্রহও প্রদক্ষিণ করিতেছে।

আমরা ছায়াপথের অতি ক্ষীণ আলোক-রশ্মি মাত্র দেখিতে পাই। না জানি ছায়াপথের নক্ষত্রগুলি কত দূরে অবস্থিত। আলোক প্রতি সেকেণ্ডে ১৮৬০০০ একলক্ষ ছিয়াশি হাজার মাইল ভ্রমণ করে। পণ্ডিতেরা নির্দ্ধারণ করিয়াছেন, এরূপ দ্রুতগামী আলোকও সিগ্‌নি ৬১ (Cygni 61) নামক নিকটতম নক্ষত্র হইতে পৃথিবীতে আসিতে পাঁচ বৎসরের অধিক সময় লাগে। এখন অনুমান কর, সিগ্‌নি কতদূরে অবস্থিত। কিন্তু এই সিগ্‌নি নক্ষত্রও অপরাপর নক্ষত্রের তুলনায় অতি সন্নিকটে। সিগ্‌নি অপেক্ষা সহস্র গুণ দূরবর্ত্তী নক্ষত্রের সংখ্যা অনেক. নক্ষত্রের দূরত্ব প্রবন্ধে তাহা উক্ত হইয়াছে। ছায়াপথ উহাদের অপেক্ষাও বহু দূরে আছে।

ছায়াপথের নক্ষত্রগুলি আবার বহু স্তরে সন্নিবিষ্ট। সুতরাং সকল নক্ষত্র আমাদের পৃথিবী হইতে সমদূরবর্ত্তী নহে। একটী নক্ষত্রস্তরের পশ্চাতে আর একটী, তার পর আর একটী। এরূপ সহস্র সহস্র সূর্য্যের কত স্তর অনন্ত আকাশে লোকচক্ষুর অন্তরালে সুশোভিত রহিয়াছে তাহা নির্দ্ধারণ করিবার কাহারও ক্ষমতা নাই।

সার উইলিয়ম হর্শেল একবার ছায়াপথটী ভেদ করিয়া তাহার পরপারে কি আছে, দেখিতে সংকল্প করিলেন।

হর্শেলের পরীক্ষা। উহার পশ্চাতে কি কেবল সীমাশূন্য আকাশ, না সেখানেও নক্ষত্র আছে। হর্শেল পার্শিয়ুস (Persius) নামক নক্ষত্রপুঞ্জের নিকটবর্ত্তী অতি অস্পষ্ট সাদা

মেঘের ন্যায় একটী নীহারিকার দিকে তাঁহার বিরাট দূরবীক্ষণের দৃষ্টি স্থাপন করিলেন। যে স্থানটী পূর্ব্বে সাদা মেঘের ন্যায় বোধ হইয়াছিল সেই স্থানে উজ্জ্বল অগণিত নক্ষত্ররাজি ফুটিয়া উঠিল! কি অনির্ব্বচনীয় সৌন্দর্য্য! নক্ষত্রের পর নক্ষত্র, তারপর আবার নক্ষত্র!

সাধারণ দূরবীক্ষণদ্বারা পরীক্ষা করিলে সম্মুখের নক্ষত্রগুলি দৃষ্টিগোচর হয়, উহার পশ্চাতে আবার সাদা মেঘ দেখা যায়। তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট দূরবীক্ষণ দ্বারা প্রত্যক্ষ করিলে সেই সাদা মেঘখণ্ড অদৃশ্য হয় এবং তথায় অসংখ্য নক্ষত্র দেখিতে পাওয়া যায়। তখন আবার তাহার পশ্চাতে নূতন নীহারিকা দৃষ্ট হয়। এইরূপ নক্ষত্রের স্তরের পর নক্ষত্রের স্তর, তারপর আবার নক্ষত্রস্তর। এক স্তর হইতে অন্য স্তরের ব্যবধান কোটী কোটী মাইল!

হর্শেল যে পর্য্যন্ত ছায়াপথের সীমা নির্দ্ধারণ করিয়াছেন সেই পর্য্যন্ত ছায়াপথের গভীরতা কত? অর্থাৎ ছায়াপথে কতটা নক্ষত্রস্তর অবস্থিত? এই প্রশ্নের উত্তরে হর্শেল বলিয়াছেন, ছায়াপথের কোন কোন স্থানে পাঁচ শতেরও অধিক সূর্য্য স্তরে স্তরে সুশোভিত রহিয়াছে। একটা বিরাট সূর্য্যের পর আর একটা, তারপর আর একটা, এইরূপে পাঁচ শত সূর্য্য কোটী কোটী মাইল দূরে দূরে সাজাইতে হইলে কত স্থানের আবশ্যক তাহা কল্পনা করাও অসাধ্য।

হর্শেলের দূরবীক্ষণের দৃষ্টি ছায়াপথের সমগ্র স্তর ভেদ করিয়া গিয়াছিল। তিনি দেখিলেন, পশ্চাতে অস্পষ্ট সাদা বাষ্পের ন্যায় আর কোন পদার্থ দৃষ্টিগোচর হইতেছে না; নক্ষত্রসমূহের পশ্চাতে কেবল সীমাশূন্য অনন্ত বিস্তৃত সুনীল আকাশ দেখা যাইতেছে। হর্শেল তখন মনে করিলেন, তাঁহার দৃষ্টি নক্ষত্ররাজ্য অতিক্রম করিয়া গিয়াছে।

এখন কেহ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, হর্শেল যেখানে নক্ষত্ররাজ্যের সীমাপ্রদেশ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন উহার

নক্ষত্র রাজ্যের সীমা। পশ্চাতে কি নক্ষত্র-রাজ্য থাকিতে পারে না? হর্শেলের দুরবীক্ষণ হইতে আরও উৎকৃষ্ট দুরবীক্ষণ নির্ম্মিত হইলে নূতন নক্ষত্ররাজ্য আবিষ্কৃত হওয়া কি অসম্ভব?

হর্শেল বলিয়াছিলেন যে, নক্ষত্রপুঞ্জ হইতে আলোক আসিতে ৩৫০০০০ তিন লক্ষ পঞ্চাশ হাজার বৎসর লাগে সেই নক্ষত্রপুঞ্জও তাঁহার দুরবীক্ষণ যন্ত্রে দৃষ্ট হয়। আলোক প্রতি সেকেণ্ডে ১৮৬০০০ একলক্ষ ছিয়াশি হাজার মাইল গমন করে। এখন হিসাব করিয়া দেখ, হর্শেলের দুরবীক্ষণের দৃষ্টি কত দুরগামী। কিন্তু লর্ড রসের (Lord Ross) দুরবীক্ষণের তুলনায় হর্শেলের দুরবীক্ষণও অতি সাধারণ। লর্ড রসের দুরবীক্ষণের ক্ষমতা হর্শেলের দুরবীক্ষণের দশ গুণ! সেই সুপ্রসিদ্ধ দুরবীক্ষণ দ্বারা দৃষ্টিপাত করিলে ছায়াপথের পশ্চাতে সুদূর আকাশে কতকগুলি শুভ্র মেঘের ন্যায় পদার্থ দেখিতে পাওয়া যায়। সেইটীও বোধ হয় আর একটী ছায়াপথ! তাহার মধ্যেও হয় তো কোটী কোটী সূর্য্য!

আমরা যদি অন্ত রাত্রে উড়িয়া গিয়া সন্নিকটবর্ত্তী নক্ষত্রগুলির কোন একটায় পৌঁছিতে পারিতাম তাহা হইলে অনেক অলৌকিক দৃশ্য আমাদের দৃষ্টিগোচর হইত। আমাদের গতি প্রতি সেকেণ্ডে এক লক্ষ ছিয়াশি হাজার মাইলের ন্যূন হইলে পথেই পরমায়ু শেষ হইয়া যাইবে। সেকেণ্ডে এক লক্ষ ছিয়াশি হাজার মাইল গতিতে ছুটিলে কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই আমাদের মঙ্গল, শুক্র, বৃহস্পতি প্রভৃতি গ্রহ একটীর পর একটী করিয়া ক্রমে সকলগুলি অদৃশ্য হইয়া যাইবে। সূর্য্যদেব ক্রমে ক্ষুদ্র হইয়া অতি সামান্য নক্ষত্রে পরিণত হইবেন। আবার আমাদের সম্মুখে নূতন গ্রহ, উপগ্রহ, সূর্য্য দৃষ্টিগোচর হইবে।

সেই স্থান হইতে উর্দ্ধে দৃষ্টিপাত করিলে চির পরিচিত কালপুরুষ, ধ্রুব, সিরিয়াস্ প্রভৃতি নক্ষত্ররাজিকে তেমনি ক্ষুদ্র দেখিতে পাওয়া যাইবে। উহাদের আয়তন কিম্বা ঔজ্জ্বল্য একটুকুও বৃদ্ধি পাইবে না। অথচ আমরা ২০ লক্ষ কোটী মাইল নিকটবর্ত্তী হইয়াছি। ঐ সকল নক্ষত্রের দূরত্বের তুলনায় ২০ লক্ষ কোটী মাইল হাজার অংশের এক অংশ হইতেও কম; তাই উহাদের আকার কিম্বা উজ্জ্বলতার কোন পার্থক্য লক্ষিত হয় না।

কিন্তু এখানেই বিধাতার সৃষ্টিরহস্তের পরিসমাপ্তি হইল না। (ছায়াপথই বিশাল ব্রহ্মাণ্ডের শেষসীমা নহে। ব্রহ্মাণ্ডের সীমা কোথায় তাহা বলিবার কাহারও ক্ষমতা নাই। উৎকৃষ্ট দূরবীক্ষণ আবিষ্কার হইতেছে আর নূতন নূতন অদৃশ্যজগৎ আমাদের দৃষ্টিগোচর হইতেছে।

অনন্ত জগৎ।

জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ অনুমান করেন যে, আমরা যদি ছায়াপথ অতিক্রম করিয়া যাই, এবং সেই স্থান হইতে সম্মুখে দৃষ্টিপাত করি তাহা হইলে কেবল অন্ধকার, সূচীভেদ্য গভীর অন্ধকার আমাদের দৃষ্টিগোচর হইবে। দূরবীক্ষণ সাহায্যে যদি সেই অন্ধকারে দৃষ্টি নিক্ষেপ করি তাহা হইলে আবার আর একটী ছায়াপথ আমাদের নয়নগোচর হইবে।* সেই স্থান হইতে কোটী কোটী মাইল সম্মুখে অগ্রসর হইয়া যদি আবার দূরবীক্ষণের সাহায্যে দৃষ্টিপাত করা যায় তাহা হইলে আর এক অভিনব আশ্চর্য্য জ্যোতির্ম্ময় বিশাল রাজ্য প্রকাশ পাইবে। বামে চাও অগণিত সূর্য্য, দক্ষিণে চাও সূর্য্য, উর্দ্ধে, নিম্নে যে

* We are thus brought into the presence of star-clouds as mysterious to ourselves as the star-clouds of the galaxy were to the astronomers of the old.—The Expanse of the Heaven.

Proctor.

দিকে চাও সেই দিকেই কেবল বিরাট জ্যোতিষ্কপুঞ্জ! সীমা নাই, অন্ত নাই— সূর্য্যের পর সূর্য্য, সৌর-জগতের পর সৌর-জগৎ! আমাদের পুরাণে আছে, ভগবান্ শ্রীহরির যত লোম-কূপ তত ব্রহ্মাণ্ড! অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্ড—অসংখ্য, বিধাতার সৃষ্ট রাজ্য—অনন্ত! ছায়াপথের অত্যাশ্চর্য্য বৃত্তান্ত হইতে আমরা অবগত হইতেছি, আধুনিক বিজ্ঞানও সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে—জগৎ অনন্ত! *

জগতের পরিণাম।

আমরা জগতের উৎপত্তি ও ক্রম-বিকাশের কথা আলোচনা করিয়াছি। কিন্তু ইহার পরিণাম কি? জ্যোতিষ্কগণ কি চিরস্থায়ী, না উহাদের ধ্বংস আছে? একবার একথাটা ভাবিয়া দেখা যাউক।

অনিত্যতা।

জড় জগতে কোন পদার্থ চিরস্থায়ী নহে। যাহার জন্ম আছে তাহার মৃত্যুও আছে, যাহার সৃষ্টি হইয়াছে, কালক্রমে তাহার ধ্বংসও হইবে। ইহাই বিধাতার কঠোর বিধান! পূর্ব্বে বলিয়াছি, নীহারিকা হইতে সূর্য্য ও নক্ষত্রাদি অনন্ত জ্যোতিষ্করাজি উৎপন্ন হইয়াছে। কিন্তু ইহাদের আলোক চিরদিন থাকিবে না। সূর্য্য পৃথিবীর জীবন স্বরূপ। উহার আলোক ও উত্তাপ না পাইলে পৃথিবী বৃক্ষলতাদি পরিশূন্য জনপ্রাণী-হীন ভীষণ শ্মশানে পরিণত হইবে। কিন্তু সেই সূর্য্যই কি চিরদিনের জন্য আসিয়াছে? সূর্য্যের পরিণামের কথাটাই আগে আলোচনা করিয়া দেখিব।

---

* "Insufferable is the glory of God. Let me lie down in the grave and hide me from the persecution of the infinite, for End, I see there is none!"

সূর্য্যই আমাদের তাপাধার। সূর্য্য হইতে অবিশ্রান্ত তাপ বিকীর্ণ হইতেছে। আমরা পৃথিবীতে যত উত্তাপ পাই তাহার ২১৭০০০০০০০০ দুইশত সতর কোটী গুণ উত্তাপ প্রতিদিন শূন্যে বিকীর্ণ হইয়া থাকে। সূর্য্যদেব প্রতিদিন এত তাপ বিতরণ করিয়াও একবারে নিঃস্ব হইয়া যাইতেছেন না কেন? বহু লক্ষ বৎসর যাবৎ সূর্য্যের তাপক্ষয় কার্য্য চলিতেছে, তবুও আমরা অপেক্ষাকৃত শৈত্য অনুভব করিতেছি না। ইহার এক কারণ এই হইতে পারে, যে প্রাকৃতিক নিয়মে বাষ্প শীতল হইলে সঙ্কুচিত হইয়া উত্তাপ বিকীরণ করে। সূর্য্যের বাষ্পময় গোলকও যতই সঙ্কুচিত হইতেছে, ততই উহার উত্তাপ বৃদ্ধি পাইয়া সমতা রক্ষিত হইতেছে। পণ্ডিতেরা স্থির করিয়াছেন যে, সূর্য্যরূপ বিরাট গোলক এক সময়ে সমগ্র সৌর-জগৎ ব্যাপিয়া ছিল। ক্রমে উহা সঙ্কুচিত হইতেছে। গণনা দ্বারা স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, যে পরিমাণ উত্তাপ সূর্য্য হইতে বিকীর্ণ হয় তাহার পূরণ করিতে সূর্য্যকে বৎসরে ২২০ ফিট নিজ ব্যাস সঙ্কুচিত করিতে হইতেছে। এইরূপে সঙ্কুচিত হইতে হইতে সূর্য্য শেষে একবারে কঠিন ও শীতল হইয়া যাইবে। তখন এই জলন্ত মার্ত্তণ্ড জ্যোতিহীন হইয়া গৌরবময় সূর্য্যপদচ্যুত হইবে এবং গ্রহ-পরিবারভুক্ত হইয়া তাহাকে আলোকের জন্য পরমুখাপেক্ষী হইতে হইবে। সূর্য্যদেবের এই শোচনীয় পরিণাম দেখিবার জন্য আমরা অবশ্যই কেহ জীবিত থাকিব না। কারণ সেদিন যদিই আইসে তবেও দুই এক লক্ষ বৎসরের মধ্যে কিছুতেই আসিবার আশঙ্কা নাই। ততদিনে হয়ত কোন নীহারিকা সূর্য্যে পরিণত হইয়া সৌর-জগতের অভাব পূরণ করিতে সমর্থ হইবে।

"কিন্তু ইহার মধ্যে একটা কথা আছে। যাহার শুধু ব্যয় আছে, কিন্তু আয় নাই, সে ভয়ানক ধনশালী এবং অতিশয় কৃপণ হইলেও তাহার ধন একদিন শেষ হইয়া যাইবেই। সুতরাং সহজেই প্রশ্ন

উঠে যে, বর্ত্তমান নীহারিকাগুলি শেষ হইয়া গেলে, এই ব্রহ্মাণ্ডের দশা কি হইবে? তখন ত আর নূতন সূর্য্য উৎপন্ন হইবার উপায় থাকিবে না। সুতরাং নূতন নীহারিকার সৃষ্টির উপায় দেখিতে না পারিলে, এ ব্রহ্মাণ্ডের আলো একদিন নিবিয়া যাওয়া অনিবার্য্য। ইহাই কি তবে ব্রহ্মাণ্ডের পরিণাম? ইহাতে পুনরায় নূতন আলো এবং নূতন জীবনের স্রোত প্রবাহিত হইবার কি কোনও হেতু বর্ত্তমান নাই?"

নূতন সৃষ্টির উপায়।

অবশ্যই আছে। দেখা যাউক, সেই হেতু কিরূপ! আকাশের গ্রহ নক্ষত্রগুলির কিরূপ অসাধারণ বেগ, তাহা সকলেই জানেন। যদি কোনও কারণে এই বেগ হঠাৎ থামিয়া যায় তবে তাহা তাপে পরিণত হইবে। সেই তাপ এত অধিক হইবে যে, তাহাতেই সেই জ্যোতিষ্ক গলিয়া বাষ্পময় নীহারিকা হইয়া যাইতে পারে। দুইটী জ্যোতিষ্কের সংঘর্ষণ হইলে, ভয়ানক অগ্নিকাণ্ড উপস্থিত হইবে, এবং তাহাতে উভয় জ্যোতিষ্কই, নীহারিকায় পরিণত হইবে।

এইরূপ সংঘর্ষণ হওয়ার দুইটী উপায়ের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। আমাদের এই যে সৌর-জগৎ, ইহার গ্রহগুলির গতি থামিয়া যাইবার আপাততঃ কোনও কারণ দেখা যায় না। কিন্তু ইহাদের পথে কিঞ্চিৎ পরিমাণেও বাধা (resistance) থাকিলে, কালে ইহাদের গতি শ্লথ হইয়া ইহাদের সূর্য্যে গিয়া পড়া অসম্ভব নয়। ইহার দরুণ যে তাপের সৃষ্টি হইবে, তাহাতে সৌর-জগতের অধিকাংশ জ্যোতিষ্ক বাষ্পময় হইয়া যাইতে পারে। ইতিপূর্ব্বে আমরা দেখিয়াছি যে, তারাগুলির প্রত্যেকেরই, এক একটা অতিশয় দ্রুত গতি আছে।

---

* ভারত-মহিলা, ১বর্ষ শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী বি, এ, লিখিত "ব্রহ্মাণ্ড" প্রবন্ধ।

এই গতির শেষ ফলস্বরূপ কালে তাহার সংঘর্ষণ হওয়ার কথা কল্পনা করা যাইতে পারে। কিন্তু এরূপ সংঘর্ষণ দুই এক লক্ষ বৎসরের ভিতরে হওয়ার কোনরূপ সম্ভাবনা দেখা যায় না। ততদিন এই সৌর-জগতের অগ্নি জ্বলিবে কি না কে বলিতে পারে? হয়ত ভগবানের এরূপই ইচ্ছা যে আমাদের সূর্য্য নিবিয়া গেলে পর ঐরূপ সংঘর্ষণের দ্বারা তাহার অগ্নি পুনরায় জ্বলিবে।

সংঘর্ষণ ভিন্নও যে নূতন জগতের সৃষ্টি না হইতে পারে, এরূপ নহে। প্রসিদ্ধ পণ্ডিত "হেল্‌মজ্‌" হিসাব করিয়া দেখিয়াছেন যে, আকাশে যে অতিশয় সূক্ষ্ম ধূলিকণা (cosmic dust) বিস্তীর্ণ রহিয়াছে তাহা ঘনীভূত হইলে এত তাপ উৎপন্ন হইবে যে, তাহা হইতে নূতন জগতের সৃষ্টি হইতে পারে।

যেরূপ করিয়াই হউক, সৃষ্টির প্রবাহ অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য ভগবান নিশ্চয়ই উপায় রাখিয়াছেন। ক্লামারিয়েঁ। বলেন যে, "তাহা যদি না হইত, সূর্য্যগণ একবার নিবিলে যদি পুনরায় জ্বালাইবার ব্যবস্থা না থাকিত,—তবে এত দিনে, আমরা আকাশে একটিও তারা দেখিতে পাইতাম না। কারণ, সৃষ্টি এতই প্রাচীন যে, তাহাকে আমরা অসীম অতীত কালের বিষয় মনে করিতে পারি। সৃষ্টির আরম্ভ অবধি এ পর্য্যন্ত, অসংখ্য সূর্য্য জ্বলিবার এবং নিবিবার অবসর পাইয়াছে। অনন্ত কালের দিক দিয়া দেখিলে, বর্ত্তমান সূর্য্যগুলিকে, নিতান্তই নূতন বলিয়া বোধ হয়। পুরাতন সূর্য্য যতই লোপ পাইয়াছে, ততই নূতন সূর্য্য তাহাদিগের স্থান অধিকার করিয়াছে। সৃষ্টিপ্রবাহ এমনি চলিয়াছে এবং চলিবে।

---

* আমাদের পুরাণেও ঠিক এই কথাই আছে। কল্পান্তে মহাপ্রলয়ে সৃষ্টি ধ্বংস হয়, আবার ভগবান্ নূতন জগৎ সৃষ্টি করেন। এইরূপে কল্পে কল্পে, জগতের

যাহা হউক, সৃষ্টির আদি অন্ত আমাদের এতই নিকটবর্ত্তী নহে যে তজ্জন্য আমাদের উদ্বিগ্ন না হইলে চলে না। সুতরাং ইহা অপেক্ষা আমাদের অধিকতর নিকটবর্ত্তী একটা বিষয়ের কথা বলিতেছি। তারাগুলির কোনটার সহিত আমাদের সূর্য্যের সংঘর্ষণ হওয়া, অল্প দিনের ভিতরে সম্ভব নহে, একথা বলা হইয়াছে। কিন্তু অপেক্ষাকৃত অল্প দিনের ভিতরে এমন কোন দুর্ঘটনা হওয়া সম্ভব কি না, যাহাতে এই পৃথিবী ধ্বংস হইয়া যাইতে পারে? কয়েক বৎসর পূর্ব্বে মিঃ গোর (G. E. Gore) এ বিষয়ে 'নলেজ' পত্রিকায়, একটা প্রবন্ধ লিখিয়ছিলেন। তাহাতে তিনি বলিয়াছেন যে, নক্ষত্রমণ্ডলীকে দেখিয়া, আপাততঃ তাহাদের কাহারও সহিত সূর্য্যের সংঘর্ষণ হওয়ার কোনরূপ আশঙ্কা হয় না বটে,—কিন্তু, নক্ষত্র ভিন্ন অন্য কোনরূপ পদার্থের সহিত যে শীঘ্র তাহার কোনরূপ সংঘর্ষণ হওয়ার সম্ভাবনা নাই, একথা তেমন নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। সূর্য্য অতিশয় বেগের সহিত আকাশের অভিজিৎ (vega) নামক নক্ষত্রের নিকটবর্ত্তী একটা স্থানের দিকে ছুটিয়া চলিয়াছে। একথা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। সূর্য্যের পথে কোন তারা যে উপস্থিত নাই, একথা দুরবীক্ষণ দিয়া দেখিলেই বোঝা যায়। কিন্তু তাহা না থাকিলেও জ্যোতি-র্বিহীন একটা অদৃশ্য পদার্থ যে না থাকিতে পারে, এমন কথা বলা যায় না। আকাশে নিশ্চয়ই এমন পদার্থ অনেক আছে যে তাহারা এককালে সূর্য্য ছিল, এখন নিভিয়া গিয়া, আমাদের দৃষ্টির বহির্ভূত হইয়াছে। এরূপ একটা পদার্থ যদি সূর্য্যের পথে থাকে, তবে তাহার বিষয় আমাদের না জানিবারই কথা; সুতরাং এইরূপ আলোকবিহীন

আশু প্রলয় সম্ভব কি না?

ধ্বংস ও নূতন জগতের উৎপত্তি হইতেছে। সৃষ্টি প্রবাহ অনন্তকাল হইতে অপ্রতিহত ভাবে আবর্ত্তিত হইতেছে।

একটা পদার্থের সহিত সূর্য্যের সংঘর্ষণ হওয়া তেমন আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। এরূপ সংঘর্ষণের দ্বারা যে তাপের উৎপত্তি হইবে, তাহাতে অল্প সময়ের ভিতরে পৃথিবীর ধ্বংস হইয়া যাওয়াও আশ্চর্য্য নহে। কিন্তু এরূপ একটা ঘটনা আমাদের অজ্ঞাতসারে, হঠাৎ ঘটিয়া যাইবার কোন সম্ভাবনা নাই। আগন্তুক পদার্থের নিজের আলোক না থাকিলেও সূর্য্যের আলোক তাহার উপরে পড়িবেই। সে পদার্থটা যদি আমাদের সূর্য্যের বড় হয়, তবে তো তাহা খুবই প্রকাণ্ড হইবে। এমত অবস্থায়, সৌর-জগতের সীমার অনেক দূরে থাকিতেই তাহাকে তারার ন্যায় দেখা যাইবার পরেও সূর্য্যের কাছে পৌঁছাইতে উহার প্রায় ১৫ বৎসর লাগিবে। ইহার অনেক পূর্ব্বেই আমরা তাহার চরিত্র এবং উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিব। সংঘর্ষণের সময় উহার বেগ সেকেণ্ডে ৪ শত মাইলেরও অধিক হইবে। এরূপ সংঘর্ষণের ফল যে কি হইবে, তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। আগন্তুক এবং সূর্য্য উভয়েই এক ঘণ্টার ভিতরে বাষ্পে পরিণত হইয়া যাইবে; এবং তাপ এত উৎপন্ন হইবে যে, তাহাতে কেবল পৃথিবী নহে, সৌর-জগতের অধিকাংশ গ্রহই বিনাশ পাইবে।

উপসংহার।

আমরা এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে জগতের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের কথা অতি সংক্ষেপে আলোচনা করিয়াছি। ক্ষুদ্র বুদ্ধি মানব, আমরা ভগবানের অপার মহিমা ও অসীম শক্তির ক্ষীণ আভাসও হৃদয়ঙ্গম করিতে অসমর্থ। আমাদের জ্ঞান সীমাবদ্ধ, দৃষ্টি সংকীর্ণ. কূপ-মণ্ডূকের ন্যায় এই পৃথিবীকেই আমরা ব্রহ্মাণ্ড মনে করিয়া থাকি। পৃথিবীর বাহিরে অনন্তজগতের কথা আমরা কল্পনাও করিতে পারি না।

আমাদের এই ক্ষুদ্র পৃথিবী, মহাসাগরের তুলনায় একটী শিশির-বিন্দু মাত্র। জলবুদ্বুদের ন্যায় কালস্রোতে ইহার সৃষ্টি, আবার ক্ষণকাল পরে উহা বিলীন হইয়া যাইবে! বিধাতার বিশালরাজ্যে এইরূপ শত শত পৃথিবীর উৎপত্তি ও বিলয় নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। যখন মনে হয়, নৈশনীলাকাশে পরিস্ফুট আলোকবিন্দুবৎ প্রতীয়মান কোটী কোটী নক্ষত্ররাজি এক একটী বিরাট সূর্য্য! অনেক নক্ষত্র আবার সূর্য্য হইতেও বৃহত্তর, তখন আমাদের জ্ঞানের গর্ব্ব এবং শক্তির গৌরব চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া যায়!

এই অনন্তের মধ্যে আমরা কে, যে ভগবান্ আমাদের সংবাদ লইবেন? দাবির হিসাবে, এ প্রশ্নের উত্তরে, আমাদের কিছুই বলিবার নাই। এই পরমাণুগুলি আমাদের তুলনায় যেরূপ ক্ষুদ্র, সৃষ্টির তুলনায় আমরা তদপেক্ষাও অসংখ্যগুণে অকিঞ্চিৎকর। ইহার মধ্যে আমাদের যতটুকু দাবি করিবার যোগ্যতা আছে, তদপেক্ষা অনেক বেশী, আমরা প্রতি মুহূর্ত্তেই পাইতেছি। কিন্তু তবুও যে আমাদের আকাঙ্ক্ষার তৃপ্তি নাই। আমরা বলি—

"যো বৈ ভূমা তৎসুখম্ নাল্পে সুখমস্তি।"

"যিনি মহান্ তিনি সুখস্বরূপ; ক্ষুদ্র পদার্থে সুখ নাই।"

আমরা স্বয়ং ভগবানকে ছাড়িয়া আর কিছুতেই তৃপ্ত হইব না। আর একথা সকলে বিশ্বাস কর, ভগবান্ কখনই আমাদের আকাঙ্ক্ষা অপূর্ণ রাখিবেন না। সৃষ্টির তত্ত্ব আমাদিগকে এবিষয়ে আশ্বাস প্রদান করিতেছে। তাঁহার অনন্ত শক্তির নিকট ব্রহ্মাণ্ডই বা কত বড়, পরমাণুই বা কত ছোট! তিনি সকলের ভিতরেই শক্তি সঞ্চার করিতেছেন। তিনি—

"অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্"

"অণু হইতেও অণু তিনি, মহান্ হইতেও মহত্তর তিনি" তিনি সকলের সংবাদই সমান ভাবে লইতেছেন। পরমাণুর কার্য্যকলাপ দেখ। তাহাতেও দেখিবে, ভগবান্ স্বয়ং তাহার কাজ ভাগ করিয়া দিয়াছেন এবং উহার সংবাদ তিনি এমন ভাবে লইতেছেন, যেন উহাই তাঁহার একমাত্র কাজ। জগতের অতি সামান্য ব্যাপারকেও তিনি এক মুহূর্ত্ত ভুলিয়া থাকেন না। তিনি তাঁহার কোন চেষ্টাকে ব্যর্থ হইতে না দিয়া, মহান্ বিশ্বের সৃষ্টিতে নিয়োগ পূর্ব্বক তাহা সার্থক করেন। আর আমাদের ভিতরে মন, বুদ্ধি এবং আত্মার সঞ্চার করিয়া দিয়া, এবং আমাদের প্রাণে মহতী আকাঙ্ক্ষার উদ্রেক করিয়া দিয়া তিনি এ সমুদায়কে চরিতার্থ করিবেন না, ইহা কখনই ভগবানের ইচ্ছা হইতে পারে না।

সমাপ্ত।